বাংলা ও বাংগালী
মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা

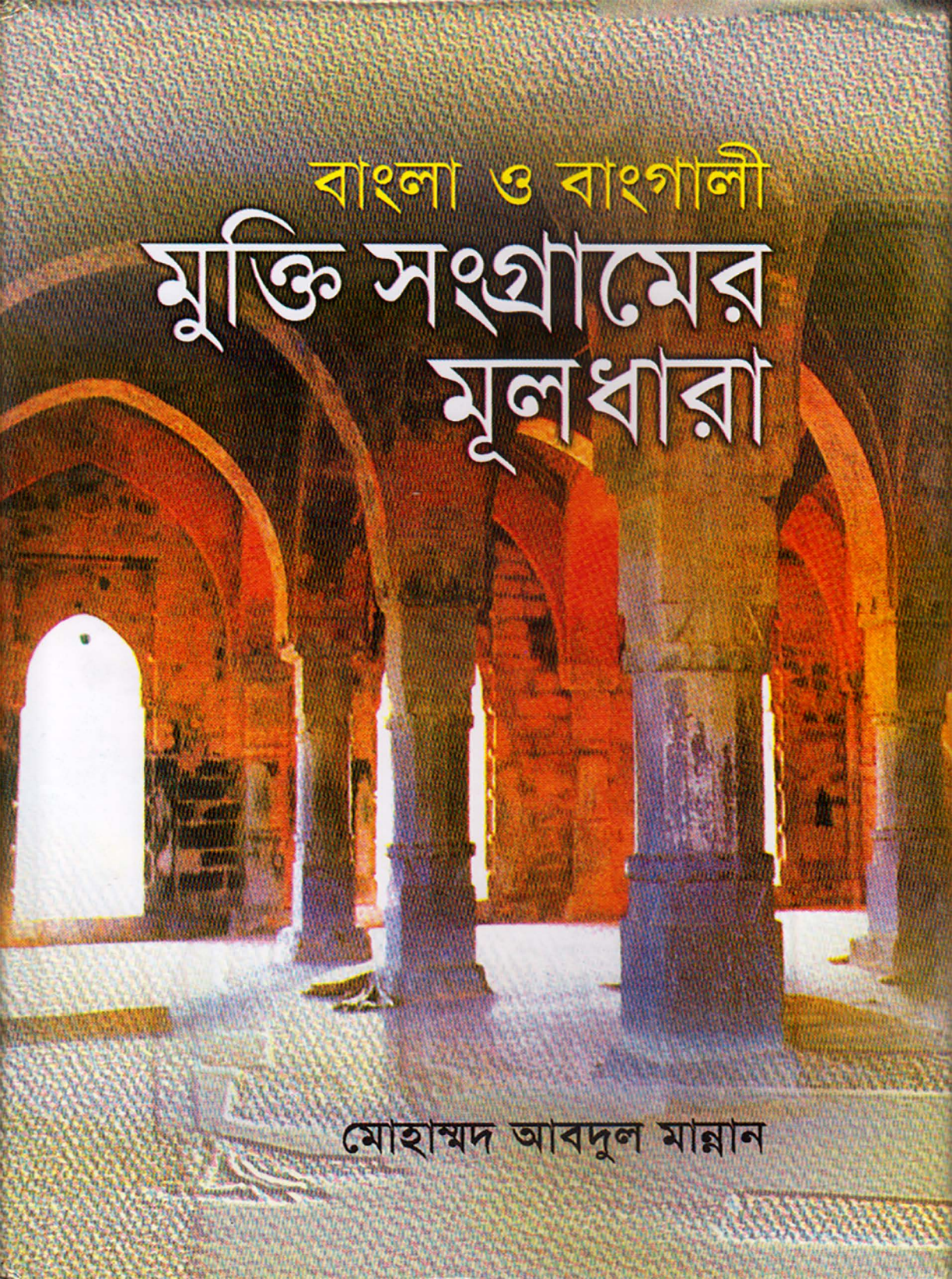

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

বাংলা ও বাংগালী ঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা

(১৭৫৭ সাল পর্যন্ত)

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

বাংলা ও বাংগালী ঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা
(১৭৫৭ সাল পর্যন্ত)
মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

প্রকাশক
এস এম রইসউদ্দিন, পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম অফিস ঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী -১৯৯১
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারী -২০০৪
তৃতীয় সংস্করণ ঃ জুলাই- ২০০৬
চতুর্থ সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর-২০০৯

স্বত্বঃ মাকসুদা বেগম

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ ঃ আরিফুর রহমান

মূল্য ঃ ১৭৫.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা, ৯৬৬৩৮৬৩
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা, ৭১৬৩৮৮৫

BANGLA O BANGALI : MUKTI SANGARMER MOOLDHARA (History of the Freedom movement of Bangala), By Mohammad Abdul Mannan, Published by: S.M. Rais Uddin, Director (Publication), Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. Web<www.booksocietybd.com>, E-mail<bookscty@dhaka.net>
Price : Tk. 175.00, US$ 5.00, **ISBN.-984-493-087-1**

www.nagorikpathagar.org

'টেকনাফ থেকে খাইবার'-এর লেখক
বিপ্লবী যুগের মুক্তি সংগ্রামী
সাংবাদিকতার শিক্ষাগুরু
বিশ্বেশ্বর চৌধুরীর
স্মৃতির উদ্দেশে

www.nagorikpathagar.org

মুখবন্ধ

এক সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙালীর ইতিহাসহীনতার জন্যে আক্ষেপ করেছিলেন। তিনি আবেদন জানিয়েছিলেন বাঙালীকে তাদের ইতিহাস রচনা করতে। বঙ্কিমচন্দ্রের এ আবেদনে সাড়া দিয়েই হোক বা স্বজাতিকে যথার্থ প্রেক্ষাপটে জানার আগ্রহ থেকেই হোক, বাঙালী ইতিহাস চর্চায় ব্রতী হয়েছে। বাঙালীর ইতিহাস চর্চার মান নিয়ে যত বিতর্ক থাক না কেন, সংখ্যার বিচারে এক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত বাঙালীর অবদান কম নয়। কিন্তু জানার তো শেষ নেই, বা শেষ নেই জানা বিষয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণের। কাজেই বাঙালীর ইতিহাস নিয়ে আজও অনুসন্ধিৎসার বিরাম নেই। বিভিন্ন আঙ্গিক ও দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা হচ্ছে বাঙালীর ইতিহাস। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর এ প্রচেষ্টার সংখ্যা আশাপ্রদভাবে ক্রমবর্ধমান।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান রচিত "বাংলা ও বাংগালী : মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা" বইটি এমনি প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে একটি উৎসাহব্যঞ্জক সাম্প্রতিকতম সংযোজন। লেখক স্বাধীন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করেছেন এ ভূ-খন্ডের অতীত ইতিহাসের গভীরে। বাঙালীর ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রবহমান মূলধারায় তিনি নির্দেশ করেছেন বাংলাদেশের উৎসস্থলকে। অবশ্য এ বইতে আলোচনা অসমাপ্ত। কারণ, বাঙালী জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি থেকে শুরু করে বক্তব্য ১৭৫৭ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। পরবর্তী দু'টি খন্ডে তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ হবে। প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ করে লেখক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এ বই লেখকের অনুরাগ ও পরিশ্রমের স্বাক্ষর বহন করছে। সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত বইটি সুখপাঠ্য। আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

(ডক্টর এ.আর. মল্লিক)
প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চ্যান্সেলর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ সংস্করণে লেখকের কথা

'বাংলা ও বাংগালীঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা'র চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। এ জন্য আমি মহান আল্লাহ- তায়ালার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। ১৯৯১ সালে প্রথম মুদ্রণের অল্প দিনের মধ্যে এর সকল কপি শেষ হয়ে গেলেও অনেকটা লেখকের উদ্যোগের অভাবেই দীর্ঘ এক যুগ বইটি বাজারে গরহাজির ছিল। ২০০৫ সালের ফ্রেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির আগ্রহে এর দ্বিতীয় সংস্করণ এবং ২০০৬ সালের জুলাই মাসে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এ অল্প সময়ে এখন এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ এ ধরনের একটি বইয়ের অসামান্য পাঠক প্রিয়তা প্রমাণ করে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বই সিলেবাসভুক্ত হওয়ার কারণে বিশেষত গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে সোসাইটি বইটি পুনঃমুদ্রণের উদ্যোগ নেয়ায় তাঁদেরকে ধন্যবাদ।

এখানে একটি তথ্য পুনরুল্লেখ করা কর্তব্য মনে করছি। ১৯৯১ সালের গোড়ার দিকে আমি এ বইয়ের একটি মুখবন্ধ লিখে দেয়ার জন্য প্রফেসর ডকটর আজিজুর রহমান মল্লিককে অনুরোধ জানাই। তিনি চোখের অসুখে ভুগছিলেন। আমাকে নিয়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের একজন প্রফেসরের বাসায় গেলেন। বইয়ের মুদ্রিত ফর্মাগুলো তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, 'তুমি পড়ে আমার পক্ষ থেকে একটা মুখবন্ধ দাঁড় করিয়ে দাও।' ক'দিন পর মল্লিক স্যার অধ্যাপক সাহেবকে ফোনে তাগাদা দিলেন। অধ্যাপক বললেন, "এ বইতে কয়েকজন ইসলাম প্রচারককে 'মুক্তিসংগ্রামের নায়ক' বলা হয়েছে, যা ইতিহাসসম্মত নয়।" মল্লিক স্যার বললেনঃ "মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের মতের সাথে আমিও তো একমত। তুমি আমার বক্তব্য হিসেবে মুখবন্ধ লিখে দাও। আমি স্বাক্ষর করবো।" এভাবেই মল্লিক স্যারের মুখবন্ধ দাঁড়ালো। প্রকাশিত হবার পর তিনি বইটি পড়ে সস্নেহে মন্তব্য করলেনঃ "তুমি একটা অসাধারণ কাজ করেছো।" মল্লিক স্যার তাঁর কথা ও কাজ দ্বারা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেনঃ *ফলবান বৃক্ষ বিনম্র হয় যাতে সকলে ফলের নাগাল পেতে পারে।* স্যার এখন পরপারে। তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত মুখবন্ধ এ বইতে শোভা পাচ্ছে। আমি সেই ফলবান বৃক্ষের কথা স্মরণ করছি আর তাঁর রুহের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করছি।

এ বই আমাকে আরেকজন জ্ঞানী ব্যক্তির নৈকট্য হাসিলে সাহায্য করেছিল। তিনি জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান। তিনি এ বইটিকে এ *ধারার পথিকৃত গ্রন্থ* বলে উল্লেখ করে আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এ বই সম্পর্কে আরো অনেকে আলোচনা করেছেন এবং মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। আমি সেগুলো সাধ্যমতো কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছি। তাঁদের মধ্যে জাতীয় অধ্যাপক অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, রাজনীতিবিদ এম এ মোহাইমেন, প্রবীণ সাংবাদিক মহবুব আনাম, অগ্রজপ্রতিম সাংবাদিক-সহকর্মী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী ও প্রবীণ সাংবাদিক মাশির হোসেন এখন পরপারে। আমি তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।

কবি মুকুল চৌধুরী এ বই পড়ে 'শিকড়ের ঘ্রাণ' নামে একটি চমৎকার কবিতা লিখেন। কবি হাসান আলীম এই বইয়ের বিষয়কে ধারণ করে রচনা করেন একগুচ্ছ কবিতা এবং সে-সব কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'মূলধারা'র লেখককে উৎসর্গ করা তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ। এ সবই আমার জন্য অফুরান অনুপ্রেরণা।

এ ধরনের উৎসাহে আপ্লুত হয়ে ভিন্নধর্মী পেশাগত নানা ব্যস্ততার মধ্যে আমি জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে কাজ করছি। এটা আশার কথা যে, আমাদের ইতিহাসের প্রধান বাঁকগুলো সম্পর্কে জানার জন্য জনগণের মধ্যে ক্রমেই আগ্রহ বাড়ছে। তরুণদের মাঝেও সচেতনতা জাগ্রত হচ্ছে। একদল শিকড়-সন্ধানী লেখক-গবেষকও এ কাজে এগিয়ে এসেছেন। ইতিহাস-ঐতিহ্য অনুসন্ধানের এ ধারা অনুসরণ করে আত্ম আবিষ্কারের পথ বেয়ে ক্রমশ আমরা আত্মশক্তিতে অধিকতর সমৃদ্ধ হবো।

এ সংস্করণের নির্ঘন্টটি তৈরি করে দিয়েছেন সাংবাদিক ও গবেষক অনুজপ্রতিম ফজল মুহম্মদ। আল্লাহ তাঁকে পুরস্কৃত করুন এবং আমাদের সকল সৎ প্রচেষ্টা কবুল করুন।

গ্রন্থকার

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ সংস্করণে প্রকাশকের কথা

সাধারণভাবে প্রকাশক একজন ব্যবসায়ী। যিনি উৎপাদনের সাথে জড়িত। বই হলো তাঁর প্রডাক্ট। সেদিক থেকে তিনি একজন উৎপাদক বা উৎপন্নকারী। তিনি শুধু একজন ব্যবসায়ী নন, শিল্পপতিও। একজন শিল্পপতির দেশ ও জাতির প্রতি যে দায়বদ্ধতা থাকে, একজন প্রকাশকেরও তা থাকে। মননশীলতার হেরফেরে একজন শিল্পপতি যেমন উত্তম বা অধম পণ্য উৎপাদন করতে পারেন, তেমনি একজন প্রকাশকও তার রুচি, সংস্কৃতি ও আদর্শভেদে উত্তম ও অধম পণ্য উৎপাদনের মাঝে ঘুরপাক খেতে পারেন। এক্ষেত্রে লেখকই প্রকাশকের অবলম্বন। দেশ, জাতি ও সমাজের প্রতি লেখকের যে দায়বদ্ধতা তা একজন প্রকাশকেরও না থাকলে শুদ্ধতর প্রকাশকের উত্থান ঘটবে না, শুদ্ধতম লেখকও তৈরি হবে না। দেশ ও জাতি মননশীলতার সাধারণ ও স্বাভাবিক স্তরে পৌঁছতে পারবে না। এই বিবেচনায় লেখকের চেয়ে প্রকাশকের দায়িত্ব কোন অংশে কম নয়। প্রকাশক যেমন লেখক তৈরী করেন, লেখকও তেমন প্রকাশক তৈরি করেন। সাধারণত বড় মাপের লেখক যেমন ছোট মাপের প্রকাশকের কাছে পাণ্ডুলিপি জমা দেন না, তেমনি বড়মাপের প্রকাশকও ছোট মাপের কোন লেখকের দরজায় ধর্না দেন না। এসবেরও আবার ব্যতিক্রম আছে। বড়মাপের লেখক ছোটমাপের প্রকাশকের মাধ্যমে বই প্রকাশ করে প্রকাশককে বড় করে তুলতে পারেন। একইভাবে বড়মাপের প্রকাশক ছোটমাপের কোন লেখকের বই প্রকাশ করে সেই লেখককে বড়মাপে উন্নীত করতে পারেন। এদিক থেকে লেখক ও প্রকাশকের সম্পর্ক অনেকটা সন্তানের জন্য পিতা ও মাতার মতো।

বিদগ্ধ ইতিহাস গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান "বাংলা ও বাংগালী ঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা" শীর্ষক একটি আত্মচৈতন্যের, আত্মআবিষ্কারের এবং আত্মপরিচয়ের পাণ্ডুলিপি 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' করে সৃষ্টি করেছেন। সেই বৈদগ্ধপূর্ণ, অমিত ও ঋদ্ধ পাণ্ডুলিপিটি এক যুগ আগে 'সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড' প্রকাশ করে প্রকাশক হিসাবে দেশ, জাতি ও সমাজের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা অকৃপণভাবে পুরণ করেছেন। আমরা নিশ্চিত, শুধু ব্যবসার কারণে এই মহার্ঘ ও অনুপম পাণ্ডুলিপিটি তাঁরা প্রকাশ করেননি, দায়বদ্ধতার যন্ত্রণাদায়ক প্রণোদনা থেকে তৃপ্তির উল্লাসে মুখর হওয়ার উদ্দেশ্যেই তাঁরা এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। যে সকল কারণে পূর্ববর্তী প্রকাশক এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন, সেই একই কারণে দেশের ঐতিহ্যবাহী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের সাথে এ দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে শুরু করে এবার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করছে।

আমাদের আত্মপরিচয় আবিষ্কারে ও জাতিসত্তা নির্ণয়সহ গন্তব্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে লেখকের যে আকাংখা, মহত্তম সাধনার সেই ঋজু পদক্ষেপে বিনীত সহযোগিতা প্রদান করে আমরাও এই মুহূর্তে কিঞ্চিত তৃপ্তি বোধ করছি। আশা করছি, জাতির যেসব বিদগ্ধজনের কাছে এই অসাধারণ ও অসামান্য গ্রন্থটি এখনো পৌঁছেনি, খুব শীগগীরই তা পৌঁছে যাবে এবং আত্মপরিচয় উৎঘাটনের পথে যে অস্পষ্টতা এখনো বিরাজিত, তা অচিরেই দূরীভূত হবে।

(এস.এম. রইস উদ্দীন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গ কথা

১.১. পেরিয়ে যাওয়া বর্তমানের দলিলকেই ইতিহাস হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। ইতিহাস অতীতের কংকালও হতে পারে। অনেকেরই ধারণা, ইতিহাস মমি করে রাখা মহাকাল। কথাটা আংশিক সত্য বলে ধরে নেয়া যায়। Colling Wood-এর ভাষায় ইতিহাস হচ্ছে 're-enactment of past experience.'

ইতিহাস চর্চার সরল অর্থ হচ্ছে অতীত সম্পর্কে গবেষণা ও অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধানের সম্পর্ক ঐতিহাসিকের চেতনা ও বিশ্লেষণের সাথে, যা একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া। সুতরাং এই প্রচেষ্টা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। অতীতের ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রাপ্ত প্রতীক ও প্রমাণগুলি সীমিত পর্যায়ের। সেই সীমিত সামর্থও গবেষকের হাতে আসে পরোক্ষভাবে। প্রথম যিনি ঘটনাটি লিখেছেন সেখানে তাঁর নিজস্ব মূল্যবোধ, মানসিক গঠন ও উদ্দেশ্য কাজ করে। ঘটনা উপলব্ধি করার সক্ষমতাও বিবেচ্য বিষয়। এভাবে একজন ঐতিহাসিক অতীত ঘটনাবলীর যে অপর্যাপ্ত তথ্য পান, সেগুলি উক্ত ঘটনার reported fact বা বর্ণিত তথ্য মাত্র। পরবর্তী পর্যায়ে যাঁরা এসব তথ্য ব্যবহার করেন, তাঁদের সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী, তথ্য বাছাইয়ের পদ্ধতি, তথ্যের যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপনের নৈপুণ্য ও অন্তর্দৃষ্টি এবং এ ধরনের আরো বহু বিষয়ে তারতম্যের কারণে তথ্যটি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে পুনরায় হেরফের ঘটে। পরবর্তীতে যাঁরা এসব ইতিহাস থেকে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য নির্বাচন করেন, সেখানেও নির্বাচনের পদ্ধতি ও তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী প্রভাব ফেলতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে যিনি যত অগ্রণী ও সৎ, তাঁর পক্ষে ঘটনার পর্যায়ক্রমিক বিকৃতি ও বিড়ম্বনা এড়িয়ে মূল তথ্যের ততো কাছাকাছি পৌঁছা সম্ভব।

ইতিহাস আলোচনার উপাদান বা মাল-মশলাকে উৎসের দিক থেকে প্রধান দু'টি ভাগে চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রথমতঃ সাহিত্য বিষয়ক; দ্বিতীয়তঃ প্রত্নতাত্ত্বিক। দরবারী ইতিবৃত্ত, সরকারী নথি, লেখক ও জীবনীকারদের রচনা, সমসাময়িক কাব্য ও গদ্য সাহিত্য প্রভৃতি থেকে আমাদের ইতিহাসের উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণের আকরগুলির মধ্যে রয়েছে মুদ্রা, শিলালিপি, ইমারত ও নৃতাত্ত্বিক উপাদানসমূহ। ইতিহাস বিশ্লেষণ ও রচনার ক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণাদি সাহিত্যিক উপায়-উপকরণের তুলনায় বেশি নির্ভরযোগ্য ও নিরপেক্ষ। কেননা, সাক্ষ্য হিসাবে এগুলি প্রত্যক্ষ ঘটনার বেশী নিকটবর্তী।

১.২. প্রাক-মুসলিম যুগের ভারতীয় ইতিহাস আজও আবিষ্কৃত হয়নি। প্রাচীনকালের আর্য-পুরাণ রাজ-রাজড়াদের কাহিনীতে ভরপুর। এসব কাহিনী সন-তারিখবিহীন অনন্ত অতীতের মাঝে স্থাপিত এবং তাদের সমগ্র আবহ ধর্মীয় উচ্ছ্বাস ও যুক্তিহীন রূপকল্পে একাকার। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

'কবি তব মনোভূমি
রামের জন্মস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো!'...

প্রাক-মুসলিম যুগে মানবীয় কার্যাবলী যত না গুরুত্ব পেয়েছে, তারচে অনেক বেশী গুরুত্ব পেয়েছে কল্পনা-বিলাস ও মানুষের অতিলৌকিক এবং অতিন্দ্রীয় বিষয়ের বর্ণনা। এ কারণেই যৌক্তিক কর্মকান্ডকে অবলম্বন করে কোন ইতিহাস রচনা (বিশেষতঃ প্রাচীন ভারত ও

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশ সম্পর্কে) নিতান্তই কঠিন।

মুসলিম আগমনের পর থেকেই এ এলাকার মোটামুটি সুসংবদ্ধ ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। এ সময় থেকেই নানা ধরনের ঐতিহাসিক উপাদান ও তথ্য-সূত্রের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। সমসাময়িক ঐতিহাসিক রচনাবলী, মুদ্রা, শিলালিপি, সাহিত্য, বিদেশী পরিব্রাজক ও পর্যবেক্ষকদের বিবরণ এসব উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। এ দেশে মুসলিম আগমনের পর এখানকার সাংস্কৃতিক জীবনে বড় রকমের পরিবর্তন সূচিত হয়। সাহিত্য, শিল্পকলা ও স্থাপত্যে অলৌকিক দেবদেবীর পরিবর্তে মানুষই প্রধান ও প্রবল চরিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। যা কিছু বীরোচিত ও নায়কোচিত তার সবই আগে ছিলো দেবতার জন্য নির্ধারিত। মুসলিম আমলে দেবতার সেই আসনে মানুষ বরেণ্য হয়ে ওঠে। সাহিত্যক্ষেত্রে এর বিরাট প্রভাব পড়ে এবং এই পরিবর্তন ঐতিহাসিক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে থাকে।

১.৩. মুসলিম আমলের ইতিহাস ও সাহিত্যিক উপাদানগুলি প্রাক-মুগল ও মুগল– এই দুই ভাগে বিভক্ত। প্রাক-মুগল আমলের ইতিহাসের প্রধান উপাদানগুলি হলো দিল্লীতে লিখিত আত্মকাহিনী, পূর্ববর্তী ও সমকালীন আরব পণ্ডিত, বণিক ও ভৌগোলিকদের রচনাবলী, সমকালীন সাহিত্য ও বিদেশী পর্যবেক্ষক ও পরিব্রাজকদের বিবরণী। প্রাক-মুগল ও মুগল আমলের দিল্লীর শাসকদের উদ্যোগে বহু ঐতিহাসিক বিবরণ লিখিত হয়। প্রশাসকেরা ইতিহাস লেখার কাজে দরবারী লেখক নিযুক্ত করতেন এবং অন্য লেখকদেরকেও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বাংলার সুলতানদের উদ্যোগে এ ধরনের ইতিহাস লিখিত হয়েছে বলে জানা যায় না। তবে দিল্লীতে সমসাময়িককালে লিখিত ইতিহাস এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্য-সূত্রের মাধ্যমে এ অভাব ব্যাপকভাবে পূরণ হয়েছে। উত্তর ভারত ও বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াগত মিল ছিলো। তাই দিল্লী ও উত্তর ভারতে লিখিত ইতিহাসে বাংলার মুসলিম রাজ্য বিস্তারের পারিপার্শ্বিক অবস্থার তথ্য ছাড়াও রাজ্য বিস্তারের বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়।

দিল্লীর প্রাথমিক পর্যায়ের ধারা বিবরণীর মধ্যে আবু উমর মিনহাযউদ্দীন উসমান বিন উদ্দীন আল-যুযানীর নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। দিল্লীর সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদের শাসনকালে (১২৪৬-১২৬৬ খ্রীস্টাব্দ) উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীরূপে মিনহায এই বিবরণী তৈরী করেন। সুলতানের নামানুসারে তিনি তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেন 'তাবাকাত-ই-নাসিরী'। বাংলায় মালিক ইয্য-উদ্-দীন তুগরল তুগান খানের শাসনকালে (১২৪২-৪৪) মিনহায এ এলাকা সফর করেন। উড়িষ্যার গভর্নর ইয্য-উদ্-দীন ছিলেন তাঁর সহযাত্রী। মালিক ইয্য-উদ্-দীন ও অযোধ্যার গভর্নর মালিক তমার খান কীরানের বিরোধ মীমাংসায়ও মিনহায মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেন। গ্রন্থের মালমশলা সংগ্রহের ব্যাপারে, বিশেষত ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর যে সব সাথি তখনো পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহে মিনহায বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। তাবাকাত-ই-নাসিরী তাই সমকালীন দিল্লীর শাসকদের সাথে সাথে ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাস হিসেবেও সমধিক খ্যাতি লাভ করে। গ্রন্থের বিরাট অংশ জুড়ে তিনি বাংলার খিলজী মালিকদের সম্পকে আলোচনা করেছেন এবং দিল্লীর সুলতানদের সাথে এ এলাকার সম্পর্ক তুলে ধরেছেন। তাঁর দৃষ্টি প্রধানত রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনা-প্রবাহের প্রতি নিবিষ্ট ছিলো। তবে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিষয়ে তাঁর আলোকপাত খুবই তাৎপর্যময়। সামগ্রিক বিবেচনায় তাবাকাত-ই-নাসিরী বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার বিবরণ ও মুসলিম রাজত্বের প্রথম ষাট

www.nagorikpathagar.org

বছরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উৎস।

এরপরেই গুরুত্বের দিক থেকে তারীখ-ই-ফীরূযশাহীকে উল্লেখ করা আবশ্যক। এই একই নামে দু'টি গ্রন্থ রয়েছে। ফীরূযশাহ তুগলকের শাসনকালে (১৩৫২-১৩৮৮) জিয়াউদ্দীন বারনী ও শামস-ই-সীরাজ আফীফ আলাদাভাবে গ্রন্থ দু'টি প্রণয়ন করেন। দু'জনের কেউই বাংলায় আসেননি। তবে প্রথম দুই ইলিয়াসশাহী শাসকের সাথে ফীরূযশাহ তুগলকের দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ এ এলাকার ঘটনাবলীর সাথে লেখকদ্বয়ের পরিচয়ের সুযোগ সৃষ্টি করেছিলো। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকগণ বারনী ও আফীফের বিবরণীর যথার্থতা স্বীকার করেছেন।

উপরোল্লিখিত তিনটি বিবরণী ছাড়া আরেকটি রচনাকে বিবেচনা করা প্রয়োজন। কবি আমীর খসরু রচিত 'কীরান আল-সা'দাইন' বা 'দুই সৌভাগ্যের মিলন'। এটি একটি কাব্যগ্রন্থ। আমীর খসরু দু'বার বাংলা সফর করেন। প্রথমে তিনি বাংলায় আসেন সুলতান বলবনের অভিযানকালে (১২৮০), শাহজাদা নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ বুগরা খানের সহযাত্রী হয়ে। দ্বিতীয়বার (১৩২৫) সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুগলকের সাথে। মাঝখানে (১২৮৯) দিল্লীর সুলতান মুঈজউদ্দীন কায়কোবাদের সাথিরূপে তৎকালীন বাংলার সুলতান নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ বুগরা খানের বিরুদ্ধে অভিযানেও তিনি শরিক হন। কায়কোবাদ ছিলেন বুগরা খানের পুত্র। উত্তর ভারতের সরযূ নদীর তীরে দিল্লী ও বাংলার সুলতানদ্বয়ের (পিতা-পুত্র) সাক্ষাত ঘটে। পারস্পরিক সমঝোতা এবং বাংলা ও দিল্লী উভয়ের অস্তিত্বের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে এই অভিযানের শান্তিপূর্ণ ও সুখকর পরিসমাপ্তি ঘটে। আমীর খসরু যে বিবরণ দিয়েছেন, কাব্যকর্ম হওয়া সত্ত্বেও তা ঐ ঘটনার দলিলরূপে স্বীকৃত। এই কাব্যগ্রন্থে তৎকালীন রাজ-দরবারের রসম-রেওয়াজ ও আনুষ্ঠানিকতার বিবরণ পাওয়া যায়। তা ছাড়া তাবাকাত-ই-নাসিরী ও তারীখ-ই-ফীরূযশাহী'র সময়কালের মধ্যে এই কাব্যগ্রন্থ সেতুবন্ধনও রচনা করেছে।

প্রাথমিক পর্যায়ের অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আরো দু'টি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো ঃ ঈসামী রচিত 'ফুতুহ-আল-সালাতীন' এবং ইয়াহিয়া বিন আবদুল্লাহ আল সরহিন্দীর 'তারীখ-ই-মুবারকশাহী'। ফুতুহ-আল-সালাতীন বাহমনী সুলতান আলাউদ্দীন হাসানের আমলে (১৩৪৭-৫৮) দাক্ষিণাত্যে রচিত হয়। তারীখ-ই-মুবারকশাহী দিল্লীতে রচিত হয় সুলতান কুতুবউদ্দীন মুবারক শাহের আমলে (১৪২১-৩৪)। ঈসামী কিংবা ইয়াহিয়া বাংলা সফর করেননি। তারা দিল্লীর শাসকদের বিবরণী প্রণয়নকালে বাংলার ঘটনাবলীর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাদের সৎ পর্যবেক্ষণের কারণেই গ্রন্থ দু'টি ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ করেছে।

সুলতানী আমলের বাংলায় যে সব রচনা পাওয়া যায় তার মধ্যে কয়েকটি পত্র ঐতিহাসিক। সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের (১৩৯০-১৪১১) সমকালীন প্রখ্যাত আলিম মুজাফফর শামস বলখী এবং রাজা গনেশ ও জালালউদ্দীন মুহাম্মদ শাহে'র সমকালীন নূর কুত্ব-উল-আলম ও মীর সাইয়েদ আশরাফ জাঁহাগীর সিমনানীর পত্র উল্লেখযোগ্য। মুজাফফর শামস বলখী অমুসলিমদের ওপর ইলিয়াসশাহী শাসকদের অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতার বিপজ্জনক পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে সিকান্দার শাহকে দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন। শায়খ নূর কুত্ব-উল-আলম ও আশরাফ জাঁহাগীর সিমনানীর পত্রে সুলতানদের ভ্রান্ত নীতির কারণে অতি অল্প সময়ে একাধিক মুসলিম শাসককে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হত্যা করে রাজা গনেশ কর্তৃক ক্ষমতা দখল এবং এর ফলে সৃষ্ট অরাজকতা ও পরবর্তীতে এই বিপজ্জনক অবস্থার অবসানের নাটকীয় ঘটনাবলী জানা যায়।

২.১. বাংলায় মুগলদের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে

www.nagorikpathagar.org

(১৬০৫-২৭)। এ সময় থেকে বাংলার রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ দিল্লীর ঘটনাবলীর অংশে পরিণত হয়। কোন কোন মুগল সম্রাট আত্মজীবনী রচনা করেছেন। কেউ কেউ ঐতিহাসিকদের দিয়ে তাদের ইতিহাস লিখিয়েছেন। এসব ইতিহাস সাধারণত প্রদেশ বা সুবাহসমূহে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের পাঠানো প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তিশীল ছিলো। এতে জনগণের সামাজিক অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ ছিলো না। তবে সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহের বিশ্বস্ত বিবরণ হিসেবে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ।

সরকারী উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে স্বাধীন প্রচেষ্টায়ও কিছু কিছু ইতিহাস প্রণীত হয়েছে। মুগল আমলের ঐতিহাসিক রচনাবলীর মধ্যে প্রথম ও সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলো জহিরউদ্দীন মুহাম্মদ বাবুরের তুর্কী ভাষায় লিখিত স্মৃতিকথা 'বাবুরনামা'। এলফিনস্টোন 'বাবুরনামা'কে 'এশিয়ার প্রকৃত ইতিহাস গ্রন্থ' রূপে বর্ণনা করেছেন।

হুমায়ূনের ইতিহাস লিখেছেন তাঁর বোন গুলবদন বেগম (১৫২৩-১৬০৩)। 'তাযকিরাতুল ওয়াকিয়াত' নামে আরেকটি গ্রন্থে হুমায়ূনের পারস্যে অবস্থানকালীন সময়ের বিবরণ লিখেছেন জওহার নামক তার এক কর্মচারী।

আকবরের রাজত্বের (১৫৫৬-১৬০৫) সরকারী ইতিহাস 'আইন-ই-আকবরী' লিখেছেন আবুল ফযল ইবনে শায়খ আল-মুবারক (১৫৫১-১৬০২)। কিন্তু বাংলার ইতিহাস বিচারে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হলো নিযামউদ্দীন আহমদ-এর 'তাবাকাত-ই-আকবরী' (১৫৯২-৯৩)। বেসরকারী উদ্যোগে গজনভী বংশের শাসনকাল থেকে আকবরের ছত্রিশতম বছর পর্যন্ত শাসনামলের সাধারণ ইতিহাসমূলক গ্রন্থ এটি। তাবাকাত-এর বিশাল অধ্যায় জুড়ে বাংলার প্রাক-মুগল শাসকদের সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক আলোচনা রয়েছে। আবদুল কাদির বাদায়ুনী নিজস্ব উদ্যোগে 'মুনতাখাব আত্-তাওয়ারিখ' রচনা করেন একই সময়ে। এই গ্রন্থে তিনি আকবরের নীতিসমূহের সমালোচনা করেছেন বেং আবুল ফযলের বাগাড়ম্বরপূর্ণ ও স্তুতিমূলক বিবরণের সংশোধনী উপস্থাপন করে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাবলীর মূল্যবান সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

'তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী' সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তাঁর সমকালের পরিচয় পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীরের সভাসদ মু'তামাদ খান 'ইকবাল নামা-ই-জাহাঙ্গীরী' নামক গ্রন্থে বাবুর থেকে জাহাঙ্গীর পর্যন্ত সময়ের মুগল শাসনের ইতিহাস লিখেছেন।

শাহজাহানের রাজত্বকালের (১৬২৮-১৬৫৮) সরকারী ইতিহাস প্রথমে সংকলিত করেন আবদুল হামিদ লাহোরী। মুহাম্মদ ওয়ারিস এটিকে সম্পূর্ণ করেন। সম্রাট আওরঙ্গযীবের মৃত্যুর পর সাকী মুস্তায়িদ নামক একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত রাষ্ট্রীয় দলিলপত্রের সাহায্য নিয়ে 'মা'সীর-ই-আলমগীরী' (১৭১০) রচনার কাজ সম্পূর্ণ করেন। এ ছাড়া কাফি খান 'মুনতাখাব-ই-লুবাব' নামে আওরঙ্গযীবের শাসনামলের আরেকটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। মুগল আমলের এসব গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে প্রাসঙ্গিকভাবেই বাংলা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

২.২. বাংলায় নিযুক্ত মুগল শাসনকর্তাগণও বহু গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বিবরণ তৈরী করিয়েছেন। এসব রচনার মধ্যে মীর্যা নাথান বা শিতাব খান নামে পরিচিত আলাউদ্দীন ইসফাহানীর লেখা 'বাহারিস্তান-ই-গায়েবী' শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে বিবেচিত। ইসলাম খাঁর সাথে তিনি এ দেশে আসেন। বাংলার বিভিন্ন অংশে তিনি কুড়ি বছরেরও বেশী সময় দায়িত্ব পালন করেন। এ দেশের জন-জীবন ও ভূপ্রকৃতির সাথে একাত্ম হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। চার খন্ডে বিভক্ত বাহারিস্তান-ই-গায়েবীতে তিনজন মুগল প্রতিনিধি ইসলাম খাঁ, কাসিম খাঁ ও ইবরাহিম খাঁ এবং বিদ্রোহী যুবরাজরূপে বাংলায় শাহজাহানের কার্যকলাপ আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থটি

www.nagorikpathagar.org

বাংলায় বারো ভূঁইয়াদের বিরুদ্ধে মুগলদের যুদ্ধাভিযান, প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা, মুগলদের জীবন প্রণালী ও তৎকালীন বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিশ্বস্ত বিবরণরূপে প্রসিদ্ধ। বাহারিস্তান-ই-গায়েবীর পরের সময় থেকে শুরু করেছেন মুহাম্মদ সাদিক ইসফাহানী তাঁর 'সুব্হ-ই-সাদিক'। শাহ সুজার (১৬৩৯-৬০) সময়কাল পর্যন্ত বাংলার ঘটনাবলীর বিবরণ, তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাবলী ও সমকালীন বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের বিবরণ পাওয়া যায় সুব্হ-ই-সাদিকে। 'তারীখ-ই-শাহ সুজা' (১৬৬০) লিখেছেন মুহাম্মদ মাসুম। এর পরের বিখ্যাত লেখক শিহাবউদ্দীন মুহাম্মদ ওয়ালী তালিশ। তিনি মীর জুমলার আমলে (১৬৬০-৬৩) লিখেছেন 'আযাইব-ই-গারিবা'। গ্রন্থটি 'ফা'তিয়াহ্-ই-ইবরিয়া' বা 'তারীখ-ই-মুল্ক-ই-আসাম' নামেও অভিহিত।

২.৩. আওরঙ্গযীবের মৃত্যুর (১৭০৭) পর অর্ধ শতাব্দীব্যাপী স্বাধীন নবাবী আমলের বেশ কিছু ঐতিহাসিক গ্রন্থ রয়েছে। এগুলির বেশীরভাগই বৃটিশ শাসনের প্রাথমিক বছরগুলিতে নবাবদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দ্বারা লিখিত। তার মধ্যে আযাদ হুসাইনের 'নও বাহার-ই-মুরশিদকুলী খান', ইউসুফ আলী কর্তৃক আলীবর্দী খান সম্পর্কে লেখা 'আহওয়াল-ই-মহব্বত জঙ', করম আলীর লেখা 'মুজাফফর নামা' উল্লেখযোগ্য। শাহজাদা আযীমুশশানের (১৬৯৭-১৭১২) সুবাহদারী থেকে আলীবর্দী খানের মৃত্যু (১৭৫৬) পর্যন্ত সময়কালের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস গ্রন্থ 'তারীখ-ই-বাংগালী' রচনা করেছেন সলিমুল্লাহ। এ সময়ে রচিত গুলাম হুসাইন তাবাতাবাই'র 'সিয়ার-আল-মুতাখ্খিরীন' বাংলার ইতিহাসে এক অনন্য সংযোজন। ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে তিন খন্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থের প্রথম খন্ডে প্রাচীন আমল থেকে আওরঙ্গযীব পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ডে মুরশীদকুলী খানের সময় থেকে শুরু করে রচনাকাল পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এই লেখক ইংরেজদের পক্ষের লোক ছিলেন এবং মীর কাসিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। এই পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে তিনি নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করেছেন। এ সকল বিচ্যুতি বাদ দিলে গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান। বাংলার মুসলমানদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গ্রন্থরূপে গুলাম হুসাইন সলীমের 'রিয়ায-উস-সালাতীন' সর্বাধিক গুরুত্বের দাবিদার। তিনি তাঁর গ্রন্থে তাবাকাত-ই-নাসিরী ও তারীখ-ই-ফীরূযশাহী এবং অন্যান্য মুগল ঐতিহাসিকের রচনাবলীসহ তাঁর পূর্ববর্তী সকল উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ব্যাপক পর্যালোচনা ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের কারণে তাঁকে বাংগালী মুসলমানের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকও বলা যেতে পারে।

৩.১. দীর্ঘকাল পর্যন্ত এ দেশের ইতিহাস রাজা-বাদশাহ ও তাদের নিকটবর্তী কিছু ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত ছিলো। বিপুল জনগণের ব্যাপক জীবন তথা সাধারণ মানুষের ইতিহাস রচনার সূচনা হয়েছে অনেক পরে। এ ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন ডক্টর কে. এম. আশরাফ তাঁর The Life and Condition of the People of Hindustan নামক গ্রন্থের মাধ্যমে। ডক্টর আই. এইচ. কোরেশীর লেখা The Muslim Community of the Indo-Pakistan Sub-continent উপমহাদেশের জনসাধারণের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। হিন্দু আমলের ওপর বেশ কিছু ইতিহাস রচিত হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত History of Bengal (প্রথম খন্ড) এবং ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' উল্লেখযোগ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ও স্যার যদুনাথ সরকার সম্পাদিত History of Bengal (দ্বিতীয় খন্ড) মুসলিম আমলের উপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু

www.nagorikpathagar.org

জনগণের ইতিহাস বলতে যা বুঝায়, অর্থাৎ তাদের সংস্কৃতি, জীবনাচরণ ও কৃষ্টি–এ গ্রন্থে তার প্রতিফলন উল্লেখযোগ্য নয়।

বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীরূপে মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে গবেষণা গ্রন্থের অভাব অনেকাংশে পূরণ করেছেন ডক্‌টর এ. করিম তাঁর Social History of The Muslims in Bangal গ্রন্থের মাধ্যমে। তবে সেখানেও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিবরণই প্রাধান্য পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে আরও অগ্রণী হয়েছেন ডক্‌টর এম. এ. রহীম তাঁর Social and Cultural History of Bengal গ্রন্থে। তাঁর এই মূল্যবান গ্রন্থটি ১৯৬৩ সালে করাচী থেকে দুই খন্ডে প্রকাশিত হয়। বাংলা একাডেমী ১৯৮২ সালে এর তরজমা প্রকাশ করে। এ পর্যায়ে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন প্রফেসর ডক্‌টর মোহাম্মদ মোহর আলী। তাঁর গ্রন্থের নাম History of the Muslims of Bengal.

৩.২. শাসক ও তাদের আশপাশের মুষ্টিমেয় লোকের কর্মকান্ডের ইতিহাস রচনায় মুদ্রা, শিলালিপি, স্থাপত্য কর্ম প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও সরকারী দলিলপত্রের ওপর যতটা নির্ভর করা যায়, জনগণের ইতিহাস রচনায় তারচে বেশী নির্ভর করতে হয় সমকালে রচিত সাহিত্যের ওপর। প্রাক-মুসলিম আমলের, বিশেষত সেন-বর্মন পর্বের বাংলার জনগণের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় চর্যা-সাহিত্যে। দশ ও বারো শতকের মধ্যে রচিত এই চর্যাগুলি ১৯০৭ সালে ডক্‌টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে উদ্ধার করার আগে বাংলার পাল ও সেন-বর্মন যুগের ইতিহাস বহুলাংশে একরৈখিক ছিলো। চর্যা সাহিত্য নেপালে দেশান্তরিত হওয়া সম্পর্কে অধ্যাপক দেবেন্দ্রকুমার ঘোষ লিখেছেন : *"পাল বংশের পরে এতদ্দেশে সেন বংশের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের চিন্তা অতিশয় ব্যাপক হইয়া ওঠে ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রবাহ বিশুষ্ক হইয়া পড়ে। সেন বংশের রাজারা সবাই ব্রাহ্মণ্য ধর্মী, তাহাদের রাজত্বকালে বহু ব্রাহ্মণ বংগ দেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করে ও অধিকাংশ প্রজাবৃন্দ তাহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এভাবে রাজা ও রাষ্ট্র উভয়ই বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিরূপ হইলে বাঙ্গালার বৌদ্ধরা স্বদেশ ছাড়িয়া নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি পার্বত্য প্রদেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। বাঙ্গালার বৌদ্ধ সাধক কবিদের দ্বারা সদ্যোজাত বাঙ্গালা ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলোও তাঁহাদের সঙ্গে বাঙ্গালার বাহিরে চলিয়া যায়। তাই আদি যুগের বাঙ্গালা গ্রন্থ নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য।" (–শ্রী দেবেন্দ্রকুমার ঘোষ : প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস, পৃ: ৯-১০)।*

চর্যা সাহিত্যে দশ থেকে বারো শতক পর্যন্ত যে জনজীবনের চিত্র পাওয়া যায়, তাতে শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলার অভ্যন্তরে সাধারণ মানুষের নীরব বিক্ষোভ চিত্রিত হয়েছে। তেরো শতকের বৌদ্ধ কবি রামাই পন্ডিতের লেখা 'নিরঞ্জনে রুষ্মা' কাব্যে সেন আমলে বাংলার জনগণের ওপর ব্রাহ্মণ শোষকদের অত্যাচার ও নিপীড়ন এবং সে প্রেক্ষাপটে ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের আর্থ-সামাজিক পটভূমির নির্ভরযোগ্য ইতিহাস বিধৃত হয়েছে।

মুসলিম শাসনামলে রচিত সাহিত্য তৎকালীন জনগণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দলিল। বাংলা রচনাবলী থেকে দেখা যায়, শাসকদের উদার পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রসার লাভ করেছে। একই সাথে আরবী ও ফারসী ভাষায় রচিত সাহিত্যও তৎকালীন সমাজের সাংস্কৃতিক পরিচয় বহন করে। সে সব চিত্র ইতিহাসের অমূল্য উপাদান। শাহ মুহাম্মদ সগির, কবি মুজাম্মিল, ফয়জুল্লাহ এবং পরবর্তীতে দৌলত উজির বাহরাম খান ছাড়াও মুকুন্দ রাম, বংশীবদন প্রমুখ হিন্দু সাহিত্যিকের রচনায় তৎকালীন বাংলার

www.nagorikpathagar.org

সামাজিক ইতিহাসের উপাদান বিপুলভাবে ছড়িয়ে রয়েছে।

এভাবে বাংলার কাব্যে ও গদ্য সাহিত্যে জনগণের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবন এবং তাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বিরহ, সংগ্রাম ও সংক্ষোভের বিষয়সমূহ বিধৃত হয়েছে। এসব সাহিত্যিক উপাদান গণ-মানুষের ইতিহাস রচনার প্রধান সহায়ক হিসাবে ভূমিকা পালন করছে।

৪.১. ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক উপাদানের এই সম্মিলিত প্রবাহের সাহায্যে আমি এই গ্রন্থে একটি নিরপেক্ষ বিবেচনায় অগ্রসর হয়েছি। বলা বাহুল্য, আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কারণেই মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমার অবচেতন মনে একটি প্রতিক্রিয়াও কাজ করেছে। সেটি হলো প্রধান ও প্রণিধানযোগ্য হিন্দু ঐতিহাসিকদের অনেকেই ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে অসততার পরিচয় দিয়ে বিকৃত তথ্য পরিবেশন করেছেন এবং উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করেছেন কিংবা পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন। এটি একদিকে যেমন মিলিত হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের মধ্যে চিড় ধরিয়েছে, অন্যদিকে আবহমান বাংলা ও বাংগালীর মুক্তি সংগ্রামকে আমাদের দৃষ্টি থেকে ক্রমশ দূরে ঠেলে দিচ্ছে।

এরই ফলে তিনটি সাধারণ মতামত জনসাধারণ্যে, বিশেষত শিক্ষার্থী ও অনুসন্ধিৎসু মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হচ্ছে। একটি শ্রেণী ধারণা লাভ করেছেন যে, বাংগালীর মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয়েছে ১৯৪৭-এ এবং বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন হয়ে তার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটেছে ঊনসত্তুরের গণঅভ্যুত্থান ও একাত্তরের সশস্ত্র সংগ্রামে; অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ও সাধারণ পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন পাঠকরা মনে করেন যে, আসল মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয়েছে ১৮৫৭-তে (কিংবা ১৭৫৭-র বিপর্যয়ের মধ্যেই যার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে); তৃতীয় পর্যায়ের পাঠকরা এই সংগ্রামকে আরেকটু গভীরভাবে বিবেচনা করে থাকেন। এদের মধ্যে এক দলের ধারণা, ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বংগ-বিজয় এবং অন্য দলের মতে, স্বাধীন সুলতানী বা নবাবী আমল থেকেই বাংলার মুক্তি আন্দোলনের শুরু। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব ও গবেষণা প্রমাণ করে যে গঙ্গা-বিধৌত এ পলিময় ভূখন্ডের অধিবাসীদের সংগ্রামের ইতিহাস এসব ধারণার তুলনায় অনেক প্রাচীন। মাটি ও মানুষের অকৃত্রিম আকর্ষণে এই নিরীহ ও কোমল জাতি সশস্ত্র ও সংগ্রামী হয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে। আমার কেন্দ্রীভূত আগ্রহ ছিলো এই মুক্তি সংগ্রামের ধারাবাহিকতাকে গ্রন্থিত করা।

আগেই বলেছি, ইতিহাস হচ্ছে পেরিয়ে যাওয়া বর্তমানের দলিল। এই দলিল অবশ্যই নিরপেক্ষতা ও সততার দাবী রাখে। এই দাবী অপেক্ষাকৃত বেশী মেটাতে পারেন বিশেষজ্ঞরা। আমি বিশেষজ্ঞ নই, পাঠক। আমার ব্যক্তিগত আগ্রহে আমি ইতিহাস পড়েছি। পরস্পরবিরোধী তথ্য ও মন্তব্যের কারণে আমার এ কৌতূহল ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। পেশাজীবী ঐতিহাসিকদের অবচেতন ত্রুটি ও পণ্ডিতম্মন্য বুদ্ধিজীবীদের ইতিহাস-বিকৃতি এই অনুসন্ধিৎসাকে আরো তীব্র করেছে। বলা যায়, এই ক্ষোভ থেকেই লেখার সূচনা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আয়োজিত সেমিনারে (১৯৮৫) আমি একটি লিখিত আলোচনা পাঠ করি। নিবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর অগ্রজ ও বন্ধুস্থানীয় বহুজনের অযাচিত প্রশংসা লাভ করে। প্রধানত এঁদের উৎসাহেই আমি বিষয়টির প্রতি অধিক মনোযোগী হতে বাধ্য হই এবং আমাদের পূর্ব পুরুষগণ তাঁদের অব্যাহত সংগ্রাম ও অসামান্য সাধনার মধ্য দিয়ে জাতিসত্তার যে উদ্বোধন ও বিকাশ ঘটিয়েছেন তার ধারাবাহিকতা দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারি

www.nagorikpathagar.org

না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাঁরা সংগ্রাম করেছেন আর্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, সেন-বর্মন শোষণের বিরুদ্ধে এবং নিকট ইতিহাসে এই লড়াই তীব্র হয়েছে ইংরেজ ও বর্ণহিন্দুদের সাথে। আর্য আগমনকাল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত আমাদের মুক্তি সংগ্রামের এ অব্যাহত ধারা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করেই আমরা আত্মপরিচয়কে উপলব্ধি করতে পারি। এ প্রেরণা থেকেই বাংলা ও বাংগালীর মুক্তি সংগ্রামের ধারাবাহিক কার্যকারণ আলোচনা করতে প্রয়াসী হয়েছি। এত ক্ষুদ্রায়তন একটি বইতে সামগ্রিক ঘটনা-প্রবাহকে ধরে রাখাই কষ্টকর। ইতিহাসের Synopsis পরীক্ষার জন্য সহায়ক হতে পারে, কিন্তু একটি জাতির শিকড় সন্ধানের জন্য যথেষ্ট নয়। বইটিকে তাই ১৭৫৭ পর্যন্ত কালপ্রবাহে অসম্পূর্ণভাবে শেষ করতে হলো।

১৭৫৭ সাল থেকে মুক্তি সংগ্রামের নতুন পর্যায় শুরু। ফকির বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, জিহাদ ও ফরায়েজী আন্দোলন আর সিপাহী বিপ্লব মুক্তি সংগ্রামের একেকটি ধাপ। মুক্তি সংগ্রামের পর্যায়ক্রমিক ইতিহাসে এর গুরুত্ব সীমাহীন। তাই দাবীও বিরাট। এই দাবীকে এড়িয়ে যাওয়ার অর্থ পাঠককে ফাঁকি দেয়া। তদুপরি ইতিহাসের এই কাল নিয়ে গবেষণা হচ্ছে প্রচুর। সুতরাং বিতর্কেরও অবকাশ রয়েছে। কারণ দুই শতাব্দীকালের এই পর্যায়ে কায়েমী স্বার্থ এবং বঞ্চনা, শোষণ ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের যে বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি তৈরী হয়েছে, তার শিকড় যেমন গভীর, তেমনি প্রেক্ষাপটও বিশাল। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই পর্যায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা ও তাগিদের কারণে এবং প্রস্তুতির প্রয়োজনে বইটি মাঝ পথে সমাপ্ত করতে বাধ্য হলাম।

৪.২. প্রতিটি ঘটনার একটি কার্যকারণ থাকে, প্রতিক্রিয়াও থাকে। লেখকেরও একটি দায় থাকে পাঠকের কাছে। সেই দায় একা বহন করার যোগ্যতা আমার নেই। অধ্যক্ষ নূরুল করিম, অধ্যাপক আবদুল গফুর, জনাব আবদুল মান্নান তালিব, অগ্রজ প্রতিম শাহ আবদুল হালিম ও জনাব হাসান মাহমুদ, বন্ধু-সাংবাদিক মোহাম্মদ এনায়েতউল্লাহ, আতা সরকার এবং বিশেষভাবে বুলবুল সরওয়ারকেও এর দায় অনেকখানি নিতে হবে। একান্ত সুহৃদ ও সাথী মুহম্মদ মাহবুবুল হক ও আমার স্ত্রী মাকসুদা বেগমের ঋণ অপরিসীম। লৌকিক ধন্যবাদ এদের সহযোগিতার বিনিময় হতে পারে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ডক্টর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন শেষ মুহূর্তে অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও বইটি দেখে দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর আজিজুর রহমান মল্লিক বইটির মুখবন্ধ লিখে বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর মূল্যবান মতামত আমাকে নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত করেছে।

সৃজন প্রকাশনী এই কাঁচা কাজকে প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করেছে। এটি তাদের বদান্যতা। কর্পোরেটের কর্মীরা বইটির দ্রুত প্রকাশে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। শিল্পী মোমিনউদ্দীন খালেদের প্রচ্ছদ বইটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়েছে। পিপাসু পাঠক যদি সকলের এ সার্বিক প্রচেষ্টাকে সমাদর করেন, আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে তৃপ্তি বোধ করবো।

মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান

১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ **ঢাকা**

www.nagorikpathagar.org

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় পৃষ্ঠা

নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি ১-১৬

বং থেকে বাংলা, গংগারিড়ী বা বংগ-দ্রাবিড়ী, জাতীয় ঐক্যের গোড়ার কথা, প্রত্ন-প্রস্তর যুগের নিদর্শন, সেমিটিক ঐতিহ্য, বুনিয়াদী সংস্কৃতির বনেদী রূপ, নদী ও মানুষ

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম প্রতিরোধ সংগ্রাম ১৭-৪৩

আর্য আগমনের পটভূমি, বংগ-দ্রাবিড়দের প্রতিরোধ, 'দেবতা' ও 'অসুর'-এর লড়াই, বৌদ্ধ ও জৈন প্রতিরোধ, বৌদ্ধ ধর্মে বিকৃতি, গুপ্ত আমলে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির আর্যীকরণ, শশাংকের বৌদ্ধ-নিধন ও বোধিবৃক্ষ ছেদন, মাৎসান্যায়ের একশ বছর

তৃতীয় অধ্যায়

পাল শাসনের চারশ বছর : গৌরব পুনরুদ্ধার ৪৪-৫৪

জন-সমর্থনপুষ্ট সরকার, মুসলিম অভিযানের ফলে পাল শাসনের আয়ু বৃদ্ধি, কর্ণাটি সেন-বর্মন অভিযান, পাল রাজত্বের চারশ বছর : গৌরব প্রতিষ্ঠার যুগ, সাংস্কৃতিক বিপর্যয় ও রাজনৈতিক পতন

চতুর্থ অধ্যায়

সেন-বর্মন শোষণ : দ্বিতীয় প্রতিরোধ সংগ্রাম ৫৫-৭৫

আগন্তুক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা, আমলাতন্ত্রের বিস্তার ও বর্নাশ্রমের শক্ত গিরো, ছত্রিশ জাতের উৎপত্তি, সমাজ জীবনে ভাঙা-গড়া, দেশান্তরী বাংলা ভাষা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতির চেহারা, বৌদ্ধ সভ্যতার বিলুপ্তি, মুক্তি সংগ্রামে নতুন ধারার সূচনা, নীরব বিপ্লবের ধারা, সেন রাজত্বের পতন, মুক্তির প্রতীকরূপে বখতিয়ার খিলজী

পঞ্চম অধ্যায়

নতুন বিপ্লবের পদধ্বনি ৭৬-৯১

'রিয়েল কিংস অব বেঙ্গল', বাংলায় ইসলাম প্রচারের পটভূমি, সাহাবী আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর বাংলায় আগমন প্রসঙ্গ, রাজা চেরুমালের ইসলাম গ্রহণ, হযরত উমরের খিলাফতকালে ইসলাম প্রচার, উনসত্তুর হিজরীর মসজিদ, পনেরো হিজরী সনে মুসলিম অভিযান, ভারতীয় ও আরব পণ্ডিতদের সংলাপ, স্থল ও নৌপথে ইসলাম প্রচার, জনগণের ভাষায় ইসলাম প্রচার

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুক্তি সংগ্রামের মহানায়কেরা : প্রথম পর্যায় ৯২-১০৩

ভিত্তি গড়লেন যাঁরা, বায়েজিদ বিস্তামী, সুলতান মাহমুদ বলখী মাহিসওয়ার, শাহ মোহাম্মদ সুলতান রুমী, বাবা আদম শহীদ, শাহ নিয়ামতউল্লাহ বুতশিকন, শাহ মখদুম রূপোস

www.nagorikpathagar.org

সপ্তম অধ্যায়

মুক্তি সংগ্রামের মহানায়কেরা : দ্বিতীয় পর্যায় ১০৪–১১৪

মুসলিম শাসনের ভিত্তি রচন, মুসলিম শাসনামলের ইসলাম প্রচারের ধারা, মুসলিম শাসনামলের ইসলাম প্রচারের বৈশিষ্ট্য, ইসলাম প্রচারকদের রাজনৈতিক ভূমিকা, শিক্ষা বিস্তারে প্রচারকদের ভূমিকা, প্রচারকদের মানব-সেবার আদর্শ, শাসক ও জনগণের মধ্যে যোগসূত্র, ইসলাম প্রচার ও বাংলার মুসলিম জনসংখ্যার প্রকৃতি

অষ্টম অধ্যায়

বাংলার সমাজ বদল : মুসলিম শাসনামল ১১৫–১৩৯

মুসলিম শাসনের রাজনৈতিক পটভূমি, মুসলিম শাসকদের ইসলামী প্রেরণা, মুসলিম শাসনের প্রথম একশ বছর, গৌর গোবিন্দ ও শাহজালাল, স্বাধীন সুলতানী আমল, রাজা গনেশের অভ্যুত্থান ও নূর কুত্‌ব-এর প্রতিরোধ সংগ্রাম, নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহ ও খান জাহান আলী, রুকনউদ্দীন বারবাক শাহ ও ইসমাইল গাযী মক্কী, চার হাবশী সুলতান, আলাউদ্দীন হোসেন শাহ, সাইত্রিশ বছরের আফগান শাসন, বাংলায় মুগল শাসন : ঈসা খাঁর প্রতিরোধ সংগ্রাম, মুগল সুবাহদার ও স্বাধীন নবাবদের শাসন

নবম অধ্যায়

মুসলিম অবদানের মূল্যায়ন ১৪০–১৭০

মুসলিম সমাজ গঠনের বৈশিষ্ট্য, মুসলিম শাসনের বৈশিষ্ট্য, গণতান্ত্রিক সমাজাদর্শ প্রতিষ্ঠা, বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ, সাংস্কৃতিক জীবন গঠন, রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা, বাংলা ভাষার উন্নয়ন, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহ্যের নব-নির্মাণ, অর্থনৈতিক গৌরব প্রতিষ্ঠা, ইতিহাসের গঠনমূলক অধ্যায়

দশম অধ্যায়

মুসলিম শাসন : পতনের কার্যকারণ ১৭১–১৯৮

ছয়টি কারণ, বর্ণহিন্দুদের সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি ও শ্রীচৈতন্য, অধঃপতন ও ধ্বংসের প্রতীকরূপে আকবর, সমাজ-সভ্যতার বিপর্যয় ও শাহ ওয়ালিউল্লাহ, বর্ণহিন্দুদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি, ইংরেজ ও হিন্দু বণিক-স্বার্থের আঁতাত, জনগণের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা

একাদশ অধ্যায়

নতুন সংগ্রাম : পলাশী থেকে বক্সার ১৯৯–২১১

নবাব সিরাজ-উদ্‌-দৌলাহ : বৈরী পলাশীর নিঃসঙ্গ পথিক, নবাব মীর জাফর : 'ক্লাইভের গাধা', গণবিদ্রোহের স্ফুলিংগ, মীর কাসিমের প্রতিরোধ সংগ্রাম, বক্সারে ভাগ্যের ফয়সালা, এলাহাবাদ থেকে কলকাতা, শামস-উদ-দৌলাহ : ঢাকার এক নবাবের শেষ চেষ্টা

পরিশিষ্ট ২১২–১১৭

নির্ঘন্ট ২১৮–২৩৬

গ্রন্থপঞ্জী ২৩৭-২৪৫

www.nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়

নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি

১. বং থেকে বাংলা

বিভিন্ন ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত যে 'বংগ' থেকে 'বাংগালাহ' নামের উৎপত্তি হয়েছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ প্রফেসর আহমদ হাসান দানীর মতে ঃ 'বাংগালাহ' বলতে এক সময় কোন অঞ্চল বোঝাতো না, বরং এ দেশের শতকরা তিরানব্বই ভাগ সাধারণ মানুষেরই পরিচয় ছিল 'বাংগালাহ' নামে। সংস্কৃতভাষী মাত্র সাত ভাগ মানুষ নিজেদেরকে 'উচ্চশ্রেণী' বলে পরিচয় দিত এবং সে পরিচয়ে আধিপত্য চালাতো তিরানব্বই ভাগ 'নিম্নশ্রেণীর'[১] মানুষের ওপর। এই অবজ্ঞাত তিরানব্বই ভাগ সাধারণ মানুষ, যাদের পরিচয় ছিলো 'বাংগালাহ', তারাই ছিলো সত্যিকার অর্থে বাংগালী সংস্কৃতির ধারক। তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে বাকী সাত ভাগ সংখ্যালঘু মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির মিল ছিলো না। এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক 'বাংগালাহ' পরিচয়টি-ই কালক্রমে তাদের দেশের ভৌগোলিক পরিচয়ে রূপ লাভ করে।'

প্রফেসর দানী জানাচ্ছেন ঃ 'দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকেও 'বাংগালাহ' শব্দটি এ দেশের শতকরা তিরানব্বই ভাগ 'নিম্নশ্রেণীর' মানুষের পরিচয় বোঝাতো। এই অবজ্ঞাত সাধারণ মানুষের পরিচয়ে দেশের পরিচয় দানের ঐতিহাসিক কাজটি সম্পন্ন হয় বাংলার মুসলিম সুলতানী শাসন আমলে। পাঠান সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহের আমলেই বাংগালী জাতি একক জাতীয় সত্তায় রূপ পায়। তিরানব্বই ভাগ মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি এ সময়ই অভিজাত সামাজিক শক্তির স্বীকৃতি ও সমর্থন লাভ করে।'

'বাংগালাহ' থেকে এ ভূখণ্ডটি বাংলা এবং বর্তমানে বাংলাদেশ নামে পরিচিত। এ প্রসংগে দানীর মন্তব্য ঃ 'অবহেলিত যে বিপুল জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ছিলো 'বাংগালাহ', ইতিহাসের সঠিক ধারায় তা-ই আজ একটি স্বাধীন ও গর্বিত সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে।'[২]

---

১. এ দেশের আদি অধিবাসীরা কখন থেকে কিভাবে নিম্নশ্রেণীরূপে অভিহিত হলো সে আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হয়েছে।

২. ডক্টর আহমদ হাসান দানী ঃ 'বাংলাদেশ নামের উৎপত্তি ও বিবর্তন' শীর্ষক বক্তৃতা, বাংলা একাডেমী, ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৮৭। (৫ ই জানুয়ারী, ১৯৮৭ তারিখের দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার দ্রঃ)।

www.nagorikpathagar.org

'রিয়াজুস সালাতীন' গ্রন্থের প্রণেতা ঐতিহাসিক গোলাম হোসায়ন সলীম উল্লেখ করেন যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর দৌহিত্র হিন্দের নামানুসারে হিন্দ্ নামকরণ করা হয়। হিন্দের পুত্র বং (বঙ)-এর সন্তানেরা বাংলায় বসতি স্থাপন করেন। 'বং'-এর সাথে 'আল' শব্দ যোগ হওয়ার কারণ, বাংলা ভাষায় 'আল' অর্থ বাঁধ। বন্যার পানি বাগানে অথবা আবাদি জমিতে যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য জমির চারদিকে বাঁধ দেয়া হতো। প্রাচীনকালে বাংলার গোত্রপতিরা পাহাড়ের পাদদেশে নিচু জমিতে দশ হাত উঁচু ও কুড়ি হাত চওড়া স্তূপ তৈরি করে তার ওপর বাড়ী বানাতেন। চাষাবাদ করতেন। তাঁরা এ সব বাড়ীকে বলতেন বাংগালা। 'আইন-ই-আকবরী'র লেখক আবুল ফযলও মনে করেন যে, 'বংগ'-এর সাথে বাঁধ অর্থজ্ঞাপক 'আল' যুক্ত হয়েই 'বংগাল' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। অন্যদিকে সেমিটিক ভাষায় 'আল' অর্থ আওলাদ, সন্তান-সন্ততি ও বংশধর। তাই 'বং'-এর বংশধর অর্থে (বং + আল) বঙাল বা বংগাল শব্দের উৎপত্তিটাকে নেহাত উড়িয়ে দেয়া যায় না।[৩] 'বংগ' শব্দটি 'গংগ' শব্দের রূপান্তর বলেও আবার কেউ কেউ যুক্তি দেখিয়েছেন।[৪]

অধ্যাপক আনিসুল হক চৌধুরী উল্লেখ করেন যে, খোদ 'বাংলা' শব্দটি আরবী শব্দমালার পরিবর্তিত রূপ। তিনি লিখেছেন ঃ 'বাংলাদেশের প্রাচীন ভৌগোলিক ও স্থানীয় বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, উজানের গংগার বদ্বীপ অঞ্চল ছিল এক সুগভীর ও দুর্ভেদ্য জঙ্গলময় স্থান। উজানের গঙ্গার জঙ্গলময় স্থান বা জঙ্গলের আরবী হইতেছে 'বাদিয়াতু কানকেল আলিয়াহ'। .... বাদিয়া অর্থাৎ জঙ্গলময় স্থান বা জঙ্গল। কান্ক অর্থ গংগা নদী। 'আলিয়াহ' অর্থ উজান। উক্ত বাদিয়া কান্ক আলিয়াহ হচ্ছে বাদিয়া + কান্ক + আলিয়াহ > বাদ্দা কানকাল্লাহ (প্রাকৃত উচ্চারণ মতে শব্দ-মধ্যে দুই স্বরবর্ণের মধ্যস্থিত ক, গ, চ, ত, দ, প, য় লোপ পায়,- এ সম্পর্কে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বিরচিত 'বাংলা সাহিত্যের কথা' প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য) > বাঙ্কালাহ > বাঙ্কালা (১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের Gournal Asiatique-এর ২০৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত কান্দাহার শিলালিপিতে দেখতে পাওয়া যায়, ঘোড়াঘাট, গৌড়, বাঙ্গালা নামগুলি লেখা হয়েছে কোড়াকাট, কেড়ি এবং বাঙ্কালা রূপে।...'[৫]

২. গাংগারিড়ী বা বংগ-দ্রাবিড়ী

আলেকজাণ্ডারের সময়কার (মৃত্যু খ্রীস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দ) গ্রীক ঐতিহাসিক বিবরণীতে গঙ্গার পুবদিকে 'গংগারিড়ী' বা 'বংগ-দ্রাবিড়ী' নামে এক শক্তিশালী রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। মৌর্য বংশের প্রথম শাসক চন্দ্রগুপ্তের সভায় অবস্থানকালে গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস প্রাচ্য জগতের বিবরণ লিখেন। পরবর্তী গ্রীক লেখকগণ তাঁদের নিজ নিজ

৩. আবদুল মান্নান তালিব ঃ বাংলাদেশে ইসলাম, পৃষ্ঠা ঃ ১৪-১৫।
৪. আখতার ফারুক ঃ বাংগালীর ইতিকথা, পৃষ্ঠা ঃ ৫০-৫১।
৫. অধ্যাপক আনিসুল হক চৌধুরী ঃ বাংলার মূল আরবী, পৃঃ ১৮।

www.nagorikpathagar.org

বইতে মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' নামক গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের উল্লেখ করেন। তা থেকে জানা যায়, চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে গংগারিড়ী রাজ্য স্বাধীন ছিল। গংগারিড়ী রাজ্যের সাথে কলিংগী রাজ্য যুক্ত ছিলো। গংগা নদী ছিল গংগারিড়ী রাজ্যের পুব-সীমা। গংগাবিধৌত বংগের গংগারিড়ী বা বংগ-দ্রাবিড়ী জাতি ছিল শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী। পরাজয়ের গ্লানি কখনও তাদের স্পর্শ করতে পারতো না। কোন রাজশক্তি তাদের হামলা করতে সাহসী হতো না। আলেকজাণ্ডারের অভিযানকালে তাদের চার হাজার সুসজ্জিত রণহস্তী ও অসংখ্য রণতরী রাজ্য রক্ষায় মোতায়েন ছিলো।[৬] আলেকজাণ্ডার পঞ্চনদ অধিকার করে বিপাশা তীরে উপস্থিত হয়েছিলেন। বিপাশা তীরে শিবিরে অবস্থানকালেই তিনি আর্যাবর্তের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত গংগারিড়ী নামক প্রবল পরাক্রান্ত রাজ্যের অস্তিত্বের কথা অবগত হয়েছিলেন।[৭] গংগারিড়ীর শক্তিমত্তার বিবরণ শুনেই সম্ভবত গ্রীকবীর এদেশ জয়ের আশা ত্যাগ করেন। মেগাস্থিনিসের অনুকরণে ইতিহাসবিদ ডায়োডোরাস বলেন, এই গংগা রাজ্যের অনেক ভীষণ-দর্শন হাতী রয়েছে, যার জন্য এই দেশ কখনও কোন ভিনদেশী নরপতি কর্তৃক অধিকৃত হতে পারে নি।

খৃষ্টীয় প্রথম শতকে গ্রীক পণ্ডিত প্লিনী আদি-বংগের পরিচয় জানালেন, 'গংগা নদীর শেষ ভাগ যে এলাকার ভিতর দিয়ে দক্ষিণ প্রবাহী হয়ে গিয়ে সাগরে পড়েছে, সে এলাকাই গংগারিড়ীর বংগ রাজ্য।'[৮] খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের গ্রীক ভৌগোলিক টলেমী লিখেছেন ঃ 'গংগা মোহনার সব অঞ্চল জুড়েই গংগারিড়ীরা বাস করে। তাদের রাজধানী 'গংগা' খ্যাতিসম্পন্ন এক আন্তর্জাতিক বন্দর। এখানকার তৈরী সূক্ষ্ম মসলিন ও প্রবালরত্ন পশ্চিম দেশে রফতানী হয়। তাদের মতো পরাক্রান্ত ও সমৃদ্ধ জাতি ভারতে আর নাই।'[৯] ভার্জিল তাঁর 'জজিকক'-এর তৃতীয় খণ্ডে এবং ভ্যালেরিয়াম ফ্ল্যাকাস, ইনটাস কর্টিয়াস ও অন্যান্য ল্যাটিন লেখক তাঁদের বিবরণীতে বাংলাদেশের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন যে, বাংগালীরা একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতি।

আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক ও তাঁর পরবর্তীকালের গ্রীক পণ্ডিতগণ গংগার পুবে গংগারিড়ী নামে যে শক্তিশালী রাজ্যের উল্লেখ করেছেন, প্রফেসর মোহাম্মদ মোহর আলীর মতে সে রাজ্যটি বাংলার অন্তর্গত ছিল না। তাঁর মতে, সেটি ছিল খুব সম্ভবত উত্তর ভারতের নন্দ রাজত্ব।[১০] তাঁর এ অনুমানের সাথে অনেকেরই সুস্পষ্ট ভিন্নমত রয়েছে। কেউ কেউ সুনির্দিষ্টভাবেই বলতে চেয়েছেন যে, টলেমী বর্ণিত 'গংগ' বন্দরটি সোনার গাও ও চাঁদপুরের মধ্যবর্তী কোন এক স্থানে অবস্থিত ছিলো, যা নদীতে বিলীন হয়েছে। আবার কারো কারো মতে সোনার গাওই ছিল টলেমীবর্ণিত গংগ-বন্দর।

অধ্যাপক আখতার ফারুক লিখেছেন ঃ 'যে বংগ গংগার দান, প্রাচীন নাম যার গংগ

৬. ম্যাকক্র্যাইণ্ডল ঃ মেগাসথিনিস, পৃঃ ৩৩-৩৪।
৭. ম্যাকক্রাইণ্ডল ঃ এ্যানশিয়েন্ট ইণ্ডিয়া, ইটস ইনভেশন বাই আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট।
৮. প্লিনী ঃ পেরিপ্লাস অব দি ইরিত্রিয়ান সী।
৯. উদ্ধৃত ঃ আখতার ফারুক, বাংগালীর ইতিকথা, পৃঃ ২।
১০. প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ মোহর আলী ঃ হিস্ট্রি অব দি মুসলিমস অব বেংগল, ভল্যুম-১ক, পৃঃ-৬।

www.nagorikpathagar.org

রাজ্য, আর রাজধানী যার গংগা পাড়ের গংগ শহর, বংগ নামটা কি সেই গংগেরই অপভ্রংশ নয়?' তাঁর যুক্তি হলো ঃ 'ঐতরেয় আরণ্যকে মগধকে বলা হয়েছে 'বগধ'। সুতরাং সেই মগধের অধিকারী গংগ-রাজ যে তাঁদের ভাষায় বংগ-রাজ হতে পারেন না তা কি করে বিশ্বাস করব?... সেমিটিক ভাষায় কঞ্জ হল রত্নের আকর বা ফসলের গোলা, রত্নপ্রসবিনী গংগার নিশ্চয়ই প্রাক-আর্য নাম একটি ছিলো।.... বুঝতে কষ্ট হয় না যে, দ্রাবীড়দের কঞ্জা নদী ঈষত বিকৃত হয়ে গংগা হয়েছে এবং আর্যদের মংগোল ভাষায় পরে নাম পেল গংগ। কারণ সেমিটিক 'জ' হল মংগোল 'গ'-এর প্রতিবর্ণ।'[১১]

৩. জাতীয় ঐক্যের গোড়ার কথা

আদিতে বংগ ছিল বর্তমান বাংলার একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল। পাল ও সেন রাজাদের আমলেও বংগ সেই স্বতন্ত্র ক্ষুদ্রতররূপেই পরিচিত হয়েছে। একথা ডক্টর এইচ. সি. রায় চৌধুরী উল্লেখ করেছেন। মুসলিম শাসনের শুরুর দিকেও বাংলার শুধু পুব-দক্ষিণ অঞ্চলই 'বংগ' নামে অভিহিত হতো। পাল ও সেন আমলে এবং মুসলিম শাসনের গোড়ার দিকে বাংলার অন্যান্য অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিলো। পশ্চিম বংগ পরিচিত ছিলো 'রাঢ়' নামে। উত্তরবাংলাকে বলা হতো 'পুণ্ড্রবর্ধন' বা 'বরিন্দ' কিংবা 'লাখনৌতি'। উত্তর ও পশ্চিম বংগের কিয়দংশ আবার গৌড় নামেও পরিচিত ছিল। ডক্টর আহমদ হাসান দানী উল্লেখ করেছেন যে, সেন রাজারা বাংলার একটা বৃহদংশের ওপর শাসন চালাতেন, কিন্তু তাঁরা গর্ববোধ করতেন নিজেদেরকে 'গৌড়েশ্বর' বা গৌড়ের রাজা বলতে।[১২] বাংলার পুব ও দক্ষিণ অঞ্চলকে মিনহাজউদ্দীন সিরাজ তাঁর ১২৪২-৪৪ সালের 'তাবাকাত-ই-নাসিরী'তে 'বংগ' নামে উল্লেখ করেছেন। এ এলাকাটি গিয়াস্উদ্দীন বলবনের আমলে মুসলমানদের কাছে 'বাংগালাহ' নামে পরিচিত হয়। চতুর্দশ শতকের শেষার্ধে জিয়াউদ্দীন বারণী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তারীখ-ই-ফীরূয-শাহী'তে প্রথম তা উল্লেখ করেন।[১৩] মিনহাজের 'বংগ' আর বারনীর 'বাংগালাহ' বাংলার পুব ও দক্ষিণবর্তী অভিন্ন অঞ্চল। এই পুবাঞ্চল চিহ্নিত হয়েছে গংগার মূলধারার মাধ্যমে। বৃহত্তর ঢাকা ও সাবেক ত্রিপুরা জেলা নিয়ে গঠিত এ অঞ্চল সমতট নামেও পরিচিত হয়েছে। পশ্চিমের ভগিরথি-হুগলি নদী আর পুব-দক্ষিণ-পুবে গংগার মূলধারা দক্ষিণের বদ্বীপ অঞ্চলকে চিহ্নিত করেছে। হুগলী-ভগিরথির পশ্চিমবর্তী বর্তমান পশ্চিম বংগ পরিচিত হয়েছে 'রাঢ়' নামে। গংগা ও ব্রহ্মপুত্রের দুই বাহু-বেষ্টিত উত্তর বাংলাকে বলা হতো পুন্ড্র, বরিন্দ বা লাখনৌতি। উত্তর ও পশ্চিম বাংলার কিয়দংশ গৌড় নামেও অভিহিত হয়েছে।

১১. আখতার ফারুক ঃ বাংগালীর ইতিকথা পৃঃ ৪২-৪৩।
১২. ডক্টর আহমদ হাসান দানী ঃ শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ, শাহ-ই-বাংগালা, বেংগলী লিটারেরী রিভিউ, এপ্রিল, ১৯৫৭, পৃঃ ১৯-২২
১৩. ডক্টর এম. এ. রহীম ঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩।

www.nagorikpathagar.org

জিয়াউদ্দীন বারনীর বিবরণী থেকে জানা যায় যে, তাঁর আমলে 'বাংগালাহ' কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিলো। মুসলমানগণ এ অঞ্চলগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়েছিলেন। যেমন, 'আরসাহ্-ই-বাংগালাহ', 'ইকলিম-ই-বাংগালাহ' ও 'দিয়ার-ই-'বাংগালাহ'। ডক্টর কে. আর. কানুনগো আরসাহ্-ই-বাংগালাহকে সাতগাঁও বা দক্ষিণ বংগ, ইকলিম-ই-'বাংগালাহকে সোনারগাঁও অঞ্চল এবং দিয়ার-ই-বাংগালাহকে সংযুক্ত সোনারগাঁও-সাতগাঁও অঞ্চলরূপে চিহ্নিত করেছেন।[১৪] এই সীমানা চিহ্নিতকরণ থেকেও দেখা যায় যে, তৎকালে বাংগালাহ বলতে বাংলার দক্ষিণ-পুবাঞ্চলকেই বোঝাতো।

চৌদ্দ শতকের বাংলার স্বাধীন মুসলিম সুলতান হাজী শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ (শাসন ১৩৩৯-৫৮ খ্রীঃ) প্রথমবারের মতো গংগা ও ব্রহ্মপুত্রের নিম্ন অববাহিকার ব্যাপকতর এলাকাকে 'বাংগালাহ' নামে অভিহিত করেন। লাখনৌতি (উত্তর বংগ) ও বাংগালাহকে তিনিই স্বাধীন সুলতানী শাসনের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করেন। সমগ্র বাংলাদেশ এবং বাংলার বাইরের অনেক এলাকাও তিনি নিজের অধিকারে আনেন।[১৫] সমগ্র বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চলকে তিনিই প্রথমবারের মতো 'বাংগালাহ' নাম দেন।[১৬] তিনি 'শাহ-ই-বাংগালাহ' ও 'শাহ-ই-বাংগালী' উপাধি ধারণ করে নিজেকে এই বৃহত্তর বাংলার জাতীয় শাসকরূপে ঘোষণা করেন। এরপর সময়ে সময়ে বাংগালাহ্র আয়তন পরিবর্তিত হয়েছে। শুধু বৃটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রদেশ নয়, বরং পশ্চিম বিহারের অংশ, পুবে আসাম এবং কোন কোন সময় উড়িষ্যার অংশবিশেষও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সমগ্র বাংলার জন্য 'বাংগালাহ' নামের প্রয়োগ মুসলমানদের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান। এ প্রসংগে ডক্টর এম. এ. রহীম লিখেছেন ঃ 'এ সময় হতে তেলিয়াগড় থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল জনপদ বাংগালা, এই একটি সাধারণ নামে পরিচিত হয়।.... এ সময় থেকে পূর্ব বাংলার অথবা উত্তরবংগের অথবা পশ্চিমবংগের যেখানকারই অধিবাসী হোক না কেন, তারা বাংগালী, এই সাধারণ নামে পরিচিত হল এবং অন্যান্য দেশের লোকেরাও তাদেরকে ঐ নামেই অভিহিত করত।... এর দ্বারা এ দেশে রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও ভাষাগত ঐক্য স্থাপিত হয়...। কার্যত এ সময় থেকেই বাংলা ও বাংগালীর ইতিহাসের সূচনা।'[১৭]

বাংলা ও বাংগালীর এই ঐতিহাসিক ক্রান্তি অতিক্রমণের ঘটনা প্রসংগে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় বলেন ঃ 'যে বংগ ছিল আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত, যা ছিল পাল ও সেনদের আমলে কম গৌরবের ও (কম) আদরের–সেই বংগ নামেই শেষ পর্যন্ত তথাকথিত পাঠান আমলে বাংলার সমস্ত জনপদ

১৪. ডক্টর এম. এ. রহীম ঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩।
১৫. শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলার ইতিহাসের দু'শ বছর, স্বাধীন সুলতানদের আমল, পৃঃ ২০।
১৬. ডক্টর এম. এ. রহীম ঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৫।
১৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪-৬।

www.nagorikpathagar.org

ঐক্যবদ্ধ হল।'[১৮]

৪. প্রত্ন-প্রস্তর যুগের নিদর্শন

পণ্ডিতগণ এক সময় মনে করতেন যে, গংগার পলিমাটির দ্বারা গঠিত বলে এবং জলমগ্নতা ও ঘন বন-জঙ্গলের কারণে এ এলাকা প্রাগৈতিহাসিক যুগে বসবাসের উপযুক্ত ছিলো না। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বাংলাদেশেও প্রত্ন-প্রস্তর যুগের কয়েকটি নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব নিদর্শনের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাংগামাটি পাহাড়ে প্রাপ্ত একটি পাথরের কাটারী এবং ফেনী জেলার উত্তর-পূর্বাংশের সীমান্তবর্তী ছাগলনাইয়ার উপত্যকায় আমজাদ হাট ইউনিয়নে প্রাপ্ত একটি পাথরের হাত-কুঠার উল্লেখযোগ্য। রাংগামাটি পাহাড় অঞ্চল থেকে ১৯৫৮ সালে পাথরের কাটারীটি আবিষ্কার করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৃতত্ত্ববিদ ডাইসন। আবিষ্কৃত কাটারীটি চট্টগ্রামের নৃতত্ত্ব যাদুঘর থেকে হারিয়ে যায়। ছাগলনাইয়া উপত্যকায় পাথরের হাত-কুঠারটি আবিষ্কৃত হয় ১৯৬৩ সালে। বর্তমানে এটি জাতীয় যাদুঘরে রয়েছে।

পণ্ডিত মহলের ধারণা, উল্লিখিত দু'টি নিদর্শনই প্রত্ন-প্রস্তর যুগের অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগের। ফেনীর ছাগলনাইয়া ও পরশুরাম উপজেলা দু'টির সাথে ভারতের পার্বত্য ত্রিপুরার বিরাট সীমান্ত রয়েছে। সীমান্ত এলাকা লাল মাটির টিলা-টংকর ও জংগলে পূর্ণ। এমনি একটি উঁচু এলাকা থেকেই পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, আড়াই ইঞ্চি চওড়া কুড়ালটি পাওয়া যায়। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এর রঙ এখন প্রায় বাদামী। সুদূর অতীতের এই ঐতিহাসিক কুড়ালটির দু'দিক চোখা। তবে একদিক আরেক দিকের তুলনায় বেশী তীক্ষ্ণ। বিচ্ছিন্নভাবে প্রাপ্ত এসব নিদর্শন প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকদের যথাযথ পরীক্ষা ও স্বীকৃতির ভিত্তিতে বাংলাদেশকে পৃথিবীর প্রত্ন-প্রস্তর সংস্কৃতির মানচিত্রে স্থান করে দিতে সহায়ক হতে পারে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আরো কিছু নিদর্শন বাংলাদেশে আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব নিদর্শন প্রাপ্তির স্থান হলো নরসিংদী জেলার বেলাবো উপজেলার লালমাটির টিলা অঞ্চলের দু'টি গ্রাম। নরসিংদী-ভৈরব রেলপথে মেথিকান্দা রেল স্টেশন থেকে নয় মাইল উত্তরে ব্রহ্মপুত্র ও আড়িয়াল খাঁ নদীর মোহনা থেকে দু'মাইল পশ্চিমে পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি গ্রাম–ওয়ারী ও বটেশ্বর। আশেপাশের সাধারণ ভূমি থেকে গ্রাম দু'টি প্রায় পনেরো ফুট উঁচু। ওয়ারী গ্রাম চতুর্দিকে আটশ' গজ বাহুবিশিষ্ট উঁচু গড় ও গভীর পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। বর্তমানে কোনো কোনো স্থানে গড়ের চিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেছে। এই গড়-এর পুব পাশে প্রাচীনকালের একটি ভরাট দীঘির পাড় দেখা যায়। একটি পরিখা ওয়ারী গ্রামের উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে আরম্ভ করে অপর একটি বিরাট পরিখার সাথে সোজা বটেশ্বর গ্রামের পশ্চিম-সীমা বেষ্টন করে পুব দিকে আড়িয়াল খাঁ নদীতে গিয়ে

১৮. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব), সুভাষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংক্ষেপিত, পৃঃ ২২।

www.nagorikpathagar.org

মিশেছে। এই মৃত পরিখা দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন মাইল আর চওড়ায় চল্লিশ হাত। পরিখাটির কোন কোন স্থানে গভীরতা দশ হাত। স্থানীয় জনসাধারণ এই উঁচু গড় ও গভীর পরিখাকে 'অসম রাজার গড়' বলে অভিহিত করেন। এই গড়ের এক কোণে ১৯৩৩ সালে আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাথরের হাতিয়ার আকৃতির আকরিক লোহার কিছু বর্শা ফলক, হাত-কুঠার, প্রাচীন শিলাখণ্ড এবং পোড়া মাটি ও পাথরের গোলা। একজন কৃষক মাটি খোড়ার সময় উদ্ধার করেন নিদর্শনগুলি। এর প্রায় চল্লিশ বছর পর জনাব হানিফ পাঠান ও হাবিবুল্লাহ পাঠানের সৌজন্যে এবং জনাব শফিকুল আসগরের সহায়তায় এ নিদর্শনগুলি ১৯৭৩ সালে ঢাকা যাদুঘরে সংগ্রহভুক্ত হয়।

ওয়ারী গ্রামে আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলি আকরিক লোহার তৈরী হাতিয়ার। এগুলির কোন কোনটি বর্শা ফলকের মতো। লম্বায় বারো ইঞ্চি এবং চওড়ায় এক ইঞ্চি। অন্যগুলি হাত-কুঠার। অবিকল প্রস্তর যুগের হাত-কুঠারের মতো। ত্রিকোণাকার সব ক'টি কুঠারই ওজনে প্রায় আড়াই সের। লম্বায় পাঁচ ইঞ্চি, চওড়ায় আড়াই ইঞ্চি, অগ্রভাগ সরু। আড়াই ইঞ্চি লম্বা একটি মসৃণ শিলা খণ্ডও পাওয়া গেছে ওয়ারী গ্রামে। শিলাখণ্ডের মসৃণতা থেকে কোন কোন বিশেষজ্ঞ ধারণা করেন যে, নব্য-প্রস্তর যুগের কোন এক সময় মানুষের হাতে ব্যবহৃত হয়েছে এটি। ভারতের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত প্রস্তর যুগের হাতিয়ারের সাথে এই মসৃণ শিলাখণ্ড, হাত-কুঠার ও বর্শা ফলকের সাদৃশ্য রয়েছে। বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র ও গাংগেয় উপত্যকায় প্রাপ্ত প্রস্তর যুগের এ নিদর্শন প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকদের স্বীকৃতি লাভ করলে তা আমাদের সভ্যতার প্রাচীনত্বের এক বিরাট যোগসূত্র রচনা করবে।

বৃহত্তর ঢাকা জেলার উত্তর-পুবে শীতলক্ষা ও মেঘনার মধ্যবর্তী যে ভূভাগ নিয়ে আজকের নরসিংদী জেলা গঠিত, এর উত্তরাংশে ভাওয়াল গড়ের বর্ধিতাংশ অর্থাৎ লালমাটির অনুচ্চ পাহাড়ী এলাকা। এ অঞ্চলের মাঝ দিয়ে আড়িয়াল খাঁ, হাঁড়িধোয়াসহ কয়েকটি ছোট নদী প্রবাহিত। গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের মতে আজ থেকে সোয়া ছয় লাখ বছর আগে প্রথম বরফ যুগের শেষে লাল পানির পলি দিয়ে বর্তমান বাংলাদেশে লাল বর্ণ পাহাড় ও উঁচু সমভূমি অঞ্চলের ভিত্তি গঠিত হয়েছিলো। কারো কারো মতে এর পর ভূমিকম্প বা ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলে পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার বছর আগে উপরিউক্ত পাহাড় বা টিলার সৃষ্টি হয়। এতে দেখা যাচ্ছে, লাল মাটি দিয়ে গঠিত ভূখণ্ডগুলি গাংগেয় বদ্বীপ তথা পলি গঠিত বাংলাদেশের প্রাচীনতম এলাকা। প্রাচীনকালে বাংলাদেশের বিরাট অংশই ছিলো গভীর অরণ্যে আবৃত। তখন ফেনীর বিস্তীর্ণ এলাকা গহীন বনে ঢাকা ছিলো। ছাগলাইয়ায় যেখানে কুড়াল পাওয়া যায় তার অদূরের এলাকা আজো জংগলাকীর্ণ। অন্যদিকে ওয়ারী-বটেশ্বরের কিছু পশ্চিমে ভাওয়াল গড়ের পুব-সীমানায় আজো বন রয়েছে। ওয়ারী-বটেশ্বর থেকে প্রাচীন যুগের কুঠার, বর্শা ও শিলাখন্ড আবিষ্কৃত হবার পর সম্প্রতি নিকটবর্তী এলাকায় তৎকালীন যুগের মৃৎপাত্র এবং

www.nagorikpathagar.org

ধনুক শিকারীদের ব্যবহারের উপযোগী পোড়ামাটির গোলা পাওয়া গেছে। এসব নিদর্শন বাংলাদেশের সভ্যতা সম্পর্কে বহু পণ্ডিতের এ ধারণা ভুল প্রমাণ করবে যে, এ দেশে ভৌগোলিক কারণে কোন প্রাচীন সভ্যতার অস্তিত্ব ছিলো না।

৫. সেমিটিক ঐতিহ্য

বাংলার আদি বাসিন্দাদের প্রভাবশালী অংশ ছিল দ্রাবিড়ীয়ান। এ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কমই মত-পার্থক্য রয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর লোকেরা এসে বসতি গেড়েছে এখানে।

এ প্রসঙ্গে এ. ডি. পুশলকার বলেন, 'No kind of men originated on the soil of India, all her human inhabitants arrived from other lands but developing within India.

এক সময় এ উপমহাদেশের সর্বত্র দ্রাবিড় জাতির শাসন ও প্রভাব চালু ছিলো। তারপর ভারতে আর্যদের আগমন শুরু হয় খ্রীস্টপূর্ব প্রায় দেড় হাজার বছর আগে। সে সময় থেকেই এখানে জাতিগত দ্বন্দ্বের সূচনা।

প্রখ্যাত ভারতীয় ঐতিহাসিক Chokolingam Pillai বলেন ঃ Needless to mention that the question (Arya-Dravidian problem) was first set in motion on the day the Aryan entered India which event we shall soon see took place in the 15th century B. C. India prior to this entry, was a Dravidian land.'

'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা' এই দ্রাবিড় জাতির পরিচয় জানাচ্ছে ঃ 'At a still pre-historic stage, it is believed that an inflow of what are losely called Dravidian races made its way through Baluchistan from Western Asia and slowly penetrated India to far South.' এ থেকে জানা যাচ্ছে, এ উপমহাদেশে দ্রাবিড়দের আগমন ঘটেছে সুপ্রাচীন কালে, প্রাগৈতিহাসিকযুগে এবং তারা এসেছেন সেমিটিকদের আদি আবাসভূমি পশ্চিম এশিয়া থেকে। অর্থাৎ ব্যাবিলন বা মেসোপটেমিয়াই ছিলো দ্রাবিড়দের উৎপত্তি স্থান এবং তারা এ উপমহাদেশে সেমিটিকদেরই জ্ঞাতিগোষ্ঠী।

এ প্রসংগে H. G. Fleure লিখেছেন, 'That in so far as the Dravidian civilisation was derived from outside sourecs, its origin is to be traced to Egypt and Mesopotamia linked up with India by sea commerce.'[১৯]

এ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, দ্রাবিড়রা এখানে সেমিটিক সভ্যতারই পতাকাবাহী এবং তারা দজলা-ফোরাত ও নীলনদের উপত্যকা থেকেই ভারতে

১৯. H. G. Fleure : The Dravidian Element in Indian Culture.

www.nagorikpathagar.org

এসেছিলো। Nicholson এ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ 'The term (semetic) includes the Babylonians, the Assyrians, the Hebrews, the phoemecians, the Armenians, the Abyssinians, the Sabians, the Arabs.'[২০]

সেমিটিকদের আদি বাসভূমি ছিলো আরব। এ সম্পর্কে Hitti বলেন, 'Arabia was the cradle land of the Semitists.' বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে Schrader লিখেছেন, 'Religious anecdotes, philological researches, historical and geographical evidences prove conclusively that the original home of the Semetic races was in Arabia.' এই সেমিটিকরাই পৃথিবীতে প্রথম সভ্যতার আলো ছড়িয়েছিলো। দক্ষিণ আরব বা ইয়েমেন ও ব্যাবিলন ছিলো সভ্যতার আদি লীলাভূমি। সেমিটিকরাই পৃথিবীতে প্রথম লিপি বা বর্ণমালার উদ্ভাবন করেছে। সুপ্রাচীন সে সভ্যতার পতাকাবাহীরাই এ উপমহাদেশে আর্যদের আগমনের হাজার হাজার বছর আগে মোহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা সভ্যতার পত্তন করেছিলো।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ 'আর্যোপনিবেশের পূর্ব্বে যে প্রাচীন জাতি ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিল তাহারাই বোধ হয় ঋগ্বেদের দস্যু এবং তাহারাই ঐতরেয় আরণ্যকে বিজেতৃগণ কর্তৃক পক্ষী নামে অভিহিত হইয়াছে। এই প্রাচীন দ্রাবিড় জাতিই বংগ মগধের আদিম অধিবাসী।'[২১] ঐতরেয় আরণ্যকে বংগ শব্দের সর্ব-প্রাচীন উল্লেখের কথা জানিয়ে রাখালদাস লিখেছেনঃ 'যে সময়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অথবা আরণ্যকে আমরা বংগ অথবা পুন্ড্র জাতির উল্লেখ দেখিতে পাই, সে সময়ে অঙ্গে, বংগে অথবা মগধে আর্য জাতির বাস ছিল না।[২২] তিনি জানান, 'ঐতরেয় আরণ্যকে বংগ ও মগধবাসীগণের সহিত চেরদেশবাসিগণের অথবা চেরজাতির উল্লেখ দেখিয়া বোধ হয় যে, আর্যগণ যাহাদিগকে পক্ষীজাতীয় মনুষ্য মনে করিতেন তাহারা একই বংশসম্ভূত জাতি।'[২৩]

দাক্ষিণাত্যে পাথরে নির্মিত প্রাচীন কবরস্থান খননকালে মাটির কফিনে মানুষের লাশ পাওয়া গেছে।[২৪] এ জাতীয় শবাধার প্রাচীন ব্যাবিলনের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও আবিষ্কৃত হয়েছে।[২৫] এ প্রসংগে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন যে, প্রাচীন ব্যাবিলনবাসীদের সাথে 'ভারতবাসী দ্রাবিড় বা ডমিল জাতির অতি নিকট-সম্পর্ক ছিল এবং উত্তরাপথের পশ্চিম প্রান্তে বালুচিস্তানে ব্রহুই জাতির অস্তিত্ব ও ভাষা হইতে প্রমাণিত হয় যে, এক সময়ে সম্ভবত আর্য জাতির আক্রমণের পূর্বে আর্যাবর্ত্তে ও

২০. Nicholson : Literary History of the Arabs.
২১. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ -২২।
২২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৯।
২৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২০।
২৪. এ্যানডারসন ঃ ক্যাটালগ এ্যান্ড হ্যাণ্ড বুক অব দি আরকিওয়লোজিক্যাল কালেকশন্স ইন দি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, কলিকাতা, ২য় খণ্ড পৃঃ ৪২৬, ইণ্ডিয়ান এ্যান্টিকুয়ারী, ২য় খণ্ড পৃঃ ২৩৩।
২৫. মাসপারো ঃ ডন অব সিভিলাইজেশন, পৃঃ ৬৮৬।

www.nagorikpathagar.org

দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড় জাতির বিস্তৃত অধিকার ছিল।'[২৬]

প্রত্নতত্ত্ববিদ এইচ. আর. হল-এর আন্দায সকলকে ছাড়িয়ে যায়। তিনি অনুমান করেন যে, ভারতবর্ষই দ্রাবিড় জাতির প্রাচীন বাসস্থান। তারাই পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে বালুচিস্তানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলো। তারাই হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের তিন হাজার বছর আগে ব্যাবিলন অধিকার করে ব্যাবিলনীয় ও আসিরিয় সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছিলো। এই দুই সভ্যতার প্রাচীন অধিবাসিগণ সেমিটিক জাতীয়।[২৭] তবে এটাই অধিক সম্ভব যে, দ্রাবিড়গণ ব্যাবিলন অধিকার করার পরে ভারতে এসেছেন। আর দুই ক্ষেত্রেই এটা প্রমাণিত যে, দ্রাবিড়দের সাথে ব্যাবিলনীয় সভ্যতার যোগসূত্র সুপ্রাচীন।

এ প্রসংগে বিশেষভাবে বিবেচ্য যে, আধুনিককালের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা হযরত নূহ (আঃ)-এর মহাপ্লাবনকে ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা বলে প্রমাণ করেছে। অনেকের মতে, সে মহাপ্লাবন বড় জোর মিসর থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ আর ককেসাস পর্বতের উত্তর থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। মহাপ্লাবনের পর হযরত নূহ (আঃ) মধ্যপ্রাচ্যে বসবাস করতে থাকেন। মধ্যপ্রাচ্য মানব-সভ্যতার জন্মদাতা মহাপুরুষদের উৎপত্তিস্থলে পরিণত হয়। হযরত নূহ (আঃ)-এর তিন পুত্রের নাম জানা যায়, যাঁরা পৃথিবীর তিন দিকে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা হলেন–জেফেথ, সাম ও হাম। সামের বংশধরগণ মিসর থেকে শুরু করে সিন্ধু ও গংগা এবং ককেসাস পর্বত থেকে শুরু করে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন। সামের জ্যেষ্ঠ পুত্র আরফাখশাদ, তাঁর পুত্র কায়নাম, তাঁর পুত্র শালিখ, শালিখের পুত্র আবির।

আখতার ফারূক লিখেছেন, আবিরের দৌহিত্র কাহতাম সম্ভবত খ্রীস্টপূর্ব তিন থেকে চার হাজার বছর আগে সিন্ধু ও পরবর্তীকালে গংগা নদীর উপকূলে চলে আসেন। সিন্ধু নদীর তীরে তাঁরা মোহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা সভ্যতার পত্তন করেন। আর গংগা নদীর তীরে এসে তাঁরা গড়ে তোলেন দ্রাবিড় সভ্যতা। সামের প্রপৌত্র ও আবিরের দৌহিত্র, হযরত নূহ (আঃ)-এর সপ্তম স্তরের পুরুষ আবুফীর হলেন ভারতীয় দ্রাবিড়দের আদি পুরুষ। আবুফীর ভারতে এসে তাঁর দাদা আবিরের কিংবা তাঁর নিজের নামেই এ দেশের নাম দিলেন 'দারে আবির' বা আবিরের ঘর। ভারতবর্ষ নাম হওয়ার আগে এ উপমহাদেশের নাম ছিল দার-আবির। এই দার আবির থেকেই কালক্রমে দ্রাবিড় সভ্যতার বিকাশ হয়। আখতার ফারূক মনে করেন যে, বিশ্ব-বিশ্রুত ইতিহাস, ঐশী গ্রন্থ ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের আলোকে তাঁর এ দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত।[২৮]

---

২৬. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম খণ্ড), পৃঃ ২২।
২৭. এইচ. আর. হল ঃ দি এ্যানশিয়েন্ট হিস্ট্রি অব দি নিয়ার ইস্ট, পৃঃ ১৭১-১৭৪।
২৮. আখতার ফারূক ঃ বাংগালীর ইতিকথা, পৃঃ ৫০-৫২।

www.nagorikpathagar.org

৬. বুনিয়াদী সংস্কৃতির বনেদী রূপ

১৯৬২-৬৩ সালে বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলি থেকে পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ইসা (আ.)-এর জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে সিন্ধু নদের উপত্যকায় ও তার সংলগ্ন এলাকায় এবং মধ্য ভারতে ও রাজস্থানের অনেক জায়গায় প্রাক-আর্য তাম্র-প্রস্তর যুগের যে সভ্যতা বিদ্যমান ছিলো, প্রাচীন বাংলা ও তার সংলগ্ন এলাকায়ও তেমনি সভ্যতাসম্পন্ন এক আর্যপূর্ব মানবগোষ্ঠী বাস করতো। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন ঃ 'ইহারা ধান্য চাষ করিত, নানা রকমের এবং নানা নকশার চিত্র শোভিত মৃৎপাত্র ব্যবহার করিত, সম্বর, নীলগাই প্রভৃতি পশু শিকার করিত। এখানকার সর্ব-প্রাচীন অধিবাসীরা প্রস্তর ও তাম্র-ধাতুর ব্যবহার করিত এবং ক্রমে লৌহের সহিত পরিচিত হইয়াছিল।.... ইহার অধিবাসীরা ইটের ও পাথরের ভিত্তির উপর প্রশস্ত গৃহ নির্মাণ করিত। .... কোন কোন বাড়ি নল-খাগড়ার সহিত মাটি মিশাইয়া তৈরী হইত। পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে স্টীটাইট পাথরে নির্মিত একটি গোলাকার সীল পাওয়া গিয়াছে। ইহার উপর কতকগুলি চিহ্ন খোদিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে, এগুলি চিত্রাক্ষর (হিরোগলিপস ও পিকলোগ্রাফস) এবং সীলটি ভূমধ্যসাগরস্থিত ক্রীট দ্বীপে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে নির্মিত এবং ইহা হইতে অনুমান করেন যে, ঐ সময় প্রাচীন সভ্যতার আবাসস্থল ক্রীট দ্বীপের সহিত বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। অজয় নদের উপত্যকায় নানা স্থানে মৃৎপাত্রের কতকগুলি চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এগুলি বাংলাদেশে প্রাচীন যুগে প্রচলিত অক্ষর। পোড়ামাটির তৈরী নর-নারী মূর্তি এবং দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। এগুলি সে যুগের শিল্পকলার নিদর্শন। ... সুতরাং প্রাচীন যুগে অন্ততঃ তিন হাজার বছর অথবা তাহারও পূর্বে যে বাংলাদেশের এই অঞ্চলে সুসভ্য জাতি বাস করিত ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অবশ্য এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলি হইতে পূর্বোক্ত যে সমুদয় সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে তাহা এখনও পুরাতত্ত্ববিদগণের সাধারণ স্বীকৃতি লাভ করে নাই।... বাংলার প্রাচীন অধিবাসীগণ পরবর্তীকালে নবাগত আর্যগণের সহিত এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, তাহাদের পৃথক সত্তা ও সভ্যতা সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা করা কঠিন।... মোটের উপর আর্য জাতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্বেই যে বর্তমান বাংগালী জাতির উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাহারা একটি উচ্চাংগ ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়।'[২৯]

অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু 'বংগবাসীর বৈশিষ্ট্য' প্রসংগে লিখেছেন ঃ 'আর্য জাতির ভারতে আগমনের বহুকাল পূর্ব হইতে বাংগালী জাতি বংগদেশে বাস করিতেছে। আর্যদের সহিত সংশ্রবের পূর্বে তাহারা প্রধানত প্রাচীন দ্রাবিড় জাতিরই একটি শাখা

২৯. ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৭৪, পৃঃ ১২-১৪।

www.nagorikpathagar.org

ছিল এবং সহস্র সহস্র বৎসর তাহারা তাহাদের নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিল। এই প্রাচীন দ্রাবিড় জাতি সভ্যতার কত উচ্চ স্তরে উঠিয়াছিল তাহার কতক পরিচয় আমরা মোহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার ভগ্নস্তূপের মধ্যে পাইয়াছি। সুতরাং আমাদের সংস্কৃতি ও ভাবধারার মূল উৎস খুঁজিতে হইলে আমাদিগকে সেই প্রাক-আর্যযুগে চলিয়া যাইতে হইবে।'[৩০]

এ প্রসঙ্গে আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন ঃ 'পাক বাংলা (বাংলাদেশ) রাষ্ট্রীয় নেশন হিসাবে নতুন হইলেও সভ্য মানবগোষ্ঠী হিসাবে পুরাতন। বস্তুতঃ প্রাচীন সভ্য মানবগোষ্ঠী হিসাবে পাক-বাঙ্গালী জাতির বয়স প্রায় ছয় হাজার বছর। খৃষ্টের জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগে পাক-বাংলায় দ্রাবিড় নামক এক প্রাচীন সভ্য জাতির অধিবাস ছিল। পাক-ভারত উপমহাদেশে আর্য জাতির আগমনের প্রায় দুই হাজার বছর আগে হইতেই এঁরা পাক-বাংলার স্থায়ী বাশেন্দা ছিলেন। দ্রাবিড়রা সেমিটিক গোষ্ঠীর একটি সম্প্রদায়। পাক-বাংলায় আগমনের আগে এরা ব্যাবিলন অঞ্চলে বাস করিতেন। আর্যদের বহু আগে এঁরা ভারতে আসেন। প্রথমে তাঁরা সিন্ধুদেশ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পা এঁদেরই দ্বারা স্থাপিত রাজধানী। এই দুই সুপ্রাচীন নগরীর স্থপতি ও কারুকার্য হইতেই দ্রাবিড় জাতির সভ্যতার পরিমাপ করা যায়।... তাঁরা মহেঞ্জোদারো-হারাপ্পার মত সুন্দর নগরী পাক-বাংলায়ও নিশ্চয়ই নির্মাণ করিয়াছিলেন। অবশ্য স্থানীয় নির্মাণ উপকরণের পার্থক্যহেতু স্থপতিতেও নিশ্চয় পার্থক্য ছিল। কিন্তু আজ সে সবের কোনও চিহ্ন নাই। প্রাকৃতিক কারণে পাক-বাংলায় চিরস্থায়ী প্রাসাদ-দুর্গ অট্টালিকা নির্মাণের উপযোগী মাল-মশলাও যেমন দুষ্প্রাপ্য, নির্মিত দালান-কোঠা ইমারত রক্ষা করাও তেমনি কঠিন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের এরা নিশ্চিত শিকার। ময়নামতী, মহাস্থানগড় ইত্যাদি তার প্রমাণ। ময়নামতী ও মহাস্থানগড়ের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া পাক-বাংলার সভ্যতার প্রাচীনত্ব ও স্থপতির চমৎকারিত্ব আদায় করা যায় মাত্র, বিচার করা যায় না।'[৩১]

এ দেশে প্রথম চাষাবাদের প্রচলন করেন অস্ট্রিক জাতির লোকেরা। ভাত ছিলো তাদের প্রধান খাদ্য। কাঠের লাংগলে তাঁরা ধানের চাষ করতেন। লাংগল শব্দটিও অস্ট্রিক। এ ছাড়া বাংলার আদিবাসীরা লাউ, লেবু, কলা, বেগুন, নারকেল, জাম্বুরা, কামরাঙা, ডুমুর, হলুদ, পান, সুপারী ইত্যাদি সব্জি ও ফলের চাষ করতেন। চাষবাস জানলেও গো-পালন ও গো-চারণ তাঁরা জানতেন না। তাঁরা তূলার কাপড়ের ব্যবহার জানতেন। কাঠের তৈরী লম্বা ডিঙি, ডোঙা আর ভেলায় চড়ে তাঁরা নদী ও সমুদ্রপথে যাতায়াত করতেন। একটা সামুদ্রিক বাণিজ্যও তারা গড়ে তুলেছিলেন। সে সময় দ্রাবিড়রা যে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন তা ছিলো অনেক উন্নত। তামা,

৩০. অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু ঃ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯, পৃঃ ২।

৩১. আবুল মনসুর আহমদ ঃ আমাদের কৃষ্টিক পটভূমি, পূর্বদেশ, ঈদ সংখ্যা, ১৯৬৯।

www.nagorikpathagar.org

লোহা, ব্রোঞ্জ, সোনা, কাঠ ইত্যাদির ব্যবহার জানতেন দ্রাবিড়গণ এবং এসবের কারিগরি দক্ষতাও তাদের আয়ত্ত ছিলো। দ্রাবিড় ভাষার 'কর্মার' থেকেই বাংলা ভাষায় কামার শব্দ এসেছে।[৩২] এ সব তথ্যের আলোকে আমরা বলতে পারি যে, বাংলার প্রাচীন অধিবাসী দ্রাবিড়রা জীবিকার্জনে প্রধানত কৃষিজীবী হওয়া সত্ত্বেও ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারিগরি দক্ষতায় এবং সভ্যতার ধারক হিসাবে অগ্রসর ছিলেন।

মন্মথ বসু জানাচ্ছেন ঃ 'উচ্চশ্রেণীর বাংগালীদের মধ্যে অনেকে তাহাদের সিন্ধু প্রদেশস্থ জ্ঞাতিদের ন্যায় অসম সাহসী বণিক ছিলেন। বাণিজ্যসূত্রে একদিকে মহাসমুদ্রপথে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, অন্যদিকে হিমালয় ভেদ করিয়া তিব্বতাদি দেশে তাঁহারা বসবাস করিতেন। তাঁহাদের প্রধান বন্দর ছিল তাম্রলিপ্তি। তাম্রলিপ্তিরই একদল বণিক বাণিজ্যের সুবিধার জন্য দাক্ষিণাত্যের উপকূলে গিয়া বাস করেন। তাঁহাদের বংশধরেরা এখন 'তামিল' নামে খ্যাত হইয়াছে। তাম্রলিপ্তির বর্তমান নাম তমলুক। বাংগালী বণিকগণ তখন সিংহল, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, চীন, জাপান পর্যন্ত গিয়া বাণিজ্য করিতেন। ... বাংগালী নৌসেনার পরাক্রমের কথা কবি কালিদাস পর্যন্ত তাঁহার 'রঘুবংশে' স্বীকার করিয়াছেন।'[৩৩] অধ্যাপক বসু আরো লিখেছেন ঃ 'বাংগালী বণিকেরা দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেন বলিয়াই বোধ হয় সমুদ্রযাত্রা বিরোধী আর্যগণ তাঁহাদিগকে পক্ষী জাতীয় বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। ভারতীয় আর্যগণ সমুদ্রযাত্রায় অনভ্যস্ত ছিলেন, অজানা সমুদ্র পাড়ি দেওয়া অমানুষিক কার্য বলিয়া মনে করা তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। বাংলাদেশ আর্যাবর্তের অন্তর্ভুক্ত হইবার পূর্বে বহু সহস্র বছর ধরিয়া তাহার শিল্পকলা ও কাব্যাদি স্বাধীনভাবে নিজ পুরাতন ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছিল।'[৩৪]

৭. নদী ও মানুষ

গংগা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এবং এ সব নদ-নদীর অসংখ্য শাখা-নদী ও উপনদী এ এলাকার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ফলে এ ভূখণ্ডটি লাভ করেছে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। নদ-নদীর প্রবাহ, বৃষ্টিপাত, মাটির পাললিক গঠন ও মওসুমী আবহাওয়া এ এলাকার মাটিকে করেছে বিস্ময়করভাবে উর্বর। করেছে সুজলা, সুফলা, সম্পদ-সমৃদ্ধ। এ এলাকার উর্বর সমতল ভূমি চাষবাসকে উৎসাহিত করেছে। সমতলভূমিতে বসতি স্থাপনের আকর্ষণ, আর ভূপ্রকৃতিগত কারণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দ্রুততার দরুন এ এলাকা হয়েছে ঘনবসতিপূর্ণ। নদ-নদীর তীর ঘেঁষেই এখানে গড়ে উঠেছে মানব বসতি, পত্তন হয়েছে গ্রাম-নগর-বন্দর। এখানকার সভ্যতা-সংস্কৃতি, ধর্ম-কর্ম, ব্যবসা-

৩২. আসকার ইবনে শাইখ ঃ বাংলাদেশের উদ্ভব কথা- বাংলায় আর্যীকরণ, দৈনিক ইনকিলাব, ৮ই আগস্ট, ১৯৮৬।
৩৩. অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু ঃ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ২য় সংস্করণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯, পৃঃ ২।
৩৪. পূর্বোক্ত।

www.nagorikpathagar.org

বাণিজ্য, হাট-বাজার-বন্দর, সব কিছুই বিকশিত হয়েছে নদ-নদীর প্রবাহকে ঘিরে।

উত্তর ও পূর্ব বংগের কিছু কিছু অংশ বাদ দিলে বাংলাদেশের প্রায় সবটাই পলি-পড়া মাটি। দুই আন্তর্জাতিক বড় নদী গংগা ও ব্রহ্মপুত্রের বিপুল পানির ধারা, পলি-প্রবাহ, উচ্চ-প্রবাহের বিশাল বিস্তীর্ণ এলাকার বৃষ্টির পানি সাগরে বয়ে নেওয়ার গুরুভার বহন করতে হয় বাংলাদেশের নরম মাটিকে। এদেশের মাটি সব জায়গায় এ বোঝা বইবার উপযুক্ত নয়। তাই নদ-নদীর দু'পাড় জুড়ে যুগ যুগ ধরে চলছে বিরামহীন ভাংগা-গড়া আর পরিবর্তনের ধারা। এ দেশের অসংখ্য জনাকীর্ণ শহর-গ্রাম-জনপদের উত্থান আর পতনের সাথে এ ধারা মিশে আছে। বাংলার জনজীবন এবং এদেশের রাজনীতির গতিপথ নিয়ন্ত্রণেও যুগ যুগ ধরে নদ-নদী পালন করেছে অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা। নদ-নদীর প্রবাহ বাংলার সমতলভূমিকে অসংখ্য খণ্ডে বিভাজিত করেছে। ছোট ছোট এসব বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডকে অভিন্ন রাজনৈতিক কাঠামোর আওতায় ঐক্যবদ্ধ করা বরাবরই ছিল এক দুরূহ কাজ। এসব বিভক্ত এলাকায় বহু সংখ্যক স্বাতন্ত্র্যকামী রাজনৈতিক সত্তার উত্থান ও বিকাশ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসকের বিদ্রোহ ও স্বাধীনতার ধ্বজা উড়ানোর মধ্য দিয়ে বহু কাল এ এলাকার রাজনীতি হয়েছে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। বিচ্ছিন্ন ভূ-ভাগ নিয়ে অভিন্ন রাজনৈতিক কাঠামো দু'একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের ব্যতিক্রম ছাড়া দূর অতীতে কখনো দেখা যায়নি। কোন কোন রাজার উদ্যোগে মাত্র সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য একাধিক অঞ্চলকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। মুসলিম শাসনামলেও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার বারো ভূঁইয়া নামে পরিচিত কয়েকজন সামন্ত ভূস্বামীর উত্থান ঠেকাতে এবং তাঁদের বশ মানাতে মুগলদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। এদেশের ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক বিশেষত্বের এটি একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

এ এলাকার রাজ্য বা প্রশাসনিক অঞ্চলের সীমানা চিহ্নিত হয়েছে নদ-নদীর প্রবাহের দ্বারা। সীমান্তে প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা এবং অভ্যন্তরে নদ-নদীর অসংখ্য শাখা-প্রশাখা, বিস্তীর্ণ জলাভূমি, বিল-ঝিল, হাওড়-বাওড় বাংলাকে দুর্গম করেছে, বাইরের হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা-সুবিধা প্রদান করেছে। প্রাকৃতিক নানা সুযোগ-সুবিধার দরুন একটি ক্ষুদ্র বাহিনী উত্তর সীমান্তের প্রবেশদ্বারে বিরাট শত্রু বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারতো। নদ-নদী ও জলাভূমিসমূহ প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় সারির ভূমিকা পালন করতো। এছাড়া এ এলাকার দীর্ঘস্থায়ী বর্ষা ও জলপ্লাবিত সমতলভূমি উত্তর ভারতীয় সেনাবাহিনীর হামলার বিরুদ্ধে কাজ করেছে প্রতিরক্ষার তৃতীয় উপাদানরূপে।

নদ-নদীর প্রবাহ দ্বারা প্রভাবিত এই বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা বরাবরই বাইরের হামলার হাত থেকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিলো। এমন কি মুসলিম স্বাধীন সুলতানী শাসনামলে ভারতীয় সম্রাটদের শাসন-কর্তৃত্ব সম্প্রসারণের পথে এই প্রাকৃতিক অবরোধ প্রধান বাধারূপে কাজ করেছে। অন্যদিকে পশ্চিম ও উত্তর বাংলা প্রাচীনকালে বহুবার উত্তর ভারতীয় শাসকদের কর্তৃত্বাধীন

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে। এ কারণেই এ অঞ্চলটি বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রথম কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীও অভিন্ন ভৌগোলিক কারণেই উত্তর বাংলাকে তাঁর কার্যক্রমের কেন্দ্র হিসাবে বেছে নেন। তাঁর মুসলিম রাজত্ব প্রসারের প্রয়াসও এ কারণে উত্তর দিকেই পরিচালিত হয়েছিলো।

নদী-মাতৃক বাংলার বিশেষ ভূপ্রকৃতি এদেশের মানুষের চরিত্র ও জীবন-দর্শনকে প্রভাবিত করেছে। প্রকৃতগতভাবেই এ এলাকার মানুষ শান্ত-স্বভাব, অমায়িক, কোমল হৃদয়, আবেগপ্রবণ, সামাজিক, অন্তরংগ, সাহচর্যপ্রিয় ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশ এ এলাকার মানুষকে করেছে কষ্টসহিষ্ণু, সাহসী ও সংগ্রামী। সংগ্রামের সে প্রেরণা নিয়ে এ দেশের সাহসী মানুষেরা বেড়ে উঠেছে চির স্বাধীনতাকামীরূপে। সকল প্রকার আধিপত্যবাদবিরোধী সংগ্রামে এদেশের জন-চরিত্র লাভ করেছে এক চিরায়ত বৈশিষ্ট্য।

নদ-নদীর নিঃসীম সাগরের বুকে মিলনের দুর্দমনীয় অভিযাত্রা এদেশের মানুষকে দিয়েছে সত্য-সন্ধানের গভীর অনুসন্ধিৎসা। বহতা নদীর গভীরতা আর পানির স্বচ্ছতার মতোই বাংলাদেশের মানুষের চিন্তাধারায় সত্য উপলব্ধি ও সত্য অনুসরনের আকুতি বিদ্যমান। অসীমের বুকে আত্মনিবেদনের অনন্ত আকাংখা বুকে নিয়ে নদ-নদীর স্রোতের মতোই জীবন তাদের প্রবহমান। হাজার বছরের কুসংস্কার আর অধর্মের আবর্জনা বুকে নিয়ে বৈদিক শাস্ত্রশাসনের ভারে আড়ষ্ট ভারত তার ধর্মে, রাষ্ট্রে কিংবা সমাজে যে কোন পরিবর্তনের চিহ্ন দেখে যখন ভয় পায়,[৩৫] বাংলার মানুষের প্রাণধর্ম ও হৃদয়াবেগের দু'ধার স্রোতস্বিনীর মুখে সে সব জঞ্জাল ভেসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ভারতের বুকে প্রধান যে তিনটি ধর্মের ক্রমবিকাশ ঘটেছে, এ এলাকার মানুষ ক্রমাগতভাবে সে তিনটি রূপকেই বরণ করে নিয়েছে। বিশ্বাস, শিক্ষা, সৎকর্মশীলতা ও অহিংসার বাণীবাহী জৈনধর্ম এ এলাকায় প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথেই এখানকার মানুষের চিত্ত জুড়ে গভীর আসন গেড়েছে। তারপর পরমাত্মার বুকে জীবাত্মার নির্বাণলাভের বুদ্ধ-বাণী তাদেরকে উন্নত জীবনবোধে সঞ্জীবিত করেছে। সেমিটিক তৌহিদবাদী ধর্মমতের উত্তর-পুরুষ,[৩৬] উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক এই বংগ-দ্রাবিড়রা যাযাবর আর্যদের শের্কবাদী ধর্ম, তাদের ধর্মগ্রন্থ, তাদের তপস্যা ও যাগযজ্ঞ এবং তাদের ব্রাহ্মণদের পবিত্র ও নরশ্রেষ্ঠ হবার ধারণাকে কখনও গ্রহণ করেনি, মেনে নেয়নি। রাজশক্তির প্রচণ্ড দাপট এবং নযীরবিহীন জুলুম-নিপীড়ন আর নির্মূল অভিযানের ঝড় তুলেও এ এলাকার সাধারণ মানুষকে বৈদিক আর্য-সংস্কৃতির বশীভূত করা যায়নি। অথচ জৈন ও বৌদ্ধ প্রচারকদের আহ্বানে এখানকার মানুষ বিপুলভাবে, স্বতস্ফূর্ত চিত্তে সাড়া দিয়েছে। সবশেষে ইসলাম এসে এ দেশের মানুষের হৃদয় জুড়ে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। মানব-মুক্তির মহাসনদ ইসলাম চিহ্নিত হয়েছে এ

৩৫. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব), সুভাস মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংক্ষেপিত. পৃঃ ২০১।
৩৬. আবদুল মান্নান তালিব ঃ বাংলাদেশে ইসলাম, পৃঃ ১৮।

www.nagorikpathagar.org

জনগোষ্ঠীর চূড়ান্ত মঞ্জিলরূপে। বাংলার অধিবাসীরা হাজার বছর ধরে আর্যদের পৌরাণিক বৈদিক ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ পরিচালনা করে আসছিলেন। ইসলামের আগমন তাদের সে প্রতিরোধ-শক্তি বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে। তারপর '... ইসলাম বিনা বাধায়, এমন কি সাদর আহবানে অভিনন্দিত হয়ে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো ভারতের সর্বাপেক্ষা উর্বর ও জনবহুল এ প্রদেশে।'[৩৭]

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের মত এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন ঃ 'আর্য ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজ বন্ধনের যে ঢেউ অনেক পরে বাংলাদেশে এসেছে তার মধ্যে বেগ ছিল খুবই কম।... আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির ঢেউ কিছুটা আছড়ে পড়েছে গংগার পশ্চিম তীর পর্যন্ত; অর্থাৎ মোটামুটি পশ্চিম বংগে। কিন্তু গংগার পূর্ব ও উত্তর তীরে সে ঢেউ যত গেছে ততই তার বেগ স্তিমিত হয়েছে।'[৩৮] বাংলাদেশে এমনটি হবার কারণ তিনি দেখিয়েছেন ঃ 'প্রথমত, এত দূরদেশে আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির ঢেউ আসতে দেরী হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের লোকদের প্রতি এই ধর্ম ও সংস্কৃতির ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভাব কাটাতে সময় লেগেছে এবং বরাবরই তা একটা গণ্ডির মধ্যে থেকে প্রাণপণে ছোঁয়াচ বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। তৃতীয়ত, বাংলার কৌম-সমাজও আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির স্রোত ঠেকাবার জন্যে প্রাণপণে যুঝেছে এবং যখন আর পারেনি, তখনও সেই স্রোতে গা না ভাসিয়ে দেওয়া-নেওয়ার ভেতর দিয়ে একটা বোঝাপড়ায় আসবার চেষ্টা করেছে।... চতুর্থত, বাংলাদেশে নানা রক্তের মেশামেশির ফলে ও অন্যান্য ঐতিহাসিক কারণে জাত ও বর্ণের বাছ-বিচার আর্যাবর্ত-দক্ষিণ-ভারতের মত অতটা কঠোর হয়ে উঠতে পারেনি। তাই মধ্য-গাংগেয় বা আর্য ভারতের সঙ্গে এ এলাকার ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজ বন্ধনের অনেক অমিল দেখা যায়।'[৩৯]

বাংলাদেশে আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতি একদিকে প্রবল গণ-প্রতিরোধের সম্মুখীন হলো, অপরদিকে রাজশক্তির কোনরূপ পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই ইসলাম এ দেশের জনচিত্তে প্রবল আকর্ষণ ও আলোড়ন সৃষ্টি করলো। সত্য ও সৌন্দর্যের প্রতি, স্বচ্ছ জীবনবোধের প্রতি এ দেশের মানুষের যে চিরন্তন আকর্ষণ, ইসলাম তাদের সে আকাংখাকে সম্পূর্ণতা দান করলো। শের্কবাদ, পৌত্তলিকতাবাদ ও বর্ণবাদ এখানকার সমাজ-দেহে যত ক্লেদ, ক্লেশ ও গ্লানি জমা করেছিলো, ইসলাম এসে বহতা স্রোতস্বিনীর মতোই সেসব কিছুকে ধুয়ে মুছে শুদ্ধ করে তুললো। 'দেবতা' ও 'অন্ত্যজ'– সকলকে 'মানুষে'র কাতারে টেনে আনলো। ডক্টর আরনল্ড-এর ভাষায় 'ধর্মান্তরের বিপুল সংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশেই মুসলিম ধর্ম-প্রচারকগণ সবচে সফল হয়েছিলেন।'[৪০]

---

৩৭. ডক্টর আরনলড ঃ প্রিচিং অব ইসলাম।
৩৮. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব), সুভাস মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংক্ষেপিত, পৃঃ ২০০।
৩৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০০-২০১।
৪০. ডক্টর আরনল্ড ঃ প্রিচিং অব ইসলাম।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রথম প্রতিরোধ সংগ্রাম

১. আর্য আগমনের পটভূমি

ভারতবর্ষে আর্যদের আগমন শুরু হয় খ্রীস্টপূর্ব দেড় থেকে দু'হাজার বছর আগে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপথে। খ্রীস্টপূর্ব আট থেকে সাত শতক পর্যন্ত সে আগমনধারা অব্যাহত থাকে। খ্রীস্টপূর্ব ছয় শতক নাগাদ এ উপমহাদেশে আর্য উপনিবেশ চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। পাঞ্জাব থেকে বেনারস পর্যন্ত তাদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ এক হাজার বছর ব্যাপ্ত এই সময়টিকে আর্যদের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে দ্রাবিড়দের প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রথম পর্ব হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

আর্যদের আদি বাসভূমি কোথায়, তা নিয়ে মতভেদ আছে। এ সম্পর্কে নিমাইসাধন বসু লিখেছেন ঃ '... কেউ বলেন রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল, আবার কেউ বলেন উত্তর মেরু প্রদেশ, কেউ বলেন আর্যদের আদিভূমি মধ্য এশিয়া। আবার কারো মতে আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও বোহেমিয়ায়। কোন্ মতটি যে বেশী গ্রহণযোগ্য তা বলা দুরূহ। তবে আর্য জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বহুল প্রচলিত মত হল বহুদিন আগে কোন অঞ্চলে গ্রীক, রোমান, ইংরেজ, ফরাসী ও রুশ জাতির পূর্ব-পুরুষেরা ও আর্যরা এক সঙ্গে বাস করতেন। পরে এক সময়ে এরা বিভক্ত হয়ে নানান দিকে যাত্রা করেন। এইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তাদের বংশধরদের বসতি গড়ে ওঠে। এইভাবে তারা পারস্য ও ভারতবর্ষে প্রবেশ করে বসতি স্থাপন করেন।'[১]

কামরুদ্দীন আহমদ লিখেছেন ঃ 'According to some authorities they came from Iran but others hold that they came from Central Asia or as it is said "from Volga to Ganga". They probably followed the river Ganges from their country of origin. This presumption is deduced from many references to the Ganges in the Vedas and other books written by the Aryans which indicate the veneration with which they treated this great river.'[২]

আর্য আধিপত্য বিস্তারের পটভূমি সম্পর্কে ইমাম ইবনে হাযম ও সাহরাস্তানী উল্লেখ

১. ডক্টর নিমাইসাধন বসু ঃ ভারত ইতিহাসের ধারা, পৃঃ ২১-২২।
২. কামরুদ্দীন আহমদ ঃ এ সোশ্যাল হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ iii.

www.nagorikpathagar.org

করেন ঃ 'নিছক অধিকতর উর্বর ভূমি ও উপযোগী আবহাওয়া যাযাবর আর্যদের হিন্দুস্তানে প্রবেশ অনুপ্রাণিত করেনি। বাদশাহ গশতাসপের আমলে তাদের মাতৃভূমি ইরানে ধর্ম নিয়ে যে মতবিরোধ, আত্মকলহ ও পরিণামে ভীষণ যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হয়েছিল, তার ফলেই তাদেরকে মাতৃভূমি ত্যাগ করে হিন্দুস্তানের পথে পাড়ি জমাতে হয়। যরদাশত (যরথুষ্ট্র) সেখানে নতুন ধর্মমত প্রচার করেন। তাঁর ধর্মের মূল কথা ছিল ঃ আহুরা মাজদা বা জ্ঞানময় আল্লাহ হচ্ছেন পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রের একমাত্র স্রষ্টা, মালিক ও প্রভু। কাজেই মানুষ কোন দেবদেবীর ইবাদাত বা পূজা-অর্চনা করবে না। মানুষ একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করবে।'সোমরস বা অন্য কোনো মাদক-দ্রব্য ব্যবহার করা হারাম।... বাদশাহ গশতাসপ যরদাশতের ধর্মের বিশ্বস্ত অনুসারী হয়ে পড়েন।...সভাসদগণও তাঁর এই সত্যধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই সময় কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের চিরন্তন পোষক ও সমর্থক পণ্ডিত-পুরোহিতের দল বাপ-দাদার ধর্মের দোহাই দিয়ে অজ্ঞ জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলে। ... নবদীক্ষিত মুসলমানরা একে জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ হিসাবে গ্রহণ করে এবং এ জিহাদকে শেষ পর্যায়ে পৌছিয়ে নিঃশ্বাস নেয়। এর ফলে নিজেদের পৈত্রিক ধর্ম ও নিজেদের শের্কবাদী সংস্কৃতি সংগে নিয়ে বিদ্রোহী মুশরিক গোষ্ঠীগুলি পার্শ্ববর্তী দেশগুলির বিভিন্ন অঞ্চলে চলে যেতে থাকে।'[৩]

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ লিখেছেন ঃ 'যাঁহারা যরদাশতের প্রবর্তিত নতুন ধর্মমতের সমর্থন করিলেন তাঁহারা পূর্ববৎ ঈরানে থাকিয়া গেলেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা পৌত্তলিকতা, জড়পূজা, নর পূজা প্রভৃতি মোশরেকী সংস্কারের সমর্থন করিতেন, তাঁহারা পরাজিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া ঈরান হইতে দেশ-দেশান্তরে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।'[৪] দেশত্যাগী আর্যদের বৃহত্তম দলটি পার্শ্ববর্তী পামির মালভূমি অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে।

শের্কবাদী সভ্যতার অনুসারী আর্যরা অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য, গগন, পবন, ঝড়-বৃষ্টি, সমুদ্র, নদী, বৃক্ষ প্রভৃতির পূজা করতো। পরে পাথর পূজা ও মূর্তি পূজা তাদের মধ্যে প্রবেশ করে। যাগযজ্ঞ ও বলিদান ছিল তাদের পূজার অংগ। দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য তারা নরবলি দিতো।[৫]

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এ. এল. বালাম আর্যদের ওপর গবেষণা করে তাঁর বিবরণীতে লিখেছেন ঃ 'আর্যরা নিরক্ষর ও বর্বর। নাগরিক সভ্যতার সাথে তাদের কোন পরিচয় ছিল না। তারা যাযাবর জীবন যাপন করতো এবং তাদের গোত্রপতির নেতৃত্বে হানাহানিতে লিপ্ত থাকতো। রাষ্ট্রীয় ধারণা তাদের মাঝে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিলো।'

ভারতবর্ষে আসার আগে আর্যরা লাঙ্গলের ব্যবহার জানতো না। মৃৎশিল্প, বয়ন-শিল্প

৩. (ক) আল মিলাল ওয়ান্নিহাল, পৃঃ ২-৮০।
(খ) মোহাম্মদ আকরম খাঁ ঃ মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পৃঃ ১৫-১৬।
(গ) আবদুল মান্নান তালিব ঃ বাংলাদেশে ইসলাম, পৃঃ ১৯।
৪. মোহাম্মদ আকরম খাঁ ঃ মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পৃঃ ১৯-২০।
৫. আবদুল মান্নান তালিব ঃ বাংলাদেশে ইসলাম, পৃঃ ১৭।

www.nagorikpathagar.org

ও কাঠের শিল্পের সাথেও তাদের পরিচয় ছিলো না। তারা যতই পুব দিকে এসেছে, তাদের রক্তে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। তাদের জীবন-ধারায়ও পরিবর্তন এসেছে। কামরুদ্দীন আহমদ লিখেছেন ঃ 'The Aryans lived chiefly on fruites and vegetables gathered in forests and fields. Later on, of course, they learned from the Dravidians the art of domesticating cows, and started drinking milk.[৬]

সিন্ধু-সভ্যতা থেকে তারা আহরণ করেছে লাঙ্গলের ব্যবহার, শিখে নিয়েছে মৃৎ-শিল্প ও কাঠ-শিল্পের পদ্ধতি ও কৌশল। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন ঃ 'বৈদিক আর্য-ভাষীদের বাস্তব সভ্যতা ছিল নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের। খড়, বাঁশ, লতা-পাতার কুঁড়েঘরে কিংবা পশুর চামড়ায় তৈরী কুঁড়েঘরে তারা বাস করতো, গরু-ভেড়া চরাতো, পশুর গোশত পুড়িয়ে খেতো এবং দল বেঁধে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াতো। যাযাবর স্বভাব ত্যাগ করে এ দেশে এসে স্থিতি লাভ করার পরে পূর্ববর্তী অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের সংস্পর্শে এসে তারা প্রথমে কৃষি বা গ্রাম-সভ্যতা ও পরে নগর-সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হল।'[৭]

কোন কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, যাযাবর আর্যরা এ উপমহাদেশে প্রথমে শান্তিকামী উদ্বাস্তুরূপেই প্রবেশ করে। কিন্তু পরে এখানকার অনায়াসলব্ধ প্রচুর ফসলের সুজলা-সুফলা জনপদ দখল করাই তাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত খ্রীস্টপূর্ব প্রায় এক হাজার বছর আগে ভারত-বর্ষে তাদের যে দ্বিতীয় হামলা চলে, তাতে পূর্বেকার শান্ত ভাবটি ছিলো না। দ্বিতীয় পর্যায়ের এই আগ্রাসন সম্পর্কে মাইকেল এডওয়ার্ডস লিখেছেন ঃ 'This peaceful immigration was followed by others which resulted in expansion, and conflict with the people living in fortified areas which now appear possibly to have been outposts of the Indus Valley civilization. These peoples were crushed and destroyed, probabley because of that characteristic historic movement in which decadent high-level civilizations fall so easily to the vigour of barbarians.'[৮]

দ্রাবিড়রা উন্নত সভ্যতার অধিকারী হলেও সিন্ধু উপত্যকায় তখন তারা ছিল শৌর্যে-বীর্যে ক্ষয়িষ্ণু। অপর দিকে সভ্যতার বিচারে অনগ্রসর বর্বর আর্যরা ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। ইরানে সত্য-ধর্মের অনুসারীদের সাথে শতাব্দীকালীন বিরোধ, সংঘর্ষ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রতিক্রিয়া হিসাবেও এই যাযাবর আর্যরা ছিল যে কোন স্থিতিবান সভ্যজাতির প্রতি এবং নাগরিক সভ্যতার প্রতি অসহিষ্ণু। আর্যরা তাদের সমুদয় শক্তিকে একত্র করার চেষ্টা চালায়। এ ব্যাপারে আর্য ধর্ম-শাস্ত্র মনুসংহিতায় বিধান প্রবর্তন করা হয় যে, আর্যরা

৬. কামরুদ্দীন আহমদ ঃ এ সোশ্যাল হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, পৃঃ iii.
৭. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব), সুভাস মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংক্ষেপিত, পৃঃ ১২-১৩।
৮. Michael Edwards : A History of India, NEL Mentor Edition, 1967, p-21-22.

www.nagorikpathagar.org

আর্যাবর্তের বাইরে কোনো স্থানে জন্মলাভ করলেও তাদের আর্যত্ব নষ্ট হয় না। হিন্দুস্তানের বাইরে থেকে স্বধর্মাবলম্বীদের হিন্দুস্তানে সমবেত করে দলীয় শক্তি বৃদ্ধি করাই ছিল এ ব্যবস্থাপত্রের উদ্দেশ্য। এভাবে দলীয় শক্তি বৃদ্ধি করে আর্যরা সিন্ধু ও পাঞ্জাবে অভিযান চালায়। এই দুর্ধর্ষ বর্বর আর্যদের হাতে সিন্ধু অববাহিকায় সুপ্রাচীন মোহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। আর্যরা দ্রাবিড়দের কাছ থেকে সিন্ধু, পাঞ্জাব ও উত্তর ভারত দখল করে। আর্যদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে অধিকাংশ দ্রাবিড় দক্ষিণ ভারত, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। প্রফেসর মোহাম্মদ মোহর আলী দ্রাবিড়দের এই ব্যাপক হিজরতকে এক সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, আর্য আগ্রাসনের শিকার হয়ে নির্যাতিত দ্রাবিড়রা ভারতীয় উপমহাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে সরে এসেছেন এবং তাদের অনেকে সেসব অঞ্চল থেকে বাংলায় এসেছেন।[৯]

মোহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা সভ্যতা ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির আদিরূপ। সে দ্রাবিড় সভ্যতার ধ্বংসকে গোপাল হালদার দেখেছেন 'অর্ধ সভ্যের হাতে গৃহস্থের পরাজয়'-রূপে। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন ঃ '... হরপ্পার দুর্গাধিষ্ঠিত শক্তি যে আক্রান্ত হইয়াছিল, মোহেন-জো-দাড়োর কোন কোন মৃতদেহ যে আক্রান্ত ও অকস্মাৎ নিহত নরনারীর মৃতদেহ, এই অনুমান সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কে এই আক্রমণকারী?... ঋকবেদের সুক্তাদি হইতে দেখা যায়,–"সপ্তসিন্ধু" প্রদেশে (পাঞ্জাব) আর্যরা প্রাচীরবেষ্টিত শত্রু-নগরীর বিরুদ্ধে আক্রমণ করিতেছে। ঋকবেদ এই নগর-কেন্দ্রকেই বলিত 'পুর'। কখনো সেই পুরপ্রাচীর 'অশ্বময়ী', কখনো তাহা বহুবেষ্টিত বা 'শতভূজি'; আবার কখনো 'আমা' অর্থাৎ কাঁচা মাটির। এই পুর ধ্বংসকারী বলিয়াই ইন্দ্রের নাম 'পুরন্দর', তিনি দিবোদাসের জন্য নব্বুইটি 'পুর' চূর্ণ করেন। শত্রু শম্বরের নিরানব্বই বা এক শতটি দুর্গ তিনি বিধ্বস্ত করিয়াছেন।... হরপ্পার পুরকেন্দ্র খনিত হওয়ার পরে আর সন্দেহ থাকে না যে, ইহা সিন্ধু উপত্যকার সেই রাষ্ট্রশাসিত পৌর সভ্যতারই ধ্বংসের কাহিনী। হাজার খানেক বছর জীবন যাত্রার পরে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০-এর দিকে এ সভ্যতার ধারায় আসে কালান্তর। আর্যরাই এ সভ্যতার কালান্তক!'[১০]

২. বংগ-দ্রাবিড়দের প্রতিরোধ

আর্যরা তাদের দখল বাড়াতে বাড়াতে আরো পুব দিকে অগ্রসর হতে থাকে। রাজনৈতিক বিজয়ের সাথে সাথে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিজয় লাভের জন্য তারা মরিয়া হয়ে ওঠে। কিন্তু আর্যদের পুবমুখী এ অভিযান বাংলাদেশে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। আর্য আধিপত্যবাদকে বংগ-দ্রাবিড়রা সর্ব শক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। 'স্বাধীন

৯. ডক্টর মোহাম্মদ মোহর আলী ঃ হিস্ট্রি অব দি মুসলিমস অব বেঙ্গল, ১ম (ক) খণ্ড, পৃঃ ৫।
১০. গোপাল হালদার ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, মুক্তধারা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১২৮।

www.nagorikpathagar.org

মনোভাবাপন্ন ও নিজ কৃষ্টির গর্বে গর্বিত' বাংগালীদের এই প্রতিরোধ-যুদ্ধ সম্পর্কে অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু লিখেছেন ঃ 'প্রায় সমস্ত উত্তর ভারত যখন বিজয়ী আর্য জাতির অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, বঙ্গবাসীরা তখন সগর্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন, আর্যদের হোমাগ্নি সরস্বতী তীর হইতে (ভাগলপুরের) সদানীরা (করতোয়া) নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত আসিয়া নিভিয়া গিয়াছিল অর্থাৎ সদানীরার অপর পাড়ে অবস্থিত বঙ্গদেশের মধ্যে তাঁহারা প্রবেশ করিতে পারেন নাই।'[১১]

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেন ঃ 'আর্য্যজাতির এক শাখা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া পঞ্চনদ প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহারা ক্রমশ পূর্বদিকে স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন এবং দুই তিন শতাব্দীর মধ্যে উত্তরাপথের অধিকাংশ হস্তগত করিয়াছিলেন।...উত্তরাপথের পশ্চিমাংশ আর্য্যগণ কর্তৃক বিজিত হইবার বহুকাল পরেও মগধ[১২] ও বঙ্গ স্বাধীন ছিল। যে সময় শতপথ ব্রাহ্মণ রচিত হইয়াছিল, সে সময়ে মিথিলায় আর্য্যোপনিবেশ স্থাপিত হইলেও মগধ ও বঙ্গ আর্য্য জাতির নিকট মস্তক অবনত করে নাই। তখনও পর্যন্ত এই দেশদ্বয় আর্যাবর্ত্তের সীমাভুক্ত ছিল না।'[১৩] রাখালদাস আরো লিখেছেন ঃ 'যে সময়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অথবা আরণ্যকে আমরা বঙ্গ অথবা পুন্ড্র জাতির উল্লেখ দেখিতে পাই, সে সময়ে অঙ্গে, বঙ্গে অথবা মগধে আর্য জাতির বাস ছিল না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ঐন্দ্র মহাভিষেকের বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুষ্মন্তের পুত্র ভরত এক শত তেত্রিশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে আটাত্তরটি যমুনার নিকটে ও পঞ্চান্নটি গঙ্গাতীরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অগ্নি স্বরস্বতী-তীর হইতে সরযু, গণ্ডকী ও কুশী নদী পার হইয়া সদানীরাতীরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু দক্ষিণে মগধে বা বঙ্গদেশে গমন করেন নাই।...বৈদিক সাহিত্যে এ সকল উল্লেখ হইতে অনুমান হয় যে, সেই সময়ে অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মিথিলা প্রভৃতি উত্তরাপথের পূর্বসীমান্তস্থিত প্রদেশসমূহ নবাগত আর্যজাতির নিকট পরিচিত ছিল, কিন্তু তাহাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল না।[১৪]

এসব তথ্য থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, আর্য আগ্রাসনের মুকাবিলায় নিজেদের জাতীয় স্বাধীনতা এবং ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি ও ধর্মের স্বকীয়তা রক্ষার সংগ্রামে বাংগালীরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত সফল ও সক্ষম হয়েছিলেন। তার প্রমাণ মনুসংহিতা ও বৌধায়ন ধর্মসূত্র প্রভৃতি আর্য ধর্মশাস্ত্রেও পাওয়া যায়। সদানীরার তীরে এসে দ্রাবিড়দের প্রবল প্রতিরোধের মুখে আর্যদের আগ্রাসী অভিযান থমকে

১১. অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু ঃ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯, পৃঃ ২১।

১২. বিহার।

১৩. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃঃ ১৮-২৩।

১৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯-২০

www.nagorikpathagar.org

গিয়েছিল। আর্যদের মনু সংহিতায় তাই বিধান দেয়া হয়েছিল ঃ

'অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃসংস্কারমর্হতি।'

অর্থাৎ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ (উড়িষ্যা), সৌরাষ্ট্র ও মগধ (বিহার) দেশে কেবল মাত্র তীর্থ-যাত্রা ছাড়া অন্য কোন কারণে গমন করলে সে পতিত গণ্য হবে এবং পুনরায় সংস্কার ছাড়া জাতে ঠাঁই পাবে না। 'বৌধায়ন ধর্মসূত্রে'ও বিধান দেয়া হয় যে, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌবীর প্রভৃতি দেশে গমন করলে শুদ্ধি লাভের জন্য বিশেষ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হবে।[১৫]

বংগ-দ্রাবিড়দেরকে সম্মুখযুদ্ধে পরাস্ত করা সম্ভব ছিল না। আর্যরা এখানে তাই ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আসকার ইবনে শাইখ লিখেছেন ঃ '... আর্যরা সদানীরা বা করতোয়া নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত এসেই বুঝতে পেরেছিল যে, সদানীরার পূর্ব তীরে অপেক্ষমান বাংগালী বাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে তাদের দেশটা দখল করা সম্ভবপর নয়। সমরাভিযানে আর্যরা থেমে গিয়েছিল সেখানেই। কিন্তু কালক্রমে বাঙালীদের দেশে আর্যদের সুদীর্ঘকালব্যাপী ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অভিযান? সে অভিযান ঠিকই চলেছিল, আর তাতে শেষ পর্যন্ত বিজয়ীও হয়েছিল আর্যরা। সে বিজয় ধর্মীয় বিজয়, সে বিজয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি-সভ্যতার বিজয়। আর ধর্মীয় বিজয় ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি-সভ্যতার বিজয় হয়ে গেলে তো বাদবাকী দেশ বিজয়ের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আর্যদের দ্বারা তা-ই হয়েছিল বাংলায়। আর্যরা বাংলা বিজয় সম্পন্ন করেছিল এমনি ঘোর-পথে।'[১৬]

এ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, তিন স্তরে বিভক্ত আর্য সমাজের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা প্রথমে বাংলায় আসেনি। এ দেশে প্রথমে এসেছে ব্রাহ্মণেরা। তারা এসেছে বেদান্ত দর্শন প্রচারের নামে।[১৭] রাজনৈতিক আগ্রাসন তারই পরিবর্তিত রূপ।

৩. 'দেবতা' ও 'অসুর'-এর লড়াই

ঋগেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদ আর্য-দেবতাদের সাহিত্য। 'স্বর্গরাজ্যে' প্রাধান্য স্থাপন নিয়ে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংগ্রামের কথা এসব সাহিত্য থেকেই জানা যায়। এ দেশীয় দ্রাবিড়-জনগোষ্ঠীর আর্য আগ্রাসন-বিরোধী দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধই আর্য-সাহিত্যে সুর-অসুর বা দেব-অসুরের সংগ্রাম নামে অভিহিত হয়েছে। সে সব বিবরণ অনুযায়ী আর্যরা সুর বা দেব। দ্রাবিড়-অনার্যরা অসুর, অ-দেব, রাক্ষস। আর্যদের ধর্মশাস্ত্র ঋগ্বেদে দ্রাবিড়দেরকে দাস ও দস্যু নামে অভিহিত করে

১৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩।
১৬. আসকার ইবনে শাইখ ঃ বাংলায় আর্যীকরণ (প্রবন্ধ), দৈনিক ইনকিলাব, ৮ই আগস্ট, ১৯৮৬।
১৭. কামরুদ্দীন আহমদ ঃ এ সোশ্যাল হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল, পৃঃ iv।

www.nagorikpathagar.org

জানানো হয়েছে যে, এই দাসদের সাথে আর্যদেরকে দীর্ঘকাল যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়েছে। এই 'দাস'দের ধ্বংস করার জন্য ঋগ্বেদে বারবার দেবতার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। এ সব প্রার্থনার ভজনগুলি দেখে মনে হয়, ভজন-প্রণেতাগণ 'দাস' তথা দ্রাবিড়দের অর্থ, সম্পদ ও সম্পত্তির ধ্বংস দেখার চেয়ে বেশী আনন্দ আর কিছুতেই পেতেন না।

আর্যদের বিভিন্নমুখী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাংলার দ্রাবিড়দের প্রতিরোধ সংগ্রাম, তাদের ধর্ম-কৃষ্টি-সংস্কৃতি-সভ্যতা রক্ষার লড়াই সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এ জন্য শত শত বছর ধরে আর্যদের ধর্মশাস্ত্রগুলিতে বংগ-দ্রাবিড়দের বিরুদ্ধে এক বিষাক্ত আক্রোশ জিইয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। আর্য ঋষিদের রচিত বেদ-বেদান্তে এ এলাকার মানুষদের অভিহিত করা হয়েছে খর্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ, নাসিকাবিহীন, দস্যু, দাস, অসুর প্রভৃতি নামে। আর্যদের পুরাণগুলি দেব-অসুর তথা আর্য ও দ্রাবিড় দ্বন্দ্বের কাহিনীতে ভরপুর। এসব পুরাণে এ দেশীয় দ্রাবিড়গণ ম্লেচ্ছ, দাস, দস্যু, পাপ, সর্প, দুর্বল, দুরাহারী, কাক ইত্যাদি বিচিত্র বিশেষণে এবং কম-বুদ্ধিসম্পন্ন ভিলেন বা প্রতিনায়করূপে চিহ্নিত। অপরদিকে আর্যদের অবস্থান দেবতা ও নায়কের আসনে। তাদের ওপরে আরোপিত হয়েছে সকল প্রকার অলৌকিক মাহাত্ম্য। আর্যদের বিরুদ্ধে বাংগালী দ্রাবিড়দের দীর্ঘস্থায়ী মুক্তি সংগ্রামের পটভূমিতে লক্ষ্য করা যায়, বাংগালীদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ যেন আর্যদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অঙ্গীভূত হয়েছে। আর্যধর্ম ছাড়া বিশ্বের আর কোন ধর্ম-শাস্ত্রে কোন মানবগোষ্ঠীকে এরূপ নোংরা, কদর্য, কুৎসিতভাবে চিহ্নিত করার হীন মানসিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু লিখেছেন ঃ 'ঐতরেয় আরণ্যক বলেন, বঙ্গবাসীরা অবোধ্য ভাষাভাষী পক্ষী জাতীয়; এবং তাহার ভাষ্যকার তাহার উপর আর এক গ্রাম সুর চড়াইয়া তাহাদিগকে পিশাচ, রাক্ষস, অসুর প্রভৃতি আখ্যায় বিভূষিত করিয়াছেন। স্বয়ং মনু পর্যন্ত বিধান দিয়াছেন, তীর্থ যাত্রা ভিন্ন এ ম্লেচ্ছদেশে আসিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।'[১৮]

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আখতার ফারুক লিখেছেন ঃ 'আর্যদেবতাদের মাহাত্ম্য-গাঁথা পুরাণ যাদের জারজ বলে প্রমাণ করল, আর্য সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মহান এনসাইক্লোপেডিয়া আদি মহাভারত যাদের আখ্যা দিল ম্লেচ্ছ, আর্যদের পুণ্যগ্রন্থ মনুসংহিতা যাদের সর্প বলে উল্লেখ করল, আর্যধর্মের আদি শাস্ত্র ঋগ্বেদ যাদের বলল দস্যু ও দাস, তাদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ যাদের অসুর খেতাবে ভূষিত করল, তাদের ঐতরেয় আরণ্যক যাদের দুর্বল, দুরাহারী, কাক বলে গালিগালাজ করল, আর তাদের বৌধায়ন ধর্মসূত্র যাদের চিত্রিত করল অস্পৃশ্য পক্ষীরূপে–আমরা বাংগালী সেই হরেক রকম জীব বটে।'[১৯]

১৮. অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু ঃ বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২১।
১৯. আখতার ফারুক ঃ বাংগালীর ইতিকথা, পৃঃ ১।

www.nagorikpathagar.org

রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন ঃ 'বিদেশী ইতিহাসকারেরা যে গংগরিড়ী জাতির সৌন্দর্য ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়ে তাদেরকে ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতি বলে উল্লেখ করলো, মহাকবি ভার্জিল যে জাতির শৌর্যবীর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন এবং পাঁচশ বছরেরও বেশি কাল যাঁরা বাংলায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব চালালেন, এ দেশের পুরাণ বা অন্য গ্রন্থে তাদের উল্লেখ নেই।'

বাংলায় আর্য আচরণের একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করেছেন অধ্যাপক আখতার ফারুক। তিনি লিখেছেন ঃ '... সুর আর অসুরের লড়াইয়ে সমুদ্র মন্থন থেকে হলাহল উদ্‌গার, ফলে গোটা আর্যগোষ্ঠীর সমূলে নিপাত যাবার আশংকা সৃষ্টি আর স্বয়ং মহাদেবের ধ্যান ছেড়ে হিমালয় থেকে সাগর পাড়ে ছুটে এসে আর্য রক্ষার রূপক কাহিনীতে যে সেই সত্যের প্রচ্ছন্ন ইংগিত লুকিয়ে আছে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ...সে সব থেকেই সুস্পষ্ট বুঝা যায়, কেন আর্যরা বাংগালীকে মানুষ বলতে অপারক ছিল। সুর আর অসুর যে দুটো পরস্পর বিরোধী শক্তি তা তাদের ধর্মগ্রন্থ আমাদের ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছে। আর এ শত্রুতা যে চিরন্তন নিত্যকার তাও তারা অকুণ্ঠে স্বীকার করেছে। সর্পও বলা হয়েছে বাংগালীকে। কারণ বাংগালীর দংশন তাদের প্রাণান্ত ঘটাতো। সাপের মতোই ফণা তুলে বাংগালী সেই একমাত্র মানুষগুলোকে সংহারে নিয়োজিত ছিল। একে তো গুহা অরণ্যবাসী যাযাবর আর্যরা জাত সাপের উৎপাতে অস্থির হয়ে মনসা দেবীকে পূজার ডালি আর ভেট-বেগার দিয়ে কোনমতে খুশী রাখতে ব্যস্ত ছিল, তার উপর আবার এ কোলি তথা কাল সর্পের আবির্ভাব যে তাদের জন্য কিরূপ মহাবিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল তা সহজেই অনুমেয়। তাই তাদের মনুসংহিতায় বারংবার কোলি সর্পের উল্লেখ দেখা যায়। দস্যুও বাংগালীকে সেই একই কারণে বলা হয়েছে। দস্যুর মতোই বাংগালী সেই নির্বাক আর্যের জন্য ছিল অপ্রতিরোধ্য। আর্যদের পরাস্ত ও বিপর্যস্ত করে সব কেড়ে নিয়ে আসাই হয়ত বাংগালীর কাজ ছিল। সে ভয়ে বেচারারা নাকি দিনরাত অগ্নিদেব আর ইন্দ্রদেবের পায়ে মাথা কুটে রেহাই প্রার্থনা করত। বাংগালীকে দাস বলায় কৃষির প্রতি যাযাবর আর্যের সহজাত ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে। আর্যদের পরিভাষায় কৃষিজীবীরা হলো দাস। বাংগালীরা আদি থেকেই কৃষিজীবী নাগরিক ছিল। এ থেকে সে সত্যটা প্রকাশ পেল : বাংগালীকে ম্লেচ্ছও বলা হয়েছে। কারণ বাংগালী তাদের ধর্ম মেনে নিতে রাজী হয়নি। হয়তো বা তাদের ধর্মকে কোন দিনই বাংগালী ধর্ম বলে মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা অতীতেও ম্লেচ্ছ ছিল, আজও ম্লেচ্ছ রয়ে গেল। বলা বাহুল্য, বাংগালীর নাগরিক জীবনের উন্নত ভাষা ও সাহিত্য আনুনাসিক মন্ত্রসর্বস্ব যাযাবর আর্যের আদৌ বোধগম্য ছিল না বলেই যে তাদের পক্ষী আখ্যা দিয়েছিল তা আজ আর বুঝতে কষ্ট হয় না। লেখাপড়া যে আর্যরা অনার্যদের কাছে শিখেছে তা আজ ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হয়েছে।'[২০]

উপরোল্লিখিত ঋগ্বেদ সমর্থিত বক্তব্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আর্য-ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র

২০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩-৪।

www.nagorikpathagar.org

চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালীর উৎস' প্রবন্ধে আর্য ও দ্রাবিড়দের মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরে বলেন ঃ 'তাহারা আর্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিত। তাহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আর্যরাও ইন্দ্রাদির পূজা করিতেন। দাস বা দস্যুরা কৃষ্ণবর্ণ– আর্যেরা গৌর, তাহারা বহিষ্মান– যজ্ঞ করে না। আর্যেরা যজমান– যজ্ঞ করে। তাহারা অব্রত, আর্যেরা সব্রত। সুতরাং হে ইন্দ্র, হে অগ্নি, তাহাদের মার, আর্যদের বশীভূত কর। আর্যদের এই কথা। তাহারা অদেব (অসুর)– সুতরাং বয়ং তান বৃনুয়াম সংগরে– তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে চাই। তাহারা অন্যব্রত, অমানুষ, অযজমান। তাহারা মৃধবাত কথা কহিতে জানে না।...তাহারা আর্য হইতে ভিন্ন জাতীয়, ধর্মীয়, ভিন্ন দেশী এবং ভিন্নভাষী এবং আর্যদিগের পরম শত্রু।'

বাংলাদেশে আর্য-অনার্য স্থায়ী বিরোধের চিত্রটি ইংরেজ লেখক উইলিয়াম হান্টারের বিবরণ থেকেও বিশদভাবে পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন ঃ 'এতকাল আমরা শুনতে অভ্যস্ত যে, ভারতীয় সমাজ অনড় ও কৃত্রিমভাবে খণ্ডিত;... কিন্তু দেখা যাবে যে, সাধারণভাবে বর্ণভেদ প্রথা, বিশেষত নিম্নবঙ্গের ক্ষেত্রে অনড়ও নয়, কৃত্রিম বিভাজনে খন্ডিতও নয়; বিজয়ী ও বিজিত– প্রাচীন সমাজের চিরন্তন ও স্বাভাবিক এই ভিত্তিতেই এটা গড়ে উঠেছে।... বাংলার জনসাধারণের মধ্যে রয়েছে জাতিগত উপাদানের দুইটি সুনির্দিষ্ট স্বাভাবিক ধারা...।'[২১]

হান্টার বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে লিখেছেন ঃ 'সংস্কৃত সাহিত্যে বিবৃত প্রথম ঐতিহাসিক ঘটনা হলো আদিম অধিবাসীদের সাথে আর্যদের বিরোধ। এই বিরোধজনিত আবেগ সমানভাবে জড়িয়ে রয়েছে ঋষিদের স্তবগানে, ধর্মগুরুদের অনুশাসনে এবং মহাকবিদের কিংবদন্তিতে। বিবাদরত মানুষ উত্তেজনার মুহূর্তে শত্রুকে যেভাবে গালমন্দ করে এখানে তা করা হয়েছে; সংস্কৃত লেখকদের বর্ণনা হতে আদিম অধিবাসীদের বিচার করার সময় স্মরণ রাখা উচিত যে, এই সকল চরিত্র চিত্রণ বৈরী মনোভাবজাত। বাস্তব সংগ্রাম শেষ হবার পর এবং পরাজিত জাতিরা জঙ্গলে আশ্রয় নেবার পর অন্য একটি কারণে এদের সম্পর্কে আর্যদের বর্ণনা আরো বিকৃত হয়ে যায়।... বিজয়ী ও বিজিতদের মধ্যকার বিরাট ফারাক কখনো লোপ পায়নি; তাই হিন্দু সমাজের কলংকজনক সামাজিক ভেদাভেদ একই জাতির বিভিন্ন স্তরভেদ মাত্র নয়, বরং এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথক ও দীর্ঘকালীন বৈরীভাবাপন্ন দুই জাতির মধ্যকার প্রভেদ।... কিভাবে এই জাতিগত প্রভেদ তিক্ত হয়ে ওঠে, তা বোঝা কঠিন নয়। আর্যদের শ্রেষ্ঠত্ববোধ এত উৎকট ছিল যে, তারা আদিম অধিবাসীদের নিম্নস্তরের জীব হিসাবে গণ্য করত;... প্রত্যেক অঞ্চলে যেখানে দু'টি জাতির পারস্পরিক তুলনা সম্ভব, সেখানেই সংস্কৃত সাহিত্যে দাস বলে কথিত আদিবাসীরা যন্ত্রণাদায়কভাবে হীনতর।... জাতিগত পার্থক্য তীব্রতর করার প্রবণতা, গাত্রবর্ণের পার্থক্যের কারণে আরো বেশি বেড়েছে।

২১. ডবলিউ ডবলিউ হান্টার ঃ গ্রাম বাংলার ইতিকথা (অ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল-এর অসীম চট্টোপাধ্যায়কৃত অনুবাদ), প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ৬৩।

www.nagorikpathagar.org

নবাগত হানাদাররা উত্তরের বাসিন্দা ছিল এবং সর্বত্র কালো চামড়াদের প্রতি সাদা চামড়াদের যে বিতৃষ্ণা দেখা যায় তারা তা গভীরভাবে পোষণ করতো। প্রাচীন (আর্য) গীতিকার সেই ঈশ্বরের প্রশংসা করেছে, যিনি 'দাসদের ধ্বংস করে আর্যগাত্রবর্ণকে রক্ষা করেছেন' এবং 'বজ্রপাণি দেবতা যিনি তাঁর শ্বেতকায় মিত্রদের জমি, সূর্য, জল দান করেছেন'।... (আর্য) গায়করা যে বারংবার কালো চামড়াদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করত, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তারাই শুনিয়াছে, '(আর্যরা) উন্মত্ত ষাঁড়ের মতো ধেয়ে এসে কালো চামড়াদের ছত্রভঙ্গ করে' এবং 'কৃষ্ণকায়রা, ইন্দ্র যাদের ঘৃণা করতেন', স্বর্গ হতে বিতাড়িত হয়। আর একটি লেখায় রয়েছে, 'ইন্দ্র তাঁর আর্য ভক্তদের রক্ষা করতেন, মনুর অমান্যকারীদের দমন করতেন, তিনি কৃষ্ণকায়দের পরাজিত করেন, এবং কৃষ্ণকায়দের বংশধর ক্রীতদাসের দলকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য ও 'দাসদের ইতর গাত্রবর্ণকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য' যাগযজ্ঞের সাহায্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো হতো।'[২২]

এরপর হান্টার লিখেছেন ঃ '... বাঙালীরা স্বীকার করে যে, তারা কখনো একটিমাত্র জাতি ছিল না; কারণ একটি প্রভুদের ও অপরটি দাসদের–এরূপ দুইটি জাতি পারস্পরিক মিলনে একটি মাত্র জাতির উদ্ভব সহজে সম্ভব নয়। বিশেষ অধিকার দান এই মিলনের পূর্বশর্ত এবং সামাজিক ঐক্য সম্ভব না হলে রাজনৈতিক ঐক্য অর্জিত হতে পারে না। যুগ যুগ ধরে সংস্কৃত প্রবক্তারা আদিবাসীদের প্রতিটি সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার হতে বঞ্চিত করে তাদের থেকে ঘৃণাভরে দূরে থেকেছে। মতদানের বা সামাজিক সম্মানের অধিকার দূরে থাক, হীন জাতিদের ব্যবসার অধিকারের ক্ষেত্রেও কঠোরতম বিধিনিষেধ ও অত্যন্ত প্রতিকূল শর্তাদি আরোপ করা হতো; শিল্পের অধিকতর লাভদায়ক ও সম্মানজনক শাখায় দ্বিজ বর্ণের পুরুষানুক্রমিক অধিকার তো ছিলই, আবার তারা প্রয়োজনে বা সুবিধার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে নিম্নবর্ণের ঈপ্সিত বৃত্তিও যে কোন সময়ে গ্রহণ করতে পারত। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন আর্যদের জন্য ছিল এক প্রকার, অনার্যদের জন্য অন্য প্রকার; এবং বৈরীভাবাপন্ন জাতিগুলির মধ্যে সন্ধি স্থাপনে পারস্পরিক বিবাহ বন্ধনে যে মানবিক প্রভাব থাকে, তাও অজ্ঞাত ছিল।'[২৩]

এ দেশে আর্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বংগ-দ্রাবিড়দের মুক্তি সংগ্রাম স্থায়ী রূপলাভ করেছিলো। তার পটভূমি উপরের আলোচনা থেকে পাওয়া যায়। এ বিরোধ এবং এ সংগ্রামই এ এলাকার জনগণের সকল আধিপত্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের এবং সকল মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা। এ লড়াই চলেছে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে। বিভিন্ন সময়ে লড়াইয়ের ফ্রন্ট বদল হয়েছে, এক ফ্রন্টে লড়াই স্তিমিত ও অন্য ফ্রন্টে তীব্রতর হয়েছে; কিন্তু কখনোই তা একেবারে থেমে যায়নি। দ্রাবিড়গণ মুক্তির এ লড়াইয়ে বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলেই অধিকতর সফল হয়েছেন। 'নিম্নবঙ্গেই

২২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৮-৭০।
২৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮০-৮১।

www.nagorikpathagar.org

আর্যদেরকে চরম মূল্য দিতে হয়।'[২৪]

৪. বৌদ্ধ ও জৈন প্রতিরোধ

বাংলাদেশে আর্য আধিপত্য কায়েম হয়েছিলো অনেকটা বাঁকা পথে, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অভিযানের মধ্যেমে। ঠিক কবে থেকে এখানে তারা প্রভুত্ব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলো তা নিরূপণ করার মতো কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ হযরত ইসা (আঃ)-এর জন্মের প্রায় ছয়শ' বছর আগে বিজয় সিংহ নামে বঙ্গদেশীয় কোন রাজপুত্র সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এ ঘটনা সত্য হলে স্বীকার করতে হবে, সে সময় এ দেশ আর্যদের অধিকারভুক্ত ছিলো। কেননা বিজয় সিংহ অনার্য নাম নয়।[২৫]

রমেশচন্দ্র মজুমদার এ অনুমানটি গ্রহণ করেননি। তাঁর ধারণা, খ্রীস্টীয় প্রথম শতক বা তার কাছাকাছি সময়ে আর্যরা বাংলায় আসে। এ সময় যুদ্ধযাত্রা, বাণিজ্য ও ধর্ম প্রচার উপলক্ষে ক্রমশ বহু আর্য এদেশে এসে বাস করতে শুরু করে। কিন্তু এখানে তাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে আরো কয়েক শ' বছর লেগে যায়। বাংলায় আর্য-প্রভাব দৃঢ় হয় পাঁচ ও ছয় শতকে গুপ্ত আমলে।[২৬]

উত্তর ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে আর্য-অধিকার কায়েমের পর বাংলাদেশে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় এই বিলম্বের কারণ ছিলো এখানকার অবিরাম গণ-প্রতিরোধ। এ দেশের জনগণ আর্যদের বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে একেবারে শুরু থেকেই ছিলেন সংগ্রামরত। স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার রক্ষার এই সংগ্রামে তাদের ধর্ম পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামী ভূমিকা। সে ধর্ম জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম। এ দেশের মানুষের ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামে আঠারো ও উনিশ শতকে ইসলাম গণ-সংগ্রামের যে প্রেক্ষাপট রচনা করেছে, তার অনেক আগে তাদের আর্যবিরোধী প্রথম প্রতিরোধ সংগ্রামেও জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম তেমনি ভিত্তি ও প্রেরণারূপে কাজ করেছিলো, বরং বাংলা ও বিহারে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপক জনগণের সমর্থন লাভের পিছনে আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রেরণাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বাংলা ও মগধের (বিহার) জনগণ আর্য অধিকার কোনদিন সহ্য করেনি। আর্য আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে তারা দেশময় আন্দোলন গড়ে তুলেছিলো। সে আন্দোলন যে ধর্মভিত্তিক ছিলো, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও তা স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ 'আর্য্যরাজগণের অধঃপতনের পূর্বে উত্তরাপথের পূর্বাঞ্চলে আর্য্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। জৈন ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম এই আন্দোলনের ফল। জৈন ধর্ম্ম-গ্রন্থমালা পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, আর্যাবর্ত্তের পূর্বাংশই

২৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮১।
২৫. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), পৃঃ ২৩।
২৬. রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৭৪, পৃঃ ১৬।

www.nagorikpathagar.org

এই নূতন ধর্ম্মমতের জন্ম স্থান। জৈন ধর্ম্মের চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্করের মধ্যে চতুর্দশজন মগধে ও বঙ্গে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। মগধ দেশে উরুবিল্ব গ্রামের নিকটে শাক্য-রাজপুত্র গৌতম সিদ্ধার্থ বৌদ্ধ ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে, দীর্ঘকালব্যাপী বিবাদের পরে সনাতন আর্য্যধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদী নূতন ধর্ম্মদ্বয় ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।'[২৭]

আর্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ধর্মাশ্রিত এই গণ-আন্দোলনের প্রবল তোড়ে উত্তরাপথের পূর্বপ্রান্তবর্তী প্রদেশগুলির আর্যরাজত্ব ভেসে গিয়েছিলো। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন ঃ বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ ও জৈন ধর্মের চব্বিশতম তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীর-এর মৃত্যুর অতি অল্পকাল পরে শিশুনাগ বংশীয় মহানন্দের শুদ্রাপত্নীর গর্ভজাত পুত্র ভারতের সমস্ত ক্ষয়িত্রকূল নির্মূল করে একচ্ছত্র সম্রাট হয়েছিলেন।[২৮] আর্য দখল থেকে এ সময় উত্তরাপথের পুব সীমানার প্রদেশগুলি মুক্ত হয়েছিলো। এমন কি শতদ্রু নদী পর্যন্ত সমস্ত এলাকা মগধের শুদ্ররাজাদের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলো। এই শুদ্রগণ আর্য ছিলেন না, একথা ভাষাতত্ত্ববিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণ একবাক্যে স্বীকার করেন।

রাখালদাসের ভাষায় ঃ 'মগধে শুদ্রবংশের অভ্যুত্থান ও আর্যাবর্ত্ত পুনর্ব্বার নিঃক্ষত্রিয়করণের প্রকৃত অর্থ বোধ হয় যে, এই সময়ে বিজিত অনার্যগণ অবসর পাইয়া পুনরায় মস্তকোত্তোলন করিয়াছিলেন এবং মহাপদ্মনন্দের সাহায্যে ক্ষত্রিয় রাজকুল নির্মূল করিয়াছিলেন। মহাপদ্মনন্দের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কোন রাজা সমগ্র আর্যাবর্ত্ত অধিকার করিয়া 'একরাট' পদবী লাভ করিতে পারেন নাই।'[২৯] তিনি লিখিছেন ঃ 'উত্তরাপথে শূদ্রবংশজাত রাজবংশের প্রাধান্য স্থাপনের অর্থ– আর্য্যজাতি বিজেতৃগণের নিবীর্যতা ও ক্ষত্রিয়বংশজাত আর্য্যরাজগণের অধঃপতন'।[৩০]

আসল কথাটি রাখালদাসের উদ্ধৃত বক্তব্যের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন। আর্যদের ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতি ও ধর্মীয় অনাচারের যে দাপট তখন চলছিলো, তার বিরুদ্ধে সমুত্থিত ধর্মীয় জাগরণ গণ-আন্দোলনের রূপলাভ করেছিলো এবং সে জাগরণের শক্তিতেই শুদ্রবংশীয় নন্দ-শাসক ভারতভূমিকে নিঃক্ষত্রিয় করার শপথ নিয়েছিলেন।

আর্যদের সাথে বাংগালীদের এ স্থায়ী বিরোধের কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান তালিব লিখেছেন ঃ সেমেটিক ধর্ম অনুসারীদের উত্তর-পুরুষ হিসাবে এ এলাকার মানুষের তৌহিদবাদ ও আসমানী কিতাব সম্পর্কে ধারণা থাকাই স্বাভাবিক এবং সম্ভবত তাদের একটি অংশ আর্য আগমনকালে তৌহিদবাদের সাথে জড়িত ছিলো। এ কারণেই

২৭. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭-২৮।
২৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮।
২৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮।
৩০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭।

www.nagorikpathagar.org

শের্কবাদী ও পৌত্তলিক আর্যদের সাথে তাদের বিরোধ চলতে থাকে।[৩১]

বাংলাদেশে আর্য আধিপত্য বিস্তৃত হবার আগেই জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে তা বাংলায় প্রবেশ করে। জৈন ধর্মের অন্যতম প্রচারক বর্ধমান মহাবীরের (জন্ম খ্রীস্টপূর্ব ৫৯৯ অব্দ) রাঢ় প্রদেশে আগমনের ঘটনা প্রাচীন জৈন ধর্মগ্রন্থে লিখিত আছে। মহাবীরের আগে জৈন ধর্মের আরেকজন প্রচারক পার্শ্বনাথ (মৃত্যু খ্রীস্টপূর্ব ৭৭৮ অব্দ) এ ধর্মের ব্যাপক প্রচার করেন। জৈন ধর্মের আদি প্রচারকরূপে ঋষভের নাম জানা যায়। তাঁর জন্ম হয় মহাবীর ও বুদ্ধের প্রায় হাজার বছর আগে। বৌদ্ধ ধর্মের আগে বাংলাদেশে জৈন ধর্মের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিলো। শত শত বছর ধরে জৈন ধর্ম এদেশের একটি প্রধান ধর্ম ছিলো। বাংলাদেশের বাইরে জৈন ধর্মের পৃষ্ঠপোষকরূপে অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্তের নাম জানা যায়। জৈন ধর্মের ভিত্তিতেই তিনি সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। তাঁর পথ প্রদর্শক ছিলেন জৈন ধর্মের অন্যতম প্রচারক ভদ্রবাহু। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেন যে, খ্রীস্টপূর্ব চার থেকে তিন শতকের মধ্যেই উত্তরবঙ্গে জৈন ধর্মের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিলো।[৩২]

ডক্টর মোহাম্মদ মোহর আলী মনে করেন, অশোকের আমলে কিংবা তার অব্যবহিত পরে বাংলার বিভিন্ন এলাকায় বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার ঘটে। ডকটর নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেন যে, অশোকের আগেই প্রাচীন বাংলার কোথাও কোথাও বৌদ্ধ ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিলো। তাঁর মতে, অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার বাংলাদেশের হৃদয় জয় করেছিলো।

জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের যথার্থ রূপ আবিষ্কার করাও আজ দুরূহ ব্যাপার। তবে এ প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান তালিব মনে করেন ঃ '...এ ধর্মপ্রচারকদ্বয়ের (মহাবীর ও বুদ্ধ) জীবনধারা এবং যেভাবে তাঁরা সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছেন ও অবশেষে তা লাভ করেছেন, তা বিশ্লেষণ করলে তাঁদেরকে সত্য ধর্ম প্রচারকই বলতে ইচ্ছা হয় অর্থাৎ তাঁরা নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ সত্য ধর্মই প্রচার করেছিলেন। কিন্তু ষড়যন্ত্র ও বিকৃতি তাঁদের সে সত্য ধর্মকে পৃথিবীর বুক থেকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে যে, তার কোন চিহ্নই আজ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।'[৩৩] তিনি লিখেছেন ঃ 'জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করলে এ ষড়যন্ত্রের বহু ইংগিত পাওয়া যাবে। এ উভয় ধর্মই আর্যদের ধর্মীয় গ্রন্থ বেদকে ঐশী গ্রন্থ হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে। তপস্যা, যাগযজ্ঞ ও পশুবলিকে অর্থহীন গণ্য করে। ব্রাহ্মণদের পবিত্রাত্মা ও নরশ্রেষ্ঠ হবার ধারণাকে সমাজ থেকে নির্মূল করে দেয়। ফলে বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি নড়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবে জনসাধারণ এ ধর্মদ্বয়ের আহবানে বিপুলভাবে সাড়া দেয়। দ্রাবিড় ও অন্যান্য অনার্যরা ছাড়াও বিপুল সংখ্যক আর্যও এ ধর্ম গ্রহণ করে। এ

৩১. আবদুল মান্নান তালিব ঃ বাংলাদেশে ইসলাম, পৃঃ ৩৪।
৩২. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃঃ ১৩০।
৩৩. আবদুল মান্নান তালিব ঃ বাংলাদেশে ইসলাম, পৃঃ ৩৭-৩৮।

www.nagorikpathagar.org

পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য আর্য ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এ ধর্মদ্বয়কে প্রথমে নাস্তিক্যবাদের অন্তর্ভুক্ত করে। নাস্তিক্যবাদের সংজ্ঞা তারা এভাবেই নিরূপণ করে যে, বেদ-বিরোধী মাত্রই নাস্তিক। কাজেই জৈন ও বৌদ্ধরাও নাস্তিক। অতঃপর উভয় ধর্মীয়দের নিরীশ্বরবাদী প্রবণতা প্রমাণ করার চেষ্টা চলে।...'[৩৪]

৫. বৌদ্ধ ধর্মে বিকৃতি

বাংলার দ্রাবিড়দের আর্যবিরোধী প্রতিরোধের ফলে অন্তত খ্রীস্টপূর্ব চার শতক পর্যন্ত এ দেশে আর্য-প্রভাব ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়। খ্রীস্টপূর্ব চার শতকে মৌর্য এবং তারপর গুপ্ত রাজবংশ প্রতিষ্ঠার আগে বাংলায় আর্যধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়নি। তবে এর আগেই ভারতের উত্তর-পশ্চিমে ও উত্তর ভারতের একাংশে একাধিক আর্য-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এ পরিবর্তনের কিছু-না-কিছু প্রভাব বাংলায় পড়ার কথা। মৌর্যদের বিজয়কাল থেকে আর্য প্রভাব ক্রমেই বাড়তে থাকে। তারপর খ্রীস্টীয় চার ও পাঁচ শতকের গুপ্ত শাসনে আর্য ধর্ম, আর্য ভাষা ও আর্য সংস্কৃতি বাংলাদেশে প্রত্যক্ষভাবে শিকড় গাড়ে।

খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় অব্দে উত্তর ভারতে নন্দদের পর মৌর্যবংশের শাসন চালু ছিল। মৌর্যবংশের বিখ্যাত শাসক অশোকের নেতৃত্বে খ্রীস্টপূর্ব ২৭৩-২৩২ অব্দে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। ডক্টর মোহাম্মদ মোহর আলী উল্লেখ করেন ঃ 'সম্রাট অশোকের মোট ৩৫টি শিলালিপির কোথাও উড়িষ্যার পুবদিকের কোন এলাকার উল্লেখ নেই।'[৩৫] অবশ্য সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে, উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলা এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেন যে, সে সময় মৌর্যদের প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিলো পুন্ড্রনগর–বর্তমান বগুড়ার পাঁচ মাইল উত্তরে মহাস্থান বা মস্তানগড়। একজন রাজ-প্রতিনিধির নেতৃত্বে বাংলায় মৌর্য শাসন পরিচালিত হতো।[৩৬]

সম্রাট অশোক খাঁটি বৌদ্ধমত 'থেরবাদী' বা 'হীনযানী'র অনুসারী ছিলেন। বৌদ্ধ বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, অশোকের যুগ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মে কোন প্রতিমাপূজা ছিলো না। কারণ বৌদ্ধ ধর্মের সে যুগের যে সব নিদর্শন পাওয়া যায় তাতে 'শূন্য' বা ফুলের সাহায্যে বুদ্ধের অস্তিত্ব দেখানো হতো। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, মৌর্যবংশের রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্ম কিছুটা অবিকৃত ছিলো। তাই সম্রাট অশোকের শিলালিপি কিছুটা অবিকৃত বৌদ্ধ ধর্মেরই নিদর্শন। উক্ত শিলালিপি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অশোক এক অজানা প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য অনেকগুলি কল্যাণকর কাজ করেছেন। বুদ্ধভক্ত

৩৪. পূর্বোক্ত।
৩৫. ডক্টর মোহাম্মদ মোহর আলী ঃ হিস্ট্রি অব দি মুসলিমস অব বেঙ্গল; ১ম (ক) খণ্ড, পৃঃ ৪৬।
৩৬. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, সংক্ষেপিত, পৃঃ ৭৭।

www.nagorikpathagar.org

অশোক বুদ্ধের ধর্মের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। ধর্মীয় শাসনকে রাষ্ট্রের সর্বোত্তম শাসন পদ্ধতি হিসাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। মানুষকে নিজ সন্তানের মতো ভালোবেসে ইহকাল ও পরকালে তিনি তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন।

মওলানা আবুল কালাম আজাদও উল্লেখ করেছেন যে, মৌর্যবংশের শাসনকাল পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম অনেকটা অবিকৃত অবস্থায় ছিলো। কিন্তু তারপরই এ ধর্মে বিকৃতি শুরু হয়। মওলানা আজাদ লিখেছেন ঃ 'স্রষ্টার ব্যাপারে বুদ্ধের নীরবতার যে প্রশ্ন আজ মহাযানীরা সৃষ্টি করেছে তা স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রশ্নে ছিলো না, ছিলো গুণ আরোপের প্রশ্নে। প্রতিমাপূজা সত্যের পথে এক বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তিনি চেয়েছিলেন সেই অজস্র খোদার খপ্পর থেকে মানুষকে উদ্ধার করে সর্বতোভাবে কল্যাণের পথে নিয়োজিত করতে। এর অপরিহার্য পরিণতি ব্রাহ্মণ্য খোদাকে অস্বীকার করা এবং ঘোষণা করা যে, দিব্যজ্ঞান লাভ করে সত্যের সাধনা করাতেই মুক্তি নিহিত, ও সব অসার খোদার অর্চনায় নয়। স্টামার্গে দেখা যায়, বিরোধিতার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদের বাড়াবাড়ি এবং এ আপেক্ষিক অস্বীকারকে পরবর্তীকালে সাধারণ অস্বীকারে রূপ দেয়া হয়েছে।'[৩৭] বুদ্ধ কখনো নিজেকে ভগবান দাবি করেন নি, অশোকের যুগ পর্যন্ত বুদ্ধমূর্তিরও প্রচলন ছিলো না। এ কথা মওলানা আজাদ জোর দিয়ে উল্লেখ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেন লিখেছেন ঃ 'অশোকের সময়কার তৃতীয় সম্মেলনে থেরবাদী অর্থাৎ হীনযানী মতবাদই চূড়ান্তরূপে সংকলিত হয়েছে। অশোকের পুত্র মহেন্দ্র থেরবাদী বৌদ্ধশাস্ত্র সিংহলে প্রচার করেছিলেন। আর সেই আদি বৌদ্ধমত নানা বিকৃতি নিয়ে বর্তমান বিশ্বে শ্রীলঙ্কা ও বার্মাতেই টিকে আছে।'[৩৮]

অশোকের মৃত্যুর পর উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বহু রাজবংশ মাথাচাড়া দেয়। অশোক-সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে। এ সময় ভারতের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে ব্যাকট্রিয়ান গ্রীক, শক ও কুশানরা প্রায় পর্যায়ক্রমিকভাবে অনুপ্রবেশ করে। বাংলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আগ্রাসনের মুখে বৌদ্ধ ধর্ম তখন তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে নিয়োজিত ছিলো। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ষড়যন্ত্রের মুখে বৌদ্ধ ধর্ম তার বিকৃতি এড়াতে পারেনি।

এ সম্পর্কে সতীশচন্দ্র মিত্র লিখিছেন ঃ খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুশান সম্রাট কনিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধদের এক মহাসম্মেলনে বৌদ্ধ ধর্ম দু'টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। নাগার্জুন নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য কতকগুলি হিন্দু ও নতুন দেবদেবী স্বীকার করে এক 'উদার' বৌদ্ধমতের প্রবর্তন করেন। তা-ই হলো মহাযানী ধর্ম। আর প্রাচীন অর্থাৎ বুদ্ধদেবের প্রচারিত মতে যারা বিশ্বাসবান থাকলেন তাঁরা হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত হলেন। একে প্রাচীন বা স্থবির মতও বলে। ক্রমে সুবন্ধু নামক বৌদ্ধ মুনি পাতঞ্জল দর্শনের যোগাচার ও তন্ত্র-মন্ত্র মহাযানের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। তখন থেকে নাগার্জুনের মতের

৩৭. আখতার ফারুক (উদ্ধৃত) ঃ বাংগালীর ইতিকথা, পৃঃ ৬৩।
৩৮. পূর্বোক্ত।

www.nagorikpathagar.org

নাম হলো মাধ্যমিক। সুবন্ধু প্রবর্তিত নব-মহাযান মত 'যোগাচার' নামে অভিহিত হলো। এভাবে হিন্দু তান্ত্রিকতা বৌদ্ধ ধর্মে প্রবেশ করতে লাগলো। হিন্দু দেবদেবী বৌদ্ধ-মূর্তির রূপ ধারণ করতে লাগলো। এভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে একটা মিলন হয়ে গেলো। বুদ্ধদেবও হিন্দুদের দশ অবতারের অন্তর্গত হয়ে পড়লেন। পরবর্তীকালে পুরুষোত্তমে বুদ্ধ, সংঘ ও ধর্ম–বৌদ্ধদের এ ত্রিমূর্তি হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ধারণ করে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে (হিন্দু-বৌদ্ধ) সকল ভারতবাসী দ্বারা পূজিত হতে লাগলো।[৩৯]

বৌদ্ধ ধর্মের বিকৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক এডওয়ার্ডস-এর মূল্যায়ন এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন ঃ 'Buddhism had, for a variety of reasons, declined and many of its ideas and forms had been absorbed into Hinduism. The Hinduization of the simple teachings of Gautama was reflected in the elevation of the Buddha in to a devine being surrounded, in sculptural representations, by the gods of the Hindu pantheon. The Buddha later came to be shown as an incarnation of Vishnu.'[৪০]

সতীশচন্দ্র মিত্র লিখেছেন ঃ 'যোগীরা এখন হিন্দুর মত শবদেহ পোড়াইয়া থাকেন, পূর্বে উহা পুঁতিয়া রাখিতেন।...উপবিষ্ট অবস্থায় পুঁতিয়া রাখা হিন্দুর চোখে বিসদৃশ লাগিত, তাঁহারা মনে করিতেন, উহাতে যেন শবদেহ কষ্ট পায়।' হিন্দুদের চোখে বিসদৃশ লাগার কারণে বৌদ্ধদেরকে পর্যায়ক্রমে তাদের ধর্ম-সংস্কৃতি তথা জীবনাচরণের অনেক বৈশিষ্ট্যই মুছে ফেলতে হয়। অশোকের সময় পর্যন্ত বুদ্ধের প্রতিমা-পূজা চালু ছিলো না। পরে বুদ্ধের শূন্য আসনে শোভা পেলো নিলোফার বা পদ্ম ফুল। তার পর বুদ্ধের দু'টি চরণ দেখা দিলো। শেষে বুদ্ধের গোটা দেহটাই পূজার মণ্ডপে জেঁকে বসলো। এভাবে ধীরে ধীরে এমন সময় আসলো, যখন বৌদ্ধ ধর্মকে হিন্দু ধর্ম থেকে আলাদা করে দেখার সুযোগ লোপ পেতে থাকলো। তবে এ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি নির্বিবাদ ও নির্বিরোধী ছিলো না। বাংলার বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসনের কাছে সহজে নতি স্বীকার করেনি।

৬. গুপ্ত আমলে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির আর্যীকরণ

সম্রাট অশোকের পরে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী এক অন্ধকার যুগের সূচনা হয়। এর পাঁচ শতাধিক বছর পর খ্রীষ্টীয় চার শতকে গুপ্তরা একটি উত্তর ভারতীয় সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। এই গুপ্ত সাম্রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তার ঘটে সমুদ্রগুপ্তের আমলে, ৩৪০-৩৭৬ সালে। তবে গুপ্ত রাজত্বের আয়তন ছিলো অশোক-সাম্রাজ্যের অর্ধেকেরও কম। ডক্টর মোহাম্মদ মোহর আলী উল্লেখ করেন, উত্তর বঙ্গ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার অংশবিশেষ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এলাহাবাদে প্রাপ্ত শিলালিপিতে

৩৯. সতীশচন্দ্র মিত্র ঃ যশোর খুলনার ইতিহাস।
৪০. মাইকেল এডওয়ার্ডস ঃ এ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ১৯৬৭, পৃঃ ২৯।

www.nagorikpathagar.org

সমতট (বাংলার পূর্বাঞ্চল)-কে সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী একটি রাজ্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন ঃ একমাত্র সমতট ছাড়া বাংলার প্রায় সমস্ত জনপদ গুপ্ত-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিলো। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অধীন রাজ্যগুলি সামন্ত রাজাদের অধীনে প্রায় স্বাধীন ছিলো।[৪১]

সমুদ্রগুপ্তের পরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামগুপ্ত সিংহাসনে বসেন। রামগুপ্তকে হত্যা করে তাঁর ভাই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন দখল করেন। তিনি তাঁর বড় ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকেও বিয়ে করেন।[৪২] এই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে (শাসন ৩৭৬-৪১৩ খ্রীস্টাব্দ) চীন দেশীয় বিখ্যাত বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফাহিয়েন ৩৯৯-৪০৪ খ্রীস্টাব্দে ভারত সফর করেন। তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার তাম্রলিপ্তির (তমলুক) মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেন। এ সময় তিনি বৌদ্ধ ধর্মকে এ এলাকার সর্বাধিক প্রভাবশালী ধর্ম হিসাবে দেখতে পান। এ এলাকা তখন গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো কি-না তা নিশ্চিত নয়। তবে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র প্রথম কুমারগুপ্তের শাসনকালে (৪১৩-৪৫৫ খ্রীঃ) অন্তত উত্তর বাংলায় তাঁর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। সেখানে তাঁর আমলের কিছু শিলালিপি পাওয়া গেছে।[৪৩] প্রথম কুমারগুপ্তের আমল থেকে একেবারে ছয় শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পুণ্ড্রবর্ধন ছিলো গুপ্ত রাজত্বের প্রধানতম কেন্দ্র।[৪৪]

গুপ্ত রাজবংশ ছিলো ব্রাহ্মণ্যধর্মী। তাদের রাজত্বকালেই ভারতবর্ষে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার ঘটে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মই এ সময় শাসকদের বিশেষ প্রশ্রয় লাভ করে। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন ঃ 'তারই ফলে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য সমাজ রাষ্ট্রের অন্যতম ধারক ও পোষকশ্রেণী হিসাবে গড়ে উঠতে আরম্ভ করে এবং এরাই হয়ে ওঠেন ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির নিয়ন্তা। এদের অবলম্বন করেই বাংলাদেশে আর্য ভাষা ও আর্য সংস্কৃতির স্রোত সবেগে আছড়ে পড়ল। রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ কথা, বিচিত্র লৌকিক কাহিনী ইত্যাদি সেই স্রোতের মুখে ভেসে এসে বাংলার প্রাচীনতর ধর্ম, সংস্কৃতি ও লোক-কাহিনীকে এক প্রান্তে ঠেলে নামিয়ে দিল। উচ্চতর শ্রেণীগুলোর ভাষা হল আর্য ভাষা, ধর্ম হল বৌদ্ধ, জৈন বা পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। আর্য আদর্শ অনুযায়ী সাংস্কৃতিক আদল গড়ে উঠল।'[৪৫]

গুপ্ত শাসনে বাংলার সমাজ বদলের ধারা বর্ণনা করে নীহাররঞ্জন রায় আরো লিখেছেন ঃ 'বাংলাদেশের অধিকাংশ জনপদ গুপ্ত সাম্রাজ্যের দখলে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী সমাজ উত্তর-ভারতীয় আর্য-ব্রাহ্মণ্য বর্ণ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে আরম্ভ করে। পঞ্চম শতকে দেখা যায় উত্তর বঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম স্বীকৃতি লাভ করেছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবদেবীর পূজো করা হচ্ছে, ব্রাহ্মণদের বসবাস ক্রমেই বাড়ছে। অব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণদের

৪১. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), পৃঃ ৬৯।
৪২. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম খণ্ড), পৃঃ ৪৫-এর টীকা।
৪৩. ডক্টর মোহাম্মদ মোহর আলী ঃ হিস্ট্রি অব দি মুসলিমস অব বেঙ্গল, ১ম (ক) খণ্ড, পৃঃ ৭।
৪৪. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব), সংক্ষেপিত, পৃঃ ৭৭।
৪৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৮।

www.nagorikpathagar.org

জমি দিচ্ছে, অযোধ্যাবাসী ভিন-প্রদেশী এসেও এদেশে মন্দির সংস্কারের জন্য জমি কিনছে। উত্তর পূর্ব-বাংলায় ষষ্ঠ শতকের গোড়াতেই পুরোদস্তুর ব্রাহ্মণ সমাজ গড়ে ওঠে। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণদের পদবী ছিল শর্মা বা স্বামী; তা ছাড়া বন্দ্য, চট্ট, ভট্ট, গাঞি পরিচয়ও ছিল। পঞ্চম থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে ব্যক্তি ও জায়গার সংস্কৃত নাম যে পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় আর্যীকরণ দ্রুত এগিয়ে চলেছে।'[৪৬]

নীহাররঞ্জন রায়ের বিবরণ থেকে জানা যায় ঃ 'তৃতীয়-চতুর্থ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে আর্য-বৈদিক হিন্দু ধর্মের ও সংস্কৃতির কিছুই প্রসার হয়নি'। 'ষষ্ঠ শতকের আগে বংগ বা বাংলার পূর্ব দক্ষিণাঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ঢুকতেই পারেনি।' অথচ 'গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক বন্ধনে বাঁধা পড়ে বাংলাদেশেও সর্বভারতীয় (ব্রাহ্মণ্য) ধর্ম ও সংস্কৃতির স্রোত সবেগে আছড়ে পড়লে বাংলাদেশের নানা জায়গায় ব্রাহ্মণরা এসে স্থায়ী বাসিন্দা হতে লাগলেন; এরা কেউ ঋগ্বেদীয়, কেউ বাজসনেয়ী, শাখাব্যায়ী, যাজুর্বেদীয়, কেউ বা সামবেদীয়, কারও গোত্র কান্ব বা ভার্গব বা কাশ্বপ, কারও ভরদ্বাজ বা অগস্ত্য বা বাৎস্য বা কৌণ্ডিণ্য। মন্দির তৈরী, বিগ্রহের পূজো ইত্যাদির জন্য, গ্রামে বসবাসের জন্য ব্রাহ্মণদের জমি দান হতে লাগল। এমনি করে ষষ্ঠ শতকে আর্যদের বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির ঢেউ বাংলার পূর্বতম প্রান্তে গিয়ে পৌছুল।'[৪৭]

গুপ্ত আমলের যে সব শিলালিপি বা তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে তার অধিকাংশই আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার দলিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের একটি খোদিত লিপিতে (৪০১ খ্রীঃ) মন্দিরের রত্নগৃহে প্রদীপ জ্বালানোর জন্য দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ও ভূমিদান এবং অপর লিপিতে শিবপূজার জন্য গুহা উৎসর্গ করার তথ্য জানা যায়। এ সময় শিবলিঙ্গের গাত্রে লিপি খোদাই করার প্রমাণও পাওয়া যায়। প্রথম কুমারগুপ্তের ৪৩২ খৃস্টাব্দের একটি তাম্রশাসনে শিবশর্মা ও নাগশর্মা নামে দু'জন ব্রাহ্মণের নাম দেখা যায় এবং বরাহস্বামী নামে জনৈক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এই তাম্রশাসন দ্বারা কিছু জমি লাভ করে। এই তাম্রশাসন বর্তমানে রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে রয়েছে। ১৯০৯ সালে আবিষ্কৃত একটি শিবলিঙ্গে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায়, প্রথম কুমারগুপ্তের প্রধান কর্মচারী পৃথিবী সেন পৃথিবীশ্বর নামে এই শিবলিঙ্গটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে দিনাজপুরের ফুলবাড়ি রেল স্টেশনের কাছে দামোদরপুর গ্রামের সমিরউদ্দীন মণ্ডল দু'টি পুকুরের মধ্য দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করানোর সময় প্রথম কুমারগুপ্তের সময়কার পাঁচটি তাম্রলিপি আবিষ্কার করেন। তার মধ্যে একটি তাম্রলিপি থেকে জানা যায়, কর্পটিক নামক এক ব্রাহ্মণ কুমারামাত্য বেত্রবর্ম্মা, নগরশ্রেষ্ঠী, ধৃতিপাল, সার্থবাহ, বন্ধুমিত্র, প্রথমকুলিক ধৃতিমিত্র, প্রথম কায়স্থ শাম্বপাল প্রমুখ কর্মচারীকে 'এক কুল্যবাপমাপের' (জমির পরিমাণ) 'অপ্রদাপ্রহত খিল' ভূমি তিন দীনার মূল্যে ক্রয় করার জন্য আবেদন করেন এবং উক্ত তাম্রশাসন দ্বারা তা লিপিবদ্ধ

৪৬. পূর্বোক্ত পৃঃ ৫৪।
৪৭. ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃঃ ১৩২।

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে।[৪৮]

দামোদরপুরের একটি তাম্রলিপি থেকে জানা যায়, ৪৪৭ খৃস্টাব্দে একজন ব্রাহ্মণ পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রবর্তনের জন্য প্রতি কূল্যবাপের তিন দীনার মূল্যে কিছু জমি ক্রয় করার আবেদন জানালে তা মঞ্জুর হয়েছিলো। স্কন্দগুপ্তের আমলে সূর্যদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিদিন দীপ জ্বালানোর ব্যবস্থার বিবরণ পাওয়া যায়। বুধগুপ্তের আমলের ৪৮১-৮২ খৃস্টাব্দের তাম্রলিপিতে দেখা যায়, 'নাভক নামক একজন গ্রামীক, কতকগুলি ব্রাহ্মণ বাস করাইবার জন্য এক কূল্যবাপ পরিমাণ ভূমি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় তাহার আবেদনে পলাশবৃন্দক গ্রাম হইতে উক্ত ভূমি বিক্রয়ের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল।'[৪৯] এ সময়ের আরেকটি তাম্রলিপি থেকে দেখা যায়, তৎকালীন নগরশ্রেষ্ঠী বিভুপাল, কোকামুখস্বামী ও শ্বেতবরাহস্বামী নামক দুই দেবতার জন্য দু'টি কোষ্ঠিকা তৈরী করেছিলেন। তারও আগে উক্ত দেবদ্বয়ের জন্য 'একাদশ কুল্যবাপ' পরিমাণ ভূমি দান করা হয়েছিলো।[৫০] ভানুগুপ্তদেবের রাজত্বকালে ৫৩৩-৩৪ খ্রীস্টাব্দে রাজ্যের নানা জায়গায় ভগবান শ্বেতবরাহস্বামীর মন্দির সংস্কারের জন্য এবং 'বালি, চরু, সত্র, গব্য, ধূপ, পুষ্প, মধুপর্ক দীপ' প্রভৃতি উপযোগের জন্য জমি প্রদান করা হয়। গুপ্ত যুগের বহু মন্দির, প্রাসাদ, ধাতু ও প্রস্তর-নির্মিত মূর্তিস্তম্ভ ও খোদিত চিত্র পাওয়া গেছে। ধর্মাদিত্যের আমলের দু'টি তাম্রলিপি পাওয়া গেছে ফরিদপুরে। একটি তাম্রলিপিতে ফরিদপুর শহরের চৌদ্দ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে ধূলট গ্রামে রাজভোগ নামে একজন ব্রাহ্মণকে তিন কুল্যবাপ জমি দানের বিষয় লেখা আছে। ধর্মাদিত্যের দ্বিতীয় তাম্রলিপিটি সোমস্বামী নামে একজন ব্রাহ্মণকে জমিদান সংক্রান্ত। গোপচন্দ্রের রাজত্বকালের একটি মাত্র তাম্রলিপি পাওয়া গেছে। তাতেও দেখা যায়, বারকমণ্ডলের শাসনকর্তা বৎস্যপালস্বামী স্বয়ং ভট্টগোমিদত্তস্বামী নামক একজন ব্রাহ্মণকে এক কুল্যবাপ জমি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করার জন্য দান করেন। এই তাম্রশাসনটি ফরিদপুর জেলার ঘাঘরাহাটি গ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছিলো।[৫১]

মোটকথা, গুপ্তযুগের এ যাবত প্রাপ্ত প্রায় সকল খোদিত লিপি, তাম্রশাসন বা তাম্রলিপি ব্রাহ্মণদেরকে জমি দান, মন্দির স্থাপন ও আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার-প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত। গুপ্ত শাসকদের এই আর্যীকরণ প্রক্রিয়া বাংগালীর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিলো। এক পক্ষের বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েই সূচীত হয়েছিলো অন্য পক্ষের জয়যাত্রা।

৪৮. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫২।
৪৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৪।
৫০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৪।
৫১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৮।

www.nagorikpathagar.org

৭. শশাংকের বৌদ্ধ-নিধন ও বোধিবৃক্ষ ছেদন

ছয় শতকের গোড়ার দিকে গুপ্ত-সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে। উত্তর ভারতের ক্ষুদ্র রাজবংশগুলির মধ্যে গোলযোগ, বিশৃংখলা ও পরস্পর শত্রুতার একটি নতুন যুগ শুরু হয়।[৫২] ছয় শতকের গোড়ার দিকে বংগ এবং শেষের দিকে উত্তর বংগ স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। ছয় শতকের মধ্যভাগে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও নরেন্দ্রাদিত্য সমাচারদেব,– এই তিনজন রাজার খবর জানা যায়। তাঁদের রাজ্য বর্ধমান থেকে ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এরপর আরো ক'জন রাজা এসব অঞ্চলে রাজত্ব করেন। ছয় শতকের শেষের দিকে বাদামীর চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মা বংগ জয় করলে এ ভূখণ্ডের স্বাতন্ত্র্য আবার কিছুদিনের জন্য ক্ষুণ্ন হয়।

সাত শতকের শুরু থেকে তৃতীয় ভাগ পর্যন্ত বংগ-সমতটে খড়্গবংশ শাসন চালায়। নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন, তারা ছিলেন কোন পার্বত্য কৌমের প্রতিনিধি। খড়্গবংশের পর সামন্ত রাজবংশের শিবনাথ-শ্রীনাথ-লোকনাথদের শাসন চলে। সাত শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় ভাগে চলে ব্রাহ্মণ্যধর্মী রাজবংশের শাসন। এরা সবাই ছিলেন সামন্ত। কিন্তু আচরণ করতেন স্বাধীন নরপতির মতো।

সাত শতকের একেবারে শুরুর দিকে গৌড়ে (পশ্চিম বংগ) শশাংক নামে এক শক্তিশালী রাজার আবির্ভাব ঘটে। এর আগে শশাংক গৌড়রাজ্যের শাহবাদ জেলা শাসন করতেন।[৫৩] আনুমানিক ৬০১ খ্রীস্টাব্দে [মক্কায় হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবুওয়ত লাভের দশ বছর আগে] শশাংক ক্ষমতাসীন হন। ৬৩৫ খ্রস্টাব্দ [হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতের শেষ] পর্যন্ত তাঁর শাসন স্থায়ী হয়। শশাংক ছিলেন শৈব ধর্মের অনুসারী এবং গুপ্তরাজাদের মহাসামন্ত। তিনি মুরশিদাবাদের নিকটে কর্ণসুবর্ণে রাজধানী স্থাপন করেন।

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেন যে, কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্তি শশাংকের রাজ্যভুক্ত ছিলো। তবে ডক্টর মোহাম্মদ মোহর আলীর মতে, একমাত্র পুণ্ড্রবর্ধন ছাড়া অন্যান্য এলাকার ঠিক কতোটা অংশ শশাংক তাঁর নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছিলেন তা স্পষ্ট নয়। তাঁর মতে, সীমান্তে উত্তর ভারতীয় হামলা মুকাবিলা করতে এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বৌদ্ধদের নিধন করে হিন্দু সেবাইতদের প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টার মধ্যেই শশাংকের শক্তি ক্ষয় হয়েছে।[৫৪] ডকটর নীহাররঞ্জন রায়ও উল্লেখ করেছেন যে, কনৌজ, থানেশ্বর, কামরূপ– উত্তর ভারতের এই সেরা রাষ্ট্রগুলির সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে তাঁকে লড়াইয়ে লিপ্ত থাকতে হয়েছে।[৫৫]

চরম বৌদ্ধ-বিদ্বেষী এই ব্রাহ্মণ রাজার আমলে বৌদ্ধরা নিষ্ঠুর নির্মূল অভিযানের

৫২. ডক্টর মোহাম্মদ মোহর আলী ঃ হিস্ট্রি অব দি মুসলিমস অব বেঙ্গল, ১ম (ক) খণ্ড, পৃ ৭।
৫৩. ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সরকার ঃ গৌড়রাজমালা, প্রথম নব ভারত সংস্করণের ভূমিকা।
৫৪. ডক্টর মোহাম্মদ মোহর আলী ঃ হিস্ট্রি অব দি মুসলিমস অব বেঙ্গল, ১ম (ক) খণ্ড, পৃঃ ৭।
৫৫. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), সংক্ষেপিত সংস্করণ, পৃঃ ৮০-৮১।

www.nagorikpathagar.org

শিকার হয়। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বহু বাংগালীকে এ সময় দেশান্তরী হতে হয়। ৬৩০ সালে ভারত সফরকারী বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়ান সাঙ উল্লেখ করেন যে, রাজা শশাংক গয়ায় বোধিবৃক্ষ ছেদন করেন এবং নিকটবর্তী বৌদ্ধ মন্দির থেকে বুদ্ধমূর্তি সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। শিবের উপাসনাকারী শশাংক পরধর্মের বিলোপ এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পথে সকল বাধা দূর করতে বল প্রয়োগের নীতিতে আস্থাবান ছিলেন।

রাজা শশাংকের বৌদ্ধনীতি সম্পর্কে রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ থেকে ধারণা পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে ঃ 'কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাংক বৌদ্ধদের উপর অশেষ অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি আদেশ হইতে তাঁহার নিষ্ঠুরতার পরিচয় সুস্পষ্ট হইবে ঃ

'আ-সেতোর্ আতুষারাদ্রের্ বৌদ্ধানাং বৃদ্ধবালকান।
যো ন হন্তি স হন্তব্যো ভৃত্যান্ ইত্যশিষন্ নৃপঃ।।

'সেতুবন্ধ হইতে হিমালয় পর্যন্ত যেখানে যত বৌদ্ধ আছে তাহাদের বৃদ্ধ ও বালকদের পর্যন্ত যে না হত্যা করিবে, সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে– রাজভৃত্যদিগের প্রতি রাজার এই আদেশ।'[৫৬]

হিউয়ান সাঙ উল্লেখ করেন যে, শশাংকের ক্ষমতা গ্রহণের আগেই বাংলায় আর্য সমাজ-ব্যবস্থার প্রচলন হয়। এ সমাজ-ব্যবস্থার প্রধান অংগ বর্ণাশ্রম প্রথা সমাজের গভীরে প্রবেশ করতে থাকে। রাজা শশাংক বিভেদমূলক এ সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি শক্তিশালী করেন। হিউয়ান সাঙ দেখেছেন, রাজ্যময় তখন চরম বিশৃংখলা বিরাজ করছিলো। বৌদ্ধ মঠগুলি জনশূন্য হয়ে পড়েছিলো এবং বৌদ্ধ ধর্ম দ্রুত অবক্ষয়ের পথে এগোচ্ছিলো। হিউয়েন সাঙ-এর ভ্রমণ বৃত্তান্তের নানাস্থানে শশাংকের বৌদ্ধ-বিদ্বেষ ও বৌদ্ধ-নির্যাতনের কথা লেখা আছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হিউয়েন সাঙ-এর এ সম্পর্কিত একটি বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন। তা হলো ঃ 'কর্ণসুবর্ণের অধিপতি বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল শত্রু দুষ্টাত্মা শশাঙ্ক কর্ত্তৃক হর্ষবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন নিহত হইয়াছিলেন। শশাঙ্ক গৌতম বুদ্ধের পদচিহ্নাঙ্কিত পাষাণখণ্ড বিনাশে অসমর্থ হইয়া উহা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা যথাস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছিল। শশাঙ্ক বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ ছেদন করিয়া উহা নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু উহা অশোকের বংশধর মগধরাজ পূর্ণবর্ম্মার যত্নে পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল।'[৫৭]

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শশাংকের বৌদ্ধ নিধনযজ্ঞের তথ্যাদি অমূলক প্রমাণের চেষ্টা করেছেন এবং অবশেষে তাঁর ধ্বংসলীলার 'কারণ' ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তিনি

৫৬. শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ, পৃঃ ১২৪।

৫৭. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম খণ্ড), পৃঃ ৮১; Watte—Yuan Chwang, Vol, 1, p. 343, Beal's Buddhist Records of the Western World, Vo1-1 p-210 ff.

www.nagorikpathagar.org

লিখেছেন ঃ 'শশাঙ্ক কর্তৃক বোধিদ্রুম বিনাশ, কুশীনগরে ও পাটলিপুত্রে বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংস প্রভৃতি কার্য্যের বোধ হয়, অন্য কারণ ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মানুরক্ত স্থানীশ্বর রাজ্যের অনুকূলাচরণের জন্যই বোধ হয় শশাঙ্ক বুদ্ধগয়া, পাটলিপুত্র ও কুশীনগরের বৌদ্ধ যাযকগণকে শাসন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন'[৫৮] এর আগে রাখালদাস বৌদ্ধতীর্থ বা বৌদ্ধাচার্য্যগণের প্রতি শশাঙ্কের অত্যাচারের কাহিনী 'সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য' না হবার কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ 'ইহার প্রথম কারণ এই যে, চৈনিক শ্রমণের ধর্ম্মমত অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল এবং তিনি ধর্ম্মীগণের প্রতি সর্বত্র অযথা পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্বিতীয় কারণ এই যে, শশাংকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেও বঙ্গে ও মগধে বহু মন্দির, বিহার, সংঘারামাদি বিদ্যমান ছিল।'[৫৯]

এ সম্পর্কে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন ঃ 'শশাংকের বৌদ্ধ-বিদ্বেষ সম্পর্কে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। এর সবটাই নিছক কল্পনা বলে মনে হয় না। এই বৌদ্ধবিদ্বেষের কারণ... প্রথমত এই যুগে বাংলা ও আসামের সর্বত্র ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছিল; কোন কোন রাজবংশের পক্ষে এই নতুন ধর্ম ও সংস্কৃতির গোঁড়া পাণ্ডা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বিশেষত যে সব উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করছিল, তারাই ছিল রাষ্ট্রের খুঁটি। দ্বিতীয়ত শশাংকের অন্যতম প্রধান শত্রু হর্ষবর্ধন ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের বড় সমর্থক, শত্রুর আশ্রিত ও লালিত ধর্ম নিজের না হলে তার প্রতি বিদ্বেষ থাকা স্বাভাবিক। অন্য অনেক রাজনৈতিক কারণও থাকতে পারে; যেমন বাণিজ্যে বৌদ্ধদের প্রতিপত্তি। তৃতীয়ত বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধ বর্ধিষ্ণু অবস্থা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী রাজা বোধ হয় পছন্দ করতে পারতেন না।'[৬০]

এসব 'কারণ' নিশ্চয়ই একটি জাতির বিরুদ্ধে নির্মূল অভিযান পরিচালনার পক্ষে 'যুক্তি' হতে পারে না। এর মধ্য দিয়ে একটি সত্যই প্রকাশ পায়, তা হলো, সে যুগে বৌদ্ধ ধর্ম ছিলো ব্যাপকভাবে জনসমর্থিত ও নন্দিত। একদিকে এই ধর্ম ও সংস্কৃতির বর্ধিষ্ণু অবস্থা, সেই সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যে বৌদ্ধদের বিপুল প্রতিপত্তি। আধিপত্যকামী ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য তাই ব্যাপক গণ-নিপীড়ন ও নিধন-যজ্ঞ চালানো হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পোষক রাজ-রাজড়া ও তাঁদের খুঁটিরূপে প্রতিষ্ঠিত 'উচ্চশ্রেণী' এ পথেই অগ্রসর হয়েছিলেন।

রাষ্ট্রের ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রশ্নে রাজা শশাংকের 'সন্দেহাতীত পক্ষপাতিত্বে'র উল্লেখ করে নীহাররঞ্জন রায় জানাচ্ছেন যে, এ পক্ষপাত শশাংকের একার ছিলো না, গোটা যুগ সম্বন্ধেই এ কথা প্রযোজ্য। 'কারণ একটানা দেড়'শ বছর ধরে কোন রাষ্ট্র বা রাজবংশই সমসাময়িক বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির কোন পৃষ্ঠপোষকতা করেননি; অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য

৫৮. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম খণ্ড), পৃঃ ৮৮।
৫৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৮।
৬০. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), সংক্ষেপিত সংস্করণ, পৃঃ ৮১-৮২।

www.nagorikpathagar.org

ধর্ম ও সংস্কৃতি তাদের অবারিত দাক্ষিণ্য লাভ করেছে।'[৬১] হিউয়েন সাঙের সময় বাংলাদেশে বৌদ্ধদের মাত্র সত্তরটি বিহার-সংঘারাম ছিলো, আর ব্রাহ্মণদের মন্দিরের সংখ্যা ছিলো তখন তিন'শ।

শশাংকের আমলের আবিষ্কৃত মুদ্রাগুলির এক পাশে নন্দীর পিঠে বসা মহাদেবের মূর্তি, অপর পিঠে পদ্মাসনে আসীনা লক্ষ্মীর মূর্তি রয়েছে।[৬২] যশোর জেলার মোহাম্মদপুর গ্রামে শশাংকের একটি মুদ্রা পাওয়া গেছে। শশাংকের মুদ্রাগুলির মধ্যে নিম্নমানের ধাতু ব্যবহার থেকে মনে হয় দীর্ঘদিন যুদ্ধে লিপ্ত থাকার কারণে তাঁর রাজ্যে অর্থাভাব প্রকট হয়েছিলো। তাই রূপা মিশানো নিম্নমানের মুদ্রা চালু করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন।[৬৩] যুদ্ধলোলুপ রাজার একাধিপত্যে বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর নির্মূল অভিযান চলছিলো। সামগ্রিকভাবে প্রজা-সাধারণের জীবনে নেমে এসেছিলো অর্থনৈতিক দুর্ভোগ। কিন্তু এ অবস্থার মধ্যে আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুত্থান-প্রয়াসী এই রাজা বিদেশাগত ব্রাহ্মণদের মাঝে নিষ্কর দান হিসাবে গ্রামের পর গ্রাম বিলি করছিলেন। ১৯৩৭ সালে মেদিনীপুর জেলায় শশাংকের দু'টি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। সেগুলির একটি হলো ভট্টেশ্বর নামক ব্রাহ্মণকে মহাকুম্বারপদ্রক গ্রাম দানের দলিল। অপরটি দাম্যস্বামী নামক আরেকজন ব্রাহ্মণকে কুশরপ্রদ্রক গ্রামের ৪০ দ্রোন জমি এবং এক দ্রোন কাপ বাস্তুভূমি দানের দলিল।[৬৪]

নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন ঃ 'এ যুগের বঙ্গ ও সমতটের রাজারা সবাই ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী। শশাঙ্ক ও ভাস্করবর্মা ছিলেন শৈব; রাতবংশের মধ্যে একমাত্র খড়্গ-রাজা ছিলেন বৌদ্ধ। জনসাধারণের বেশ একটা বড় অংশে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কার প্রচলিত ছিল, কিন্তু সপ্তম শতকের শেষ পঁচিশ বছরের আগে পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম রাষ্ট্রের ও রাজবংশের কোন অনুগ্রহ বা সমর্থন পায়নি। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতিই সমানে রাজকীয় সমর্থন ও পোষকতা লাভ করেছে।'[৬৫]

এ সব তথ্য সন্দেহাতীতভাবেই প্রমাণ করে যে, সে যুগে বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সংস্কৃতিই ছিলো এ দেশের ব্যাপক জনগণের ধর্ম ও সংস্কৃতি। জনগণের ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী রাজা, রাজবংশ ও সমাজের উঁচু কোঠায় আধিপত্য বিস্তারকারী রাজপুরোহিতেরা দীর্ঘকালব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে। তার মুকাবিলায় এখানে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ সংগ্রামের চিত্রও সহজেই পাওয়া যায়। যে বাংগালী দ্রাবিড়রা দীর্ঘকাল ধরে আর্য আগ্রাসনকে তাদের বহিঃসীমান্তে বাধা দিতে সক্ষম হয়েছিলো, তারা বিদেশাগত সংখ্যালঘু ধর্ম ও সংস্কৃতির কাছে সহজে আত্মসমর্পণ

৬১. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম খণ্ড), পৃঃ ৮২।
৬২. British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta Dynasties pp.147-48; রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৪।
৬৩. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ পূর্বোক্ত পৃঃ ৮৭।
৬৪. অদ্রিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ডের ৮৭ পৃঃ টীকা।
৬৫. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, পৃঃ ৮১।

www.nagorikpathagar.org

করবে বলে মনে করার কারণ নেই। ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী রাজাদের যুগ-যুগব্যাপী চেষ্টা সত্ত্বেও জনগণের সংগ্রামী প্রতিরোধ শক্তির জোরে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি দীর্ঘদিন ধরে এ এলাকার প্রধান ধর্ম ও সংস্কৃতিরূপে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়।

রাজা শশাংক থানেশ্বর-রাজ রাজ্যবর্ধনকে প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হত্যা করেন। রাজ্যবর্ধনের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ থেকে জানা যায় ঃ প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধনের বড় ভাই রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করে সৎভাবে রাজ্যশাসন করছিলেন। এ সময় ভারতের পূর্বাঞ্চলে কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাংক অনেক সময় তাঁর মন্ত্রীদের বলতেন, 'সীমান্তবর্তী রাজ্যের রাজা ধার্মিক হলে নিজ রাজ্যের অকল্যাণ হয়।' এরপর রাজ্যবর্ধনকে শশাংক তাঁর রাজ্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে এনে (নিরস্ত্র অবস্থায় প্রতারণামূলকভাবে) হত্যা করেন।[৬৬] বানভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত' থেকে জানা যায়, থানেশ্বর-রাজ রাজ্যবর্ধনকে মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়ে, তাঁকে স্বভবনে অস্ত্রহীন অবস্থায় একাকী পেয়ে শশাংক গোপনে হত্যা করেন।[৬৭]

রাজ্যবর্ধনের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকার 'হর্ষ-চরিত'-এর মধ্যযুগীয় টীকাকারের বরাত দিয়ে লিখেছেন ঃ '... রাজ্যবর্ধনের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য শশাংক তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ প্রস্তাব দ্বারা স্থান্বীশ্বররাজকে প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গৃহে রাজ্যবর্ধন যখন আহারে প্রবৃত্ত, তখন ছলে তাঁহাকে অনুচরগণের সহিত হত্যা করিয়াছিলেন।'[৬৮]

এ ঘটনার বিবরণে 'হর্ষচরিত'-এ কিছু সংক্ষপে বলা হয়েছে যে, শশাংক মিথ্যা ভদ্র ব্যবহার দ্বারা রাজ্যবর্ধনের মনে বিশ্বাস জন্মান এবং নিজ ভবনে নিরস্ত্র, অসন্ধিগ্ধ শত্রুকে হত্যা করেন। হর্ষের তাম্রশাসনে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজ্যবর্ধন কথা রাখার জন্য শত্রু ভবনে গিয়ে প্রাণ হারান। এ সব বিবরণের মধ্যে পরস্পর কোন মৌলিক বিরোধ নেই।

রাজ্যবর্ধন শশাংকের হাতে নিহত হওয়ার পর তাঁর ভাই হর্ষবর্ধন ৬০৬ খ্রীস্টাব্দে থানেশ্বরের সিংহাসন লাভ করেন। হর্ষচরিতের রচয়িতা বানভট্টের বর্ণনা মতে হর্ষবর্ধন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশ্বকে নিঃক্ষত্রিয় করার শপথ নিয়েছিলেন। অন্য একটি বিবরণ থেকে দেখা যায়, হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যতদিন ভাইয়ের হত্যাকারীদের শাস্তি দিতে না পারবেন ততদিন তিনি ডান হাতে খাদ্য গ্রহণ করবেন না।[৬৯]

---

৬৬. Beal's Buddhist Record of the Western World. Vol. L. p. 210 : রমা প্রসাদ চন্দের অনুবাদ, গৌররাজমালা, পৃঃ ৮।

৬৭. হর্ষচরিত, ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্করণ, পৃঃ ১৬১।

৬৮. ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকার ঃ গৌড়রাজমালা, প্রথম নব ভারত সংস্করণের ভূমিকা।

৬৯. Beal's Buddhist Record of the Western World, Vol. I. p. 213.

www.nagorikpathagar.org

শশাংক কামরূপের দিকেও থাবা বিস্তার করেন। কাপরূপ-রাজ ভাস্কর-বর্মা শশাংকের বিরুদ্ধে থানেশ্বর-রাজের কাছে সাহায্য কামনা করেন। রাখালদাস লিখেছেন যে, হর্ষ ও ভাস্করবর্মার সাথে যুদ্ধে শশাংক পরাজিত হন। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেন যে, থানেশ্বররাজ হর্ষবর্ধন ও কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা একযোগে গৌড়ের দিকে অগ্রসর হয়ে শশাংকের রাজ্য ধ্বংস করেন। 'আর্য-মঞ্জু শ্রী-মূলকল্প' গ্রন্থে হর্ষের হাতে শশাংকের পরাজিত হবার তথ্য পাওয়া যায়। রমেশচন্দ্র মজুমদারও এই মত সমর্থন করেন।

হর্ষবর্ধন কঙ্গোদ, কজঙ্গল ও মগধ অধিকার করেন এবং ভাস্কর বর্মা পুণ্ড্রবর্ধন ও কর্নসুবর্ণ জয় করেন। হর্ষ তাঁর শেষ জীবনে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। শশাংকের মৃত্যুর পরও তিনি ৬৪৭ সাল পর্যন্ত আর্যাবর্তে রাজত্ব করেন।[৭০] উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় হর্ষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো বলে যে ধারণা রয়েছে, ডক্টর মোহাম্মদ মোহর আলীর মতে সে সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ।[৭১]

৮. মাৎসান্যায়ের একশ বছর

শশাংকের সহিংস দমন-নীতি ও নযিরবিহীন কুশাসনের পরিণামে তাঁর মৃত্যুর পরপরই বাংলায় চরম রাজনৈতিক অরাজকতা দেখা দেয়। প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার করার যে সংকল্প[৭২] শশাংকের শাসননীতিকে প্রভাবিত করেছিলো, সে নীতি এ এলাকার মানুষের জন্য অশেষ ক্লেশ ও দুর্ভোগের কারণ হয়। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'আর্য-মঞ্জুশ্রী-মূলকল্প'-এ উল্লেখ করা হয় যে, শশাংকের মৃত্যুর পর গৌড়রাজ্য অভ্যন্তরীণ কলহ ও বিদ্রোহে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। এখানে একাধিক রাজার অভ্যুদয় ঘটে। তাঁরা কেউ কেউ এক সপ্তাহ বা এক মাস রাজত্ব করেন। সে যুগের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বিখ্যাত তিব্বতীয় লেখক লামা তারানাথ জানাচ্ছেন ঃ 'সমগ্র দেশের তখন কোন রাজা ছিলো না; প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, সম্ভ্রান্ত লোক ও বণিক নিজ নিজ এলাকা স্বাধীনভাবে শাসন করতেন। ফলে জনগণের দুঃখ-দুর্দশার সীমা ছিলো না। প্রবলরা অবাধে দুর্বলদের ওপর অত্যাচার চালাতো।'

সাত শতকের মাঝামাঝি থেকে আট শতকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত এই একশ বছর গৌড়রাষ্ট্রে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী কেউ ছিলেন না। রাষ্ট্রের সামগ্রিক ঐক্য বলতেও কিছুই ছিলো না। ছোট ছোট সামন্তরা নিজ নিজ এলাকায় একচ্ছত্র হয়ে উঠেছিলো। ছোট মাছেরা যেমনি বড় মাছের উদরস্থ হওয়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে, তখনকার রাজ্য এবং প্রজাপুঞ্জের অবস্থা ছিলো তেমনি। এ কারণেই এ যুগ চিহ্নিত হয়েছে মাৎসান্যায় যুগ

৭০. ডক্টর মোহাম্মদ মোহর আলী ঃ হিস্ট্রি অব দি মুসলিমস অব বেঙ্গল, ১ম (ক) খণ্ড, পৃঃ ২৭।
৭১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭।
৭২. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৫।

www.nagorikpathagar.org

নামে।

ব্যতিক্রমরূপে সাত শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী খড়্গ বংশের নেতৃত্বে বঙ্গ ও সমতট রাষ্ট্রে মোটামুটি একটা সামগ্রিক ঐক্য বজায় ছিলো। মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী খড়্গরাজাদের আমলে বঙ্গ-সমতটে বৌদ্ধ ধর্ম তার প্রভাব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে এই খড়্গবংশ ছাড়া পাঁচ, ছয় ও সাত শতকের বাংলার আর কোনো রাজবংশই বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলো না।

খড়্গবংশের পতনের পর বংগরাষ্ট্র বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চন্দ্রবংশীয় রাজাদের অধীন হয়। এই বংশের শেষ রাজা ললিতচন্দ্রের মৃত্যুর পর সারা দেশ জুড়েই দারুণ এক নৈরাজ্য দেখা দেয়। লামা তারানাথ লিখেছেন, উড়িষ্যায়, বংগে এবং পূর্বদেশের অন্য পাঁচটি প্রদেশে প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্য তখন নিজ নিজ অধিকারে রাজা হয়ে উঠেছিলো।

সামন্ততন্ত্রও এ সময় খুবই প্রবল হয়ে ওঠে। সে তথ্য উল্লেখ করে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ 'বাঙ্গালাদেশে যখন অরাজকতা, যখন রাষ্ট্রীয় শক্তি লুপ্ত, যখন অগ্নিদগ্ধ গ্রামের ধূম বাঙ্গালার সুনীল আকাশ কলঙ্কিত করিতেছিল, হতাহত গ্রামীণ এবং নাগরিকের শবসমূহ, সর্বহারা নারীর অশ্রুজল, পিতৃমাতৃহীন বালক-বালিকার ক্রন্দনে সমস্ত দেশ মুখরিত, তখন দুর্বল ভূস্বামী, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ এবং জন সমাজ আত্মরক্ষার্থে সামন্তদের সাহায্য লাভ করিতে চেষ্টিত হইবে ইহা বিস্ময়কর নহে।'[৭৩]

এই বিশৃংখল যুগের অবস্থা সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন ঃ 'গৌড়-বঙ্গ-সমতটে তখন কোন রাজার আধিপত্য নেই। রাষ্ট্র ছিন্নভিন্ন; ক্ষত্রিয়, বণিক, ব্রাহ্মণ, নাগরিক যে যার ঘরে সবাই রাজা। আজ যে রাজা হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব দাবি করছে, কাল তার কাটামুণ্ড ধুলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। এই নৈরাজ্যের নাম দেওয়া হয়েছে মাৎস্যান্যায়। রাজা নেই, অথচ সবাই রাজার গদিতে বসতে চায়। এক'শ বছর ধরে চলল এই অবস্থা।'[৭৪]

এ যুগ সম্পর্কে 'গৌড়রাজমালা' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয় ঃ '... সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধের বাঙ্গালার ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা।...খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালায় বড়ই দুর্দিনের সূত্রপাত হইয়াছিল। উত্তরাপথের ইতিহাসে এই যুগ ঘোর পরিবর্তনের যুগ। অবিরত রাজ-বিপ্লব এই যুগের প্রধান লক্ষণ। বাঙ্গালার ভাগ্যে এই বিপ্লবজনিত ক্লেশের ভার অপেক্ষাকৃত গুরুতর হইয়াছিল।'[৭৫]

লামা তারানাথ গোপালদেবের রাজ্যলাভের অব্যবহিত আগের গৌড়-বংগের অবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন ঃ 'প্রতিদিন এক-একজন করে রাজা হতেন, কিন্তু ভূতপূর্ব রাজার স্ত্রী রাতে তাঁকে হত্যা করতেন। কিছুদিন পরে গোপালদেব রাজপদ লাভ করার পর রাণীর

৭৩. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৯।
৭৪. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, পৃঃ ৮৩।
৭৫. ডক্টর রমাপ্রসাদ চন্দ ঃ গৌড়রাজমালা, পৃঃ ১৬।

www.nagorikpathagar.org

হাত থেকে আত্মরক্ষা করে আমরণ সিংহাসন লাভ করেছিলেন।'[৭৬]

এ কাহিনী সম্পর্কে রাখালদাসের মত হলো ঃ 'তারানাথের ইতিহাস বিশ্বাসযোগ্য নহে, কিন্তু ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে যখন গোপালদেবের নির্ব্বাচনের কথা আছে, তখন তাঁহার উক্তির এই অংশমাত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, গোপালদেবের পূর্ব্বে অভূতপূর্ব্ব রাজপত্নীর অত্যাচারে দেশের অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল।'[৭৭]

মাৎসান্যায় যুগের অরাজক পরিস্থিতিতে আর্য-ব্রাহ্মণেরা তাদের তৎপরতা জোরদার করার সুযোগ পায়। এ সময় ব্রাহ্মণরা জনগণের মুখের ভাষার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালায়। বিশৃংখল পরিস্থিতিকে এ ব্যাপারে কাজে লাগাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, সাত শতকের মাঝামাঝি সময়ে এদেশে সংস্কৃত ভাষা মাথা তোলে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মও আগের তুলনায় বিস্তৃতি লাভ করে। বৌদ্ধ ধর্মের সাংস্কৃতিক আদর্শের ওপর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি এ সময় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। তিনি জানাচ্ছেন ঃ সাত শতক থেকে আট শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ব্রাহ্মণদের আস্তানা সমুদ্র তীর পর্যন্ত ছেয়ে ফেলেছে। আর বৌদ্ধ ধর্মের সাংস্কৃতিক আদর্শের ওপর ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির ছাঁচ ছায়া বিস্তার করছে। ছোট-বড় ভূস্বামীত্ব তখন ব্রাহ্মণদের দখলে। বৌদ্ধমঠগুলি জীর্ণ হয়ে পড়েছে। সেগুলির ইট-কাঠ খুলে নিয়ে ঘর-বাড়ি করা হচ্ছে।[৭৮]

এ থেকে মনে হয়, একশ বছরের মাৎসান্যায় যুগের চরম বিশৃংখল অবস্থার মধ্যে জনগণের আর্য-ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যবাদবিরোধী প্রতিরোধ ও মুক্তির লড়াই অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। অবশ্য পরবর্তী ঘটনা-প্রবাহ প্রমাণ করে যে, সে সংগ্রামী ধারাটি সাময়িকভাবে দুর্বল হলেও তা কখনো নিঃশেষিত হয়নি। মাৎসান্যায়ের বিরুদ্ধে শীঘ্রই তা প্রবল এক গণ-অভ্যুত্থানরূপে জেগে উঠেছে।

৭৬. Indian Antiquary, Vol. IV, p-366; রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃঃ ১৩৫।
৭৭. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৫।
৭৮. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, পৃঃ ৫৫।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়

পাল শাসনের চারশ বছর ঃ গৌরব পুনরুদ্ধার

১. জন-সমর্থনপুষ্ট সরকার

আব্বাসীয় খিলাফতের সূচনালগ্নে ৭৫০ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশে মাৎসান্যায় যুগের অবসানের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয় এক বৈপ্লবিক ঘটনা। একটি তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, প্রবলের অত্যাচারে পীড়িত জনসাধারণ মাৎসান্যায় দূর করার জন্য একজন রাজা নির্বাচন করেন।[১] রাখালদাস লিখেছেন, 'প্রজাবৃন্দ যাঁহাকে গৌড়-বঙ্গ-মগধের সিংহাসন স্বেচ্ছায় প্রদান করিয়াছিল তাঁহার নাম গোপালদেব।'[২] গোপালদেব পালবংশের প্রথম রাজা এবং তাঁর রাজ্যকাল থেকেই গৌড়, মগধ ও বংগের পাল সাম্রাজ্যের ইতিহাস শুরু হয়েছে।[৩] নগেন্দ্র বসু জানাচ্ছেন, গোপাল ছিলেন মূলতই বংগবাসী এবং বংগের রাজা রাজভট্টের বংশে তাঁর জন্ম হয়েছিলো।[৪] কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, গোপালের নির্বাচন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে হয়নি। মন্ত্রী, রাজকর্মচারী, প্রভাবশালী প্রজাবর্গ ও বণিকরা এ নির্বাচন সম্পন্ন করেন। এ মত সঠিক মনে হয়। যুগের পরিস্থিতিতে এর চাইতে উন্নততর কোন ব্যবস্থা অসম্ভব ছিলো। গৌড়-মগধ-বংগের শাসকরূপে গোপালের এ নির্বাচন ছিলো দেশের গরিষ্ঠ বৌদ্ধ জনমতের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন। মোটামুটি গণতান্ত্রিকভাবে জনসমর্থনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এ শাসন ছিলো দেশের জনগণের দীর্ঘস্থায়ী মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যের ফসল। আর্যদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আগ্রাসনের ফলে সৃষ্ট এক দীর্ঘস্থায়ী অন্ধকার যুগের অবসান ঘটেছিলো পাল-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। জনসমর্থনপুষ্ট এ শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিলো।

পাল রাজবংশের শ্রেষ্ঠরাজা ধর্মপাল (শাসন ৭৭০-৮১০ খ্রীঃ) ও দেবপাল (শা. ৮১০-৮৫০) বাংলার বৃহত্তর অংশে তাঁদের শাসন ক্ষমতার বিস্তার ঘটাতে সক্ষম হন। উত্তর ভারতের গুর্জারা-প্রতিহারা এবং দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট শাসকদের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায়ও তাঁরা যথেষ্ট সাফল্যের পরিচয় দেন। ধর্মপালের সময় পশ্চিমে সিন্ধু ও

১. ধর্মপালদেব-এর খালিমপুরের তাম্রশাসন; গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১১-১৪।
২. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৭।
৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৮।
৪. নগেন্দ্র বসু ঃ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ১৪৭।

www.nagorikpathagar.org

গান্ধার, দক্ষিণে সৌরাষ্ট্র, বিন্ধ্য এবং উত্তরে নেপাল পর্যন্ত সমগ্র আর্যাবর্তে বিশাল পাল-সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। এই সাম্রাজ্যের বাংলা ও বিহার ধর্মপালের নিজ শাসনাধীনে ছিলো। অন্যান্য রাজ্যের রাজা ধর্মপালের প্রভুত্ব স্বীকার করে নিজ নিজ রাজ্য শাসন করতেন। প্রাচীন পাটলিপুত্র (বর্তমান পাটনা) ছিলো ধর্মপালের বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানী।

ধর্মপাল সমগ্র আর্যাবর্ত জয় করার পর কান্যকুব্জে এক বিরাট রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সে রাজদরবারে আর্যাবর্তের বহু সামন্ত নরপতি উপস্থিত হয়ে ধর্মপালের অধীনে রাজ্য পরিচালনার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সে অনুষ্ঠানে সিন্ধুনদের তীরবর্তী একটি মুসলিম রাজ্যের অধিপতিও শরিক হন।[৫]

দেবপালের মৃত্যুর পর পালবংশের ক্ষমতায় ভাটির টান শুরু হয়। তাঁর উত্তরাধিকারীরা বারো শতক পর্যন্ত শাসন অব্যাহত রাখতে সক্ষম হন, তবে তা ছিলো সীমিত অঞ্চলে। বাংলার নানা জায়গায় এ সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক রাজবংশ মাথা চাড়া দেয়। দেবপালের পর নারায়ণ পালের ৫৪ বছরের শাসনকালে রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষ একবার অঙ্গ-বঙ্গ-মগধে হামলা চালান। উড়িষ্যার গুলিকরাজও রাঢ়ের কিছু অংশ দখল করেন। প্রতিহার-রাজ প্রায় মগধ পর্যন্ত অগ্রসর হন। এ সময়ই ডাহল-রাজ কোকল্লদেব বংগের রাজভাণ্ডার লুট করেন। পাহাড়পুর পর্যন্ত প্রতিহারভুক্ত হয়। তবে নারায়ণ পাল তাঁর মৃত্যুর আগে বংগ-বিহার মুক্ত করতে সক্ষম হন। নারায়ণপালের পুত্র রাজ্যপালের পৌত্র গোপালের রাজত্বকালে পালসাম্রাজ্য কমপক্ষে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। কিন্তু গোপালের পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপালের আমলে বিহারের অধিকার হাতছাড়া হয়। উত্তর ভারতের চন্দেল্ল ও কলচুরি রাজবংশ এ সময় শক্তিশালী হয়ে ওঠে। গৌড়, অঙ্গ, রাঢ় তাদের পদানত হয়। দশ শতকের গোড়ার দিকে কলচুরি রাজার পুত্র লক্ষণরাজ বংগদেশ জয় করেন। এ সময় উত্তর ও পূর্ববংগে কম্বোজ নামে এক রাজবংশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাদের আদিভূমি তিব্বতে, নাকি উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত অথবা পূর্ব-দক্ষিণ ভারতে, এ নিয়ে নানা মত রয়েছে। এ সময় বাংলার বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজবংশও মাথা চাড়া দেয়। তাদের মধ্যে দেববংশ নামে এক নতুন রাজবংশের কথা জানা যায়। এ রাজবংশের একজন শক্তিশালী রাজার নাম ভবদেব। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এই রাজাই ময়নামতির শালবন বিহার নামক বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন। অনুমান করা হয় যে, কুমিল্লার কাছে ময়নামতি পাহাড়ের দক্ষিণাংশে অবস্থিত দেব পর্বত ছিলো দেববংশীয় রাজাদের রাজধানী।[৬] সম্ভবত দেবপালের পর দুর্বল

৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস ঃ প্রাচীন যুগ পৃঃ ৪৩-৪৪।
(ধর্মপালের রাজ্যাভিষেকের শতাধিক বছর আগে ৭১১ খৃস্টাব্দে (৯৩ হিজরী) উমাইয়া শাসক ওয়ালিদের আদেশে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী সিন্ধুর অত্যাচারী হিন্দু রাজা দাহিরকে পরাজিত ও নিহত করে সিন্ধু অধিকার করেছিলেন। বাংলায় সে সময় ঘোর মাৎসান্যায় বা চরম বিশৃংখল অবস্থা চলছিলো।)

৬. ডক্টর মোহাম্মদ মোহর আলী, হিস্ট্রি অব দি মুসলিমস অব বেঙ্গল, ১ম (ক) খণ্ড।

www.nagorikpathagar.org

পালরাজাদের আমলে এই বংশের রাজাগণ পূর্ববংগে স্বাধীন দেবরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বীরদেব, আনন্দদেব ও ভবদেব নামে এ বংশের তিনজন রাজার নাম জানা গেছে। এছাড়া পূর্ববংগের হরিকেলে কান্তিদেব নামে আরো একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজার কথা জানা যায়। সিলেট-ত্রিপুরা-চট্টগ্রামে কোথাও বর্ধমানপুর ছিলো তাঁর রাষ্ট্রকেন্দ্র। এ ছাড়া লহরচন্দ্র নামে ত্রিপুরা অঞ্চলে আরেকজন রাজার কথা জানা যায়। তাঁর রাজত্ব আঠারো বছর স্থায়ী হয়। পুব ও দক্ষিণবংগে এরপর চন্দ্রবংশের রাজত্বকাল। চন্দ্ররাও ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এই রাজবংশের সুবর্ণচন্দ্র, ত্রৈলোক্যচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র, কল্যাণচন্দ্র, লডহচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের নাম জানা যায়। ত্রৈলোক্যের রাজধানী ছিলো দেব পর্বতে। শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করেন।

এভাবে দেখা যায়, সমগ্র বাংলাদেশ পালদের হাতছাড়া হবার পরও সেখানে বৌদ্ধ রাজাদেরই শাসন কায়েম ছিলো। দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র মহীপাল উত্তর-পূর্ববংগের হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। তিনি সারনাথে অনেক জীর্ণ বিহার ও বৌদ্ধমন্দির সংস্কার করেন। নতুন বিহার প্রতিষ্ঠা, বুদ্ধগয়া বিহারের সংস্কার প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ জগতে বাংলাদেশের মান-মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সফল হন। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে পালবংশের নতুন করে মাথা তোলার চেষ্টার মধ্যে বাংগালী তার দেশ ও রাষ্ট্রের আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠা দেখতে পেয়েছিলো।

২. মুসলিম অভিযানের ফলে পাল শাসনের আয়ু বৃদ্ধি

ভারতের পশ্চিম সীমান্তে সে সময় সুলতান মাহমুদের পর্যায়ক্রমিক হামলা বাংলার পালরাজাদেরকে তাদের শাসন সংহত করার সুযোগ এনে দেয়। এ প্রসঙ্গে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন ঃ 'সমসাময়িক হিন্দু শক্তিপুঞ্জ সে সময় পশ্চিম দিকে সুলতান মাহমুদের বারংবার আক্রমণে বিব্রত ও বিপর্যস্ত ছিল বলেই মহিপালের পক্ষে হারানো সাম্রাজ্যের খানিকটা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল। এ সময় একাধিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে উত্তর ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রপুঞ্জ একে একে পশ্চিমাগত মুসলিম অভিযানকারীদের হাতে পরাস্ত ও পর্যুদস্ত হচ্ছিল।'[৭]

গজনীর সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হিন্দু-শক্তিসংঘে মহীপাল যোগ দেননি। তার কারণও খুব স্পষ্ট। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের মতে 'ভারতের সামগ্রিক ঐক্যের আদর্শ মহীপালের কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়নি'।[৮] খুব সম্ভব, মহীপালের কাছে 'ভারতের সামগ্রিক ঐক্যে'র শ্লোগান 'হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ঐক্য' বলেই মনে হয়েছিলো। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন ঃ '... ধর্মবিদ্বেষ ও ঈর্ষাই যে মহীপালের ধর্মযুদ্ধের প্রতি ঔদাসীন্যের প্রধান কারণ, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।'[৯]

৭. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস, পৃঃ ৮৭-৮৮।
৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৮।
৯. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাঙ্গালার ইতিহাস পৃঃ ২০৪।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু রাখালদাসের গ্রন্থের টীকাকার রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেন ঃ 'মহীপাল, সারা জীবন বহিঃশত্রুর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার পিতৃভূমি রক্ষার জন্য সর্ব্বদাই তাঁহাকে সতর্ক থাকিতে হইত।'[১০]

এই বহিঃশত্রুদের অধিকাংশই আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উত্থানপ্রয়াসী হিন্দু রাজন্যবর্গ। এ প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ বসুর মন্তব্য খুবই স্পষ্ট। তিনি লিখেছেন ঃ 'যে কলঞ্জরপতি তাঁহার (মহীপালের) পিতামাতাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত মিত্রতা ও একতা স্থাপন করিয়া বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ হইতে উত্তরাপথ রক্ষা করিতে যাওয়া কখনই তিনি উপযুক্ত মনে করেন নাই।'[১১]

ভারতবর্ষে মুসলিম অভিযান এ দেশের সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহে এবং পরবর্তী ইতিহাস নির্মাণে অত্যন্ত প্রভাবশালী উপাদানরূপে কাজ করেছে। বাংগালীর মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসেও সে অভিযানের প্রভাব ছিলো ইতিবাচক ও সুদূরপ্রসারী। বাংগালীর স্বাধীনতাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে এ অভিযানের ছিলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কিন্তু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ মুসলিম অভিযান সম্পর্কে লিখেছেন ঃ 'মহীপাল যখন গৌড়েশ্বর, তখন আর্যাবর্ত্তের ইতিহাসের একটি নূতন অধ্যায় আরব্ধ হইতেছিল। ... পারস্যে আর্দাশিরবাবেকানের বংশজাত শেষ রাজা যখন নূতন ধর্ম্মাবলম্বী আরবগণের নিকট পরাজিত হইয়া নিহত হইয়াছিলেন, তখনও আর্য্যাবর্ত্ত-রাজগণ জগতে নূতন রাষ্ট্রীয় শক্তি উন্মেষের সংবাদ অবগত হন নাই। খৃস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমান বীরগণ যখন সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিয়া উহা অধিকার করিয়াছিলেন তখনও আর্যাবর্ত্ত-রাজগণের চৈতন্য উদয় হয় নাই। তখনও প্রাচীন পারসীক সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সংবাদ অবগত হইয়াও আর্য্যাবর্ত্ত-রাজগণ গৃহ বিবাদে ব্যাপৃত ছিলেন, তখনও গুর্জ্জর-প্রতীহার-রাজগণের ভয়ে রাষ্ট্রকূট-রাজগণ গুর্জ্জরের বিরুদ্ধে তাজিক নামে পরিচিত সিন্ধুদেশবাসী মুসলমানগণের সহিত সন্ধি বন্ধনে আবদ্ধ হইতেন। প্রাচীন পারসীক সাম্রাজ্য ধ্বংসের পরে প্রাচীন পারসীক জাতিকে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া মুসলমানগণ যখন বাহমীক (বমখ), কপিশা (কাবুল) ও গন্ধারের দিকে অগ্রসর হইলেন, আর্য্যাবর্ত্ত তখনও সুষুপ্তিমগ্ন। বাহমীক ও কপিশা অধিকৃত হইল, আফগানিস্থানের পার্ব্বত্য উপত্যকাসমূহে মহারাজাধিরাজ কনিষ্কের বংশধরগণের অধিকার লুপ্ত হইল।... কিন্তু তখনও বৎসরাজ গৌড়বিজয়ে উন্মত্ত, ধ্রুবধারাবর্ষ ও তৃতীয় গোবিন্দ গুর্জ্জর-দলনে ব্যাপৃত। ...২৫৬ হিজিরাব্দে (হিজরী অব্দে) সিজিস্থানের অধিপতি ইয়াকুব লাইস্ গজনী-প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। তুর্কিস্থানের সামানীবংশীয় রাজা ইসমাইল গজনী সামানী-রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীর তৃতীয় পাদে সামানী-রাজ-সেনানায়ক আলপ্তিগীন্... গজনীতে আসিয়া একটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। আলপ্তিগীনের মৃত্যুর পরে তাঁহার তুরস্কজাতীয় ক্রীতদাস সবুক্তিগীন্ গজনীর সিংহাসনে আরোহন

১০. রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ বাঙ্গালার ইতিহাস গ্রন্থের ২০৪ পৃষ্ঠায় সংযুক্ত টীকা।
১১. নগেন্দ্রনাথ বসু ঃ গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৪১।

www.nagorikpathagar.org

করিয়াছিলেন। সবুক্তিগীন্ তাঁহার দশম রাজ্যাঙ্কে ৯২৭ খৃষ্টাব্দে, উত্তরাপথের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন যাহি জয়পাল উদভাণ্ডপুরের সিংহাসনে আসীন। সবুক্তিগীন্ ৯৯৯ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করিলে তাঁহার পুত্র মাহমুদ (সুলতান মাহমুদ) বারম্বার আক্রমণ করিয়া প্রাচীন যাহি-রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন। মাহমুদের গতিরোধ করিবার জন্য কাশ্মীর, কান্যকুব্জ ও কলঞ্জরের অধিপতিগণ প্রাণপণে জয়পালকে সাহায্য করিয়াছিলেন। জয়পাল, তৎপুত্র অনঙ্গপাল ও তৎপুত্র ত্রিলোচনপাল আর্য্যাবর্ত্ত রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিলে যাহিরাজ্য মাহমুদের অধীন হইয়াছিল। শেষ মুহূর্তে আর্য্যাবর্ত্ত-রাজগণের চৈতন্য হইলে প্রতীহার, চন্দেল্ল ও লোহরবংশীয় রাজগণ, যখন চেষ্টা করিতেছিলেন, তখনও গৌড়েশ্বর আর্য্যাবর্ত্ত রক্ষার জন্য স্বদেশীয় রাজবৃন্দের সহিত এই মহাযুদ্ধে যোগদান করেন নাই।... তখন উত্তরাপথের পূর্ব্বার্দ্ধের অধীশ্বর পরম নিশ্চিন্ত মনে "কর্ম্মানুষ্ঠান" করিতেছিলেন।'[১২]

গৌড়-বংগের স্বাধীন শাসকরূপে মহীপালের এই "নিশ্চিন্ত কর্ম্মানুষ্ঠান" দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিলো, সে বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ একমত। তিব্বতীয় ইতিহাসকার লামা তারানাথ উল্লেখ করেন যে, মহীপালদেব বায়ান্নো বছর রাজত্ব করেছেন। রাখালদাস এই মত সমর্থন করে লিখেছেন যে, মুজাফফরপুর জেলার ইমাদপুর গ্রামে আবিষ্কৃত মূর্তিগুলির খোদিত লিপির ওপর নির্ভর করে তারানাথের উক্তি ঐতিহাসিক সত্যরূপে গ্রহণ করা যায়।[১৩]

৩. কর্ণাটি সেন-বর্মণ অভিযান

মহীপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জয়পালের রাজত্বকালে বংগ ও গৌড় কলচুরীরাজ কর্ণ বা লক্ষীকর্ণের দখলে চলে যায়। মহামাণ্ডলিক নামে এক সামন্তরাজা বর্ধমানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ত্রিপুরা অঞ্চলেও পট্টিকদের রাজ্য গড়ে ওঠে। তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে বাংলাদেশে আরেক নতুন বহিঃশক্তির আগমন ঘটে। বাংলায় এ সময় কর্ণাটের একাধিক চালুক্যরাজ যুদ্ধাভিযান চালান। এই অভিযানের সাথি হয়ে কিছু কিছু কর্ণাটি ক্ষত্রিয় ও সামন্ত পরিবার এবং আরো কিছু লোক বাংলাদেশে আসে। অভিযানকারীরা দেশে ফিরে গেলেও এই পরিবারগুলি এখানেই থেকে যায়। বিহার ও বাংলার সেন রাজবংশ এবং বংগের বর্মণ রাজবংশ এ সব দক্ষিণী কর্ণাটি পরিবার থেকে উদ্ভূত।[১৪] এগারো শতকের মাঝামাঝি উড়িষ্যার এক রাজা মহাশিবগুপ্ত যযাতি, গৌড়, রাঢ় ও বংগে এবং উদোতকেশরী নামক আরেক রাজা গৌড়ে অভিযান চালান। বহিঃশত্রুর হামলায় পালরাজ্য ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। বাংলার এই দুর্যোগের সুযোগ নিয়ে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের 'অন্যতম প্রধান পাণ্ডা' বর্মণ রাজবংশ এগারো শতকের

১২. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৩-২০৫
১৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৫।
১৪. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, পৃঃ ৯৪।

www.nagorikpathagar.org

শেষভাবে পূর্ববংগে তাদের রাজত্ব কায়েম করে। তবে পালবংশীয় রাজা রামপালের সময় পূর্ববংগের এক বর্মণ রাজা বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। বর্মণরা ছিলো বহিরাগত যাদব বংশীয়, অবাংগালী। তারা বিক্রমপুরে রাজধানী কায়েম করেছিলো। হরি বর্মণ, জাত বর্মণ, সামল বর্মণ ও ভোজ বর্মণসহ এই বংশের রাজাগণ বংগে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা এবং সামগ্রিকভাবে বাংলায় হিন্দু ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বর্মণরা তাদের রাজত্ব স্থাপনে কলচুরীরাজ গাঙ্গেয়দের ও কর্ণের মদদ পেয়েছিলো।

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেন যে, জাত বর্মণের পুত্র সামল বর্মণের আমলেই বৈদিক ব্রাহ্মণেরা বাংলায় প্রবেশ করার সুযোগ পায়। বর্মণ রাজবংশের শেষ রাজা ভোজ বর্মণের পরে পূর্ব বাংলা সেনদের দখলে চলে যায়।

মদনপালের রাজত্বের আট বছরের মধ্যে বরিন্দের কিছু অংশ এবং বিহারের মধ্য ও পুবাঞ্চল ছাড়া বাকী সমগ্র অঞ্চল পালদের হাতছাড়া হয়। তাঁর মৃত্যুর দশ বছরের মধ্যে পালরাজত্বের অবসান ঘটে।

৪. পাল রাজত্বের চারশ বছর ঃ গৌরব প্রতিষ্ঠার যুগ

পালবংশের চারশ বছরের শাসনামলে বাংগালীরা স্বাধীনতা ও মুক্তির স্বাদ লাভ করে। পালদের দীর্ঘ রাজত্বকাল সম্পর্কে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন ঃ 'বাঙালীর স্বদেশ ও স্বাজাত্যবোধ, বাঙালীর এক জাতীয়ত্বের ভিত্তি পালরাজত্বের চার'শ বছরের মধ্যে গড়ে ওঠে। বাংলার ভৌগোলিক সত্তা, বাংলা লিপি ও ভাষা খুঁজতে গেলে এই চার'শ বছরের মধ্যেই খুঁজতে হবে।'[১৫]

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এই রাজাদের চার শতাধিক বছরের শাসনামল (৭৫০-১১৬২ খ্রীঃ) বাংলার মানুষের আত্ম-আবিষ্কার ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার যুগ। গুপ্ত আমল থেকে বাংলার জনগণের বিরুদ্ধে আর্য-ব্রাহ্মণদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আগ্রাসন শুরু হয়েছিলো। গুপ্তদের উত্তর-পুরুষ বর্ণবাদী হিন্দু রাজা শশাংক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠার নামে এদেশের জনগণের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল, নিবর্তনমূলক ভূমিকা অবলম্বন করেন। পাল আমলে সে আগ্রাসী ভূমিকার অবসান ঘটে। এ এলাকার জনগণের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসরূপে বৌদ্ধ ধর্ম পুনরায় এখানে প্রাধান্য অর্জন করে।

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেন যে, পালবংশ 'প্রধানত' বৌদ্ধ হওয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি আট শতকের শেষ পঁচিশ বছর থেকেই প্রসার লাভ করেছিলো। পাল-চন্দ্রপর্বের সকল রাজবংশই মহাযানী বৌদ্ধ। আট শতক থেকে এগারো শতক পর্যন্ত বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের জয়জয়কার। এইসব রাজবংশের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম বাংলা ও বিহার ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা

১৫. পূর্বোক্ত পৃঃ ৯১।

www.nagorikpathagar.org

পায়।[১৬] তিন-চারশ বছর ধরে একাধিক বৌদ্ধ রাজবংশের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে পূর্ব ভারত ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মের শেষ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। পূর্ব ভারতে, বিশেষত বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের পরমায়ু আরো চার-পাঁচ শ' বছর বেড়ে যায়।[১৭]

আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুসারী শাসকেরা এ দেশে শত শত বছর ধরে যে উগ্র বলপ্রয়োগের নীতি অনুসরণ করেছে, পালদের নীতি ছিল তার বিপরীত। অহিংসা ও শান্তির মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত বৌদ্ধ ধর্মানুসারী পালরাজাদের শাসনামলে হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোনওরূপ প্রতিশোধ গ্রহণের প্রমাণ নেই, বরং মহানুভবতার অনেক নিদর্শন রয়েছে। কোনো কোনো পালরাজা ব্রাহ্মণদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ দিয়েছেন। অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাল-সম্রাট ধর্মপাল গর্গ নামক একজন ব্রাহ্মণকে তাঁর প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন। শেষ দিককার কোন কোন পাল রাজা হিন্দু সমাজবিধানের বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদ প্রথাকেও স্বীকার করে নিয়েছিলেন। বস্তুত পালযুগে আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়নি। গুপ্ত আমল থেকে দেশের মানুষের ওপর যে ব্রাহ্মণ্য নিপীড়ন শুরু হয়েছিলো, তা রোধ হয় এবং বৌদ্ধ ধর্মের স্বাভাবিক বিকাশধারা অবরোধমুক্ত হয়। জনগণের ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার পথে বাধা দূর হয়।

পাল শাসনের আসল গৌরব বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতি। বাংগালী বৌদ্ধদের বুদ্ধিবৃত্তির খ্যাতি অবশ্য তার আগেই ছড়িয়ে পড়েছিলো। হিউয়েন সাঙ তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে সাত শতকের পুন্ড্রবর্ধন, কামরূপ, সমতট, তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ণের লোকদের জ্ঞানস্পৃহা ও জ্ঞান-চর্চার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। নালন্দার মহাবিহারের সাথেও বাংলার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। এই মহাবিহারের (নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যক্ষ শীলভদ্র ছিলেন একজন বাংগালী। তিনি ছিলেন হিউয়েন সাঙ-এর শিক্ষক। এই সুপণ্ডিতের আমলে নালন্দা মহাবিহারে দশ হাজার শ্রমণ ছিলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার-সংঘারাম ছিলো জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষার একেকটি কেন্দ্র। এখানে বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা ও বৌদ্ধ শাস্ত্র পাঠ ছাড়াও ব্যাকরণ, শব্দবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, সংখ্যা, সংগীত, চিত্রকলা, মহাযানশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি পড়ানো হতো। এ যুগের শিক্ষা ও ধর্মের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিলো। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা ছিলো ধর্মাশ্রয়ী; আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক সে ধর্মের নাম ছিলো বৌদ্ধ ধর্ম।

আট ও নয় শতকের মহাযানী, কালচক্রযানী, মন্ত্রযানী, বজ্রযানী, সহজযানী শিক্ষাবিদদের বেশিরভাগই ছিলেন বাংগালী। কয়েকটি ছাড়া সমস্ত মহাবিহার ছিলো বাংলাদেশে। দশ শতকের শেষভাগের জ্যেষ্ঠ জেতাবী ছিলেন অতীশ দীপঙ্করের অন্যতম গুরু। তাঁর বাড়ি ছিল উত্তরবংগে। বাংগালী বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এক বিশ্ববিশ্রুত নাম। আনুমানিক ৯৮০ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুরে তাঁর জন্ম।

১৬. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, সংক্ষেপিত, পৃঃ ১৩৯।
১৭. পূর্বোক্ত পৃঃ ১৩৬।

www.nagorikpathagar.org

তাঁর মৃত্যু হয় ১০৫৩ সালে।

পাল শাসনামলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য জনগণের মুখের ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। জনগণের ভাষার অধিকারের প্রশ্নটি সে যুগে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছিলো। আর্য-ব্রাহ্মণ্য ভাষানীতির মধ্যেই তার কারণ নিহিত। আর্য-ব্রাহ্মণেরা নিজেদেরকে দেবতার আশ্রিত ও আশীর্বাদপুষ্ট বলে দাবি করতো। দেবত্বের সে ছুঁতমার্গী মানসিকতার কারণে তারা সাধারণ মানুষের ভাষায় কথা বলতো না। জনগণের মুখের ভাষা আর্য ঋষিদের কাছে ছিলো অগ্রাহ্য ও অকথ্য! ব্রাহ্মণরা 'সুর' বা দেব! সাধারণ মানুষকে তারা ইতর, অসুর, অদেব, মেচ্ছ নামে অভিহিত করতো। জনগণের ভাষা সম্পর্কে তারা ব্যবহার করতো নিন্দাসূচক বিশেষণ। ব্রাহ্মণদের এত চেষ্টায়ও আনুনাসিক বৈদিক ভাষা নেহাত পূজার্চনা ছাড়া কোথাও ঠাঁই পায়নি। ব্রাহ্মণ্য ভাষা ও জনগণের ভাষার মধ্যেকার এই দ্বন্দ্বকে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'অভিজাততন্ত্র' ও 'গণতন্ত্রের' ভেতরকার রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সাথে তুলনা করেছেন।

ভাষার লড়াইয়ে অভিজাততন্ত্রী ব্রাহ্মণেরা গণতন্ত্রী জনগণের কাছে বরাবরই পরাস্ত হয়েছে। অভিজাততন্ত্রীরা লৌকিক ভাষাকে মেজে ঘষে সংস্কৃত করে নিয়েছে। অন্য দিকে সাধারণ লোকেরা লৌকিক ভাষারূপে পালি ব্যবহার করেছে। ব্রাহ্মণ-পুরুতেরা পালিভাষা ব্যবহারকারী জনগণকে ম্লেচ্ছ বলে গালি দিয়েছে। জনগণের ভাষার বিরুদ্ধে নিষেধের মন্ত্র উচ্চারণ করে তারা বলেছে ঃ 'ন ম্লেচ্ছ ভাষা শিক্ষেত।' ম্লেচ্ছ ভাষা শিখো না। এই শাস্ত্রীয় নিষেধ উপেক্ষা করে দেশের মানুষ পরম উৎসাহে পালির চর্চা করেছে। জনগণের মুখের ভাষা এ সময় বৌদ্ধ ধর্মের সমর্থন লাভ করে। বৌদ্ধ ধর্ম গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তি হিসাবে গণ-ভাষা পালিকে সমৃদ্ধ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলে জনসমর্থনে পুষ্ট হয়ে বৌদ্ধ ধর্ম এ এলাকায় বিরাট শক্তিতে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে প্রাকৃত ভাষা জনগণের মুখের ভাষারূপে পালির স্থান দখল করে। পালির পরে জনগণের ভাষারূপে দেখা দেয় অপভ্রংশ।

ভাষার বিবর্তন ও বিকাশের এই ইতিহাসের কোন পর্যায়েই অভিজাততন্ত্রী সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে দেবতার আসন থেকে মানুষের কাতারে নেমে আসতে পারেনি। জনগণের ভাষা, সংস্কৃতি, আচার ও রীতিনীতির ছোঁয়াচ বাঁচাতে তারা ছুঁতমার্গী নীতি অবলম্বন করেছে। অন্যদিকে বৌদ্ধ ধর্ম জনগণের ভাষা ও সংস্কৃতির সহায়ক ও বিকাশকামী ভূমিকা পালন করেছে।

বাংলার পাল শাসনামলের নয় ও দশ শতকের জনগণের মুখের ভাষাকে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় 'প্রাচীনতম বাংলা ভাষা'রূপে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এ বাংলা ভাষাই মাগধী অপভ্রংশের গৌড়-বঙ্গীয় রূপ। তিনি উল্লেখ করেন যে, বৌদ্ধ পাল-চন্দ্র যুগে তান্ত্রিক ও বজ্রযানী বৌদ্ধ আচার্যদের ভাষা ছিলো প্রাকৃতধর্মী।

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, আর্য-ব্রাহ্মণ্য প্রভাবিত সেন-বর্মণ আমলে জনগণের

www.nagorikpathagar.org

মুখের ভাষা ছিলো উঁচুকোঠায় একেবারেই অনাদৃত। পাল আমলে সে ভাষাই সমৃদ্ধি লাভ করে। নীহার রায় উল্লেখ করেছেন যে, পাল যুগেই বাংলা ভাষা সবেমাত্র গড়ে উঠেছিলো।[১৮] ডক্টর এনামুল হক লিখেছেন ঃ 'খ্রীষ্টীয় নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা ভাষা স্থায়ী রূপ লাভ করিয়াছিল। এই চারিশত বৎসরই বাংলা ভাষার সৃজ্যমানকাল।'[১৯] মুহম্মদ আবদুল হাইও একমত যে, বাংলাদেশে পালরাজাদের আমলে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়। বৌদ্ধ গান ও দোহাগুলি সে কালের বাংলা ভাষার নিদর্শন।[২০] ডকটর ওয়াকিল আহমদ লিখেছেন ঃ 'বৌদ্ধ পাল-রাজাদের নৈতিক উদারতা ছিল; তাদের সুশাসনে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনে 'স্বর্ণযুগে'র সঞ্চয় সমাহৃত হয়েছিল। বাংলা চর্যাপদের জন্ম তখনই।'[২১]

পাল আমলে বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও বৌদ্ধ ধর্মকে আশ্রয় করে দেশ-বিদেশের সাথে এ সময় যোগাযোগ বিস্তৃত হয়। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত আব্বাসীয় বাদশাহ হারুন আল রশীদের (৭৮৬-৮০৯ খ্রীঃ) মুদ্রা থেকে বাংলাদেশের সাথে পাল আমলে আরব বণিকদের বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়।[২২] ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেন যে, আট শতকের গোড়া থেকে ভারতের সমৃদ্ধ ব্যবসা-বাণিজ্যে আরব ও পারস্য বণিকদের একটা মোটা অংশীদারিত্ব ছিলো। পাল আমলে ভারতের রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র ক্রমশ উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতে সরে আসতে থাকে।[২৩] পাল আমলের বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যে বিপুল সাফল্যের কথা আরব ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকদের বিবরণী থেকেও জানা যায়।[২৪]

৫. সাংস্কৃতিক বিপর্যয় ও রাজনৈতিক পতন

পাল আমলে এ দেশের জনগণের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে স্বস্তি এবং অর্থনৈতিক জীবনে সমৃদ্ধি ফিরে আসে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা এ যুগেও অব্যাহত ছিলো। এ ষড়যন্ত্র চলেছে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ ধর্মের সাথে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির আদর্শিক সমন্বয়ের নামে। এ চতুর কৌশল অনেকাংশে সফল হয়েছিলো। বিশেষত পাল রাজত্বের অবক্ষয় যুগে ব্রাহ্মণ্যবাদী সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্র ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। পাল রাজত্বের পতনের জন্য তথাকথিত সমন্বয়ের আদর্শই অনেকাংশে দায়ী ছিলো।

---

১৮. ডকটর নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস, পৃঃ ১৭১।
১৯. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ঃ মুসলিম বাংলা-সাহিত্য, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬৮, পৃঃ ৮।
২০. ওয়াকিল আহমদ ঃ সুলতান আমলে বাংলা সাহিত্য, ১৯৬৭, ভূমিকা।
২১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১।
২২. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ঃ পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম।
২৩. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস, পৃঃ ৮৭-৮৮।
২৪. ডক্টর মুহাম্মদ যাকী ঃ এ্যারাব একাউন্টস অব ইন্ডিয়া, ইদারা-ই-আদাবিয়াত-ই দিল্লী, ২০০৯ কাসিমজান স্ট্রীট, দিল্লী।

www.nagorikpathagar.org

ডকটর নীহাররঞ্জন রায় জানাচ্ছেন ঃ 'পাল রাজাদের অনেকেই ব্রাহ্মণ্য রাজপরিবারের মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। ফলে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিলো। পালবংশের সবাই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য মূর্তি ও মন্দিরের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এই সবের জন্যেই তাঁরা ভূমি দান করতেন। তাঁদের ক্রীয়াকর্মে ও ধ্যানধারণায় ব্রাহ্মণ্য প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।[২৫] দশ শতক থেকে বৌদ্ধ ধর্মে পূজাচারের প্রভাব দেখা যায়।[২৬] পালপূর্ব যুগের বৌদ্ধমূর্তি বিশেষ পাওয়া যায়নি। নয় থেকে এগারো শতক পর্যন্ত এই তিনশ বছরের বহু বৌদ্ধ প্রতিমা পাওয়া যায়। এটা ছিলো বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে তথাকথিত মিল-সমন্বয়ের ফল। তবে এ যুগেও ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীর সংখ্যাই ছিলো বৌদ্ধ প্রতিমার চেয়ে বেশি।[২৭] আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সাথে বৌদ্ধ ধর্মের তথাকথিত সমন্বয় গড়ে উঠেছিলো আর্য ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি ও সংস্কৃতির ছাঁচে।[২৮]

পালপর্বে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর রূপকল্পনায় সমন্বয়ের ছাপ সম্পর্কে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন ঃ 'বৌদ্ধ দেবায়তনে যেমন ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীরা, তেমনি ব্রাহ্মণ্য দেবায়তনে বৌদ্ধ দেবদেবীরা স্থান পাচ্ছিলেন। এমনি করে বৌদ্ধ আয়তনে এসেছে ব্রাহ্মণ্য স্বরস্বতী, বিঘ্ননাটক প্রভৃতি; দুই আয়তনেই স্থান পেয়েছে চর্চিকা আর মহাকাল। যোগাসন, লোকেশ্বর-বিষ্ণু, ধ্যানী শিব আসলে ধ্যানী বুদ্ধেরই ছাঁচে গড়া। বৌদ্ধ তারাদেবী তো ব্রাহ্মণ্য দেবায়তনে কালী আর দুর্গারই নামান্তর। এই মিল-সমন্বয় সত্ত্বেও বৌদ্ধ ধর্ম ও তার দেবায়তন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কুক্ষিগত হয়ে পড়ছিল।... বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের বাহ্য ব্যবধান ঘুচে যাওয়ায় লোকের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকর্ষণ কমে এসেছিল।'[২৯]

মিল-সমন্বয়ের এই ভাবধারাকে সকল বৌদ্ধ একভাবে গ্রহণ করেননি। সহজযানী আদর্শে বিশ্বাসী বৌদ্ধগণ সমন্বয়ের নামে বৌদ্ধ ধর্ম বিলোপের এই ব্রাহ্মণ্য ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সহজযানে দেবদেবীর স্বীকৃতি ছিলো না। তারা তখনো পর্যন্ত মন্ত্র-মুদ্রা-পূজা এবং দেবদেবীর আরাধনা থেকে মুক্ত ছিলেন। তারা ব্রাহ্মণদের নিন্দা করতেন। যে সব বৌদ্ধ ব্রাহ্মণদের অনুকরণে মন্ত্রজপ, পূজার্চনা ইত্যাদি করতেন তাদেরও তারা কঠোর সমালোচনা করতেন।[৩০]

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন যে, পাল-চন্দ্র-কম্বোজ রাজারা বৌদ্ধ হলেও তাদের প্রত্যেকের সমাজাদর্শ হয়ে পড়েছিলো একান্তই ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও আদর্শের মতো। এমনকি বৌদ্ধ পাল রাষ্ট্রেও ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থা পুরোপুরি স্বীকৃত হয়েছিলো।

২৫. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস, পৃঃ ১৩৯-৪০
২৬. পূর্বোক্ত পৃঃ ১৪০।
২৭. পূর্বোক্ত পৃঃ ১৪৫।
২৮. পূর্বোক্ত পৃঃ ৯২।
২৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫১।
৩০. পূর্বোক্ত পৃঃ ১৪২।

www.nagorikpathagar.org

চন্দ্র ও কম্বোজ রাষ্ট্রেও একই ব্যাপার দেখা যায়। আর্য ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি ও সংস্কৃতির ছাঁদে উত্তর ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান ধারার সাথে পাল যুগের বাংলাদেশ যুক্ত হয়। গুপ্ত আমলে যার সূচনা, পাল আমলে তা পূর্ণতা নিয়ে দেখা দেয়।[৩১]

তথাকথিত এ সমন্বয় বৌদ্ধ ধর্ম ও রাষ্ট্রের জন্য বিপর্যয়ের কারণ হয়েছিলো। রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানা পাহাড়া দেয়ার পাশাপাশি জাতির সাংস্কৃতিক সীমানা হেফাজত করতে না পারলে সে জাতির ভবিষ্যত পরিণতি কত মারাত্মক হতে পারে, তার প্রমাণ পাল শাসকগণ রেখে গেছেন। পালদের অনেক পরে মোগল সম্রাট আকবর তথাকথিত ধর্মীয় সমন্বয়ের মেলবন্ধনের নামে ধর্ম ও সংস্কৃতিতে এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ি সৃষ্টি করেছিলেন। ইসলামের ধর্মীয় মৌলিক অনুশাসনসমূহ অবিকৃত অবস্থায় লিপিবদ্ধ থাকায় মুসলমানগণ আকবরসৃষ্ট সেই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু পাল শাসকদের সৃষ্ট পরিস্থিতি মুকাবিলার সহায়ক কোন লিখিত অনুশাসন বৌদ্ধদের ছিলো না। ফলে ব্রাহ্মণ্য সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মুখে বৌদ্ধ ধর্ম তার শেষ আশ্রয়কেন্দ্রে অল্পকালের মধ্যেই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলো।

৩১. পূর্বোক্ত পৃঃ ৯২।

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ অধ্যায়

সেন-বর্মন শোষণ ঃ দ্বিতীয় প্রতিরোধ সংগ্রাম

১. আগন্তুক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা

পাল শাসকরা দুর্বল হয়ে পড়ার সাথে সাথে দেশের নানা জায়গায় ছোট ছোট স্থানীয় কর্তৃত্ব মাথাচাড়া দেয়। সে সুযোগে দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট বা কনৌজ থেকে চালুক্য হামলাকারীরা এ দেশে আসে। তাদের সাথিরূপে সেনরাও বাংলায় পাড়ি জমায়। সেনদের বাংলায় আগমন ঠিক কখন কেমন করে ঘটেছিলো, তা বলা মুশকিল। বাংলায় আগমনকালে সেনদের কোন গুরুত্বই ছিলো না। গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনার মধ্য দিয়ে সেনরা তাদের আগমনকে চিহ্নিতও করতে পারেনি।

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেন যে, পাল রাজাদের সেনাদলে অনেক ভিন্-প্রদেশী লোক নিযুক্ত হতো। অনুরূপ কোন ভিন্-প্রদেশী সেন বংশীয় রাজ-কর্মচারী হয়তো ক্রমে ক্ষমতাশালী হয়ে নিজেকে সামন্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে তিনিই পালবংশের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন। কর্ণাট থেকে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে যেসব সমরাভিযান চলেছিলো, সে সূত্রে এই কর্ণাটি সেন পরিবারের এ দেশে আসা অসম্ভব নয়।[১] সেন পরিবারের পূর্বপুরুষেরা আগে ছিলেন ব্রাহ্মণ; পরে ব্রাহ্মণদের আচার, সংস্কার ও জীবিকা ছেড়ে ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ 'সেনবংশীয় রাজগণের পূর্ব্বপুরুষ কোন্ সময়ে বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। তাঁহাদিগের তাম্রশাসন ও শিলালিপিসমূহে সর্ব্বপ্রথম সামন্তসেনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।'[২] এসব শিলালিপিতে দেখা যায় সেনরা ছিল কর্ণাটদেশ থেকে আগত চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়।[৩] সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেন দ্বিতীয় মহিপালের রাজত্বকালে সামন্ত-বিদ্রোহ ও ভ্রাতৃবিরোধের সুযোগ নিয়ে বারো শতকের শুরুতে পশ্চিম বংগের একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল দখল করে স্থানীয় সামন্তরূপে জাঁকিয়ে বসেন। পালবংশের শেষ রাজা রামপালের মৃত্যুর পর পালরাজ্যে গোলযোগ দেখা দেয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভগ্নদশার এই সুযোগ নিয়ে হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন (মৃত্যু ১১৫৮) এখানে প্রভুত্ব কায়েমের চেষ্টা

১. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, সংক্ষেপিত, পৃঃ ৯৩-৯৪।
২. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫১
৩. পূর্বোক্ত।

www.nagorikpathagar.org

করেন।

বিজয়সেনকে সেনবংশের প্রথম রাজা হিসাবে উল্লেখ করে রাখাল দাস লিখেছেন : 'অনুমান হয় যে, বিজয় সেন প্রথমে রাঢ় দেশের অংশবিশেষের এবং পরে সমগ্র রাঢ় দেশের অধিপতি হইয়াছিলেন। উৎকল-রাজ অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ যখন গৌড়-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন তখন বিজয়সেন বোধ হয় পালবংশীয় গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে বোধ হয় সমগ্র উত্তররাঢ়া ও দক্ষিণরাঢ়া তাঁহার করতলগত হইয়াছিল। বিজয়সেনই বোধ হয় পূর্ব্ববঙ্গে বর্ম্মবংশীয় ভোজবর্ম্মা অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারীর অধিকার লোপ করিয়াছিলেন। ... রাঢ় ও বঙ্গ অধিকৃত হইলে বিজয়সেন পাল-সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। ...মদনপালের অষ্টম রাজ্যাঙ্কের পর বোধ হয় সমগ্র বরেন্দ্রভূমি বিজয়সেনের করতলগত হইয়াছিল।'[৪] সম্ভবতঃ এভাবেই বাংলার বিরাট এলাকা এই কনৌজবংশীয় হামলাকারীদের করতলগত হয়।

অক্ষয়কুমার মৈত্র সেনদেরকে 'আগন্তুক' আখ্যায়িত করে লিখেছেন ঃ 'পাল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন সময়ে সেন রাজাগণ যে কোন না কোন উপায়ে পাল রাজগণের শিথিল মুষ্টি হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়া গৌড়মন্ডলে একটি অগন্তুক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা সাধনে সফল হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।'[৫]

২. আমলাতন্ত্রের বিস্তার ও বর্ণাশ্রমের শক্ত গিরো

বিজয়সেন পশ্চিম বংগের বিজয়পুরে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। পূর্ব বাংলার বিক্রমপুরে স্থাপিত হয় তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী। বিজয়সেনের পর তাঁর পুত্র বল্লালসেন রাজত্ব করেন। তাঁর শাসনকাল ছিলো ১১৫৮ থেকে ১১৭৯ খ্রীস্টাব্দ।[৬] বিজয়সেন ও বল্লালসেন ছিলেন শৈবধর্মী। পালপূর্ব যুগের শৈবধর্মী শাসক শশাংকের পর এ সময় বাংলায় আবার ব্রাহ্মণ্য ধারার শাসন কায়েম হয়। এই দুই সেন রাজা এ দেশে ব্রাহ্মণ্য ধারার কুলীনপ্রথাভিত্তিক বর্ণবাদী সমাজের ভিত রচনায় যত্নবান ছিলেন। এই উভয় রাজার আমলেই বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে নির্মূল অভিযান চলে। সে অভিযান আর্য-ব্রাহ্মণ্য সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্রের আবরণ ভেদ করে এ সময় প্রত্যক্ষ রূপ লাভ করে। বল্লালসেনের সময় বঙ্গ, রাঢ়, বরিন্দ, বাগড়ি (সুন্দরবন, মেদিনীপুর) ও মিথিলা সেনরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

বল্লালসেনের পর লক্ষণসেন (সন ১১৭৯-১২০৫ খ্রী) সিংহাসনে বসেন। বিজয়সেন ও বল্লালসেনের মতো লক্ষণসেন শৈবধর্মী ছিলেন না। তিনি ও তাঁর পরবর্তী

৪. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৩।
৫. অক্ষয়কুমার মৈত্র ঃ গৌড় রাজমালা, উপক্রমণিকা।
৬. রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ দি হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, পৃঃ ২১৬। (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম খণ্ডের ২৬১ পৃষ্ঠার টীকায় রমেশচন্দ্র মজুমদার সেন রাজাদের রাজ্যাভিষেকের তারিখ নির্ধারণ করেছেন ঃ বিজয়সেন ১০৯৫ খ্রীঃ, বল্লালসেন ১১৫৯ খ্রীঃ এবং লক্ষণসেন ১১৭৮ খ্রীঃ।)

www.nagorikpathagar.org

বংশধরগণ ছিলেন বৈষ্ণবধর্মী। লক্ষণসেন জনগণের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যবাদী সামাজিক নিপীড়নের ধারা অব্যাহত রাখেন।

পাল-পরবর্তী সেন ও বর্মন শাসকদের সম্পর্কে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন ঃ সেন-বর্মন রাজাদের আমলে আমলাতন্ত্র ফুলে-ফেঁপে ওঠে। রাজ পরিবারের জাঁকজমক বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রযন্ত্রের একাংশে ব্রাহ্মণ ও পুরোহিততন্ত্র জাঁকিয়ে বসে; গ্রাম থেকে পাড়া পর্যন্ত রাষ্ট্রযন্ত্রের বাহু বিস্তৃত হয়। আমলাতন্ত্রের বিস্তৃতি, রাষ্ট্রযন্ত্রের স্ফীতি ও সূক্ষ্মতর বিভাগের ভেতর দিয়ে রাষ্ট্রের বাহু সমাজকে সব দিক দিয়ে বেঁধে ফেলে। রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে জনসাধারণের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। এই আমলে সামন্তেরা যেমন প্রবল তেমনি সংখ্যায়ও ছিলো প্রচুর। মন্ত্রীরাও সংখ্যায় প্রচুর ছিলেন। নানা রাষ্ট্রকর্মে নিযুক্ত মন্ত্রীদের মধ্যে বৃহদুপরিক, মহাভোগপতি, মহাধর্মাধ্যক্ষ, মহা সেনাপতি, মহাগণস্থ, মহাসমুদ্রাধিকৃত, মহাসর্বাধিকরনিক, মহাবলাধিকরণিক, মহাবলাকোষ্ঠিক, মহাকরণাধ্যক্ষ, মহাপুরোহিত, মহাতন্ত্রাধিকৃত প্রভৃতি সংস্কৃত নামবহুল প্রধান প্রধান রাজপুরুষদের দেখা যায়। এই আমলে স্থানীয় জনসাধারণের সংগে রাষ্ট্রের যোগাযোগ একেবারে ধুয়ে-মুছে গিয়েছিলো। মহারাজাধিরাজের ক্ষমতা ছিলো সীমাহীন। তিনি শুধু দণ্ডমুণ্ডের সর্বময় কর্তা নন, শুধু শাসন, সমর ও বিচারের একচ্ছত্র অধিপতি নন, সমস্ত রকম দায় ও অধিকারের তিনিই ছিলেন উৎস।[৭]

জনগণের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনকে এ সময় কঠোর নিয়ন্ত্রণে বেঁধে ফেলা হয়। পাল-চন্দ্র আমলে ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-বিন্যাসের ক্ষেত্রে যেটুকু নমনীয়তা অবশিষ্ট ছিলো, সেন-বর্মন আমলে তা কঠিন ও অনমনীয় হয়ে ওঠে। এ প্রসংগে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন ঃ 'কম্বোজ সেন-বর্মন আমলে সেন-বর্মন রাষ্ট্রের সচেতন চেষ্টার ফলে সেই আদর্শ হল সুদৃঢ়, অনমনীয় ও সুনির্দিষ্ট। এইভাবে দেড়শ বছরে প্রায় হাজার বছরের বাংলাদেশকে ভেঙে নতুন করে ঢেলে সাজার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা হল। পাল বংশের জায়গায় এল সেন বংশ। চন্দ্র বংশের জায়গায় বর্মন বংশ। দু'টি বাংগালী রাজবংশের বদলে এল এমন দু'টি ভিন্ প্রদেশী রাজবংশ যারা অত্যন্ত নৈষ্ঠিক ও গোঁড়া ব্রাহ্মণ ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির ধারক ও পোষক। দেখতে দেখতে বাংলাদেশে যাগ-যজ্ঞের ধুম পড়ে গেল, নদ-নদীর ঘাটে ঘাটে শোনা গেল বিচিত্র পূণ্য-স্নানার্থীর মন্ত্র গুঞ্জরন, ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর পূজা, বিভিন্ন পৌরানিক ব্রতানুষ্ঠান দ্রুত বেড়ে গেল। বাঙালীর দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু, শ্রাদ্ধ, পারস্পরিক আহার-বিহার, বিভিন্ন বর্ণের নানা স্তর-উপস্তর বিভাগের সীমা-উপসীমা—এক কথায় সমস্ত রকম সমাজকর্মের রীতি-পদ্ধতি ব্রাহ্মণ্য নিয়ম অনুযায়ী বেঁধে দেওয়া হল। পাল আমলে শুধু অঙ্কুর দেখা গিয়েছিল; সেন-বর্মন রাষ্ট্রকে অবলম্বন করে ব্রাহ্মণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বাংলাদেশে ডালপালা ছড়াতে আরম্ভ করল।'[৮]

৭. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, সংক্ষেপিত, পৃঃ ৭৪-৭৫।
৮. পূর্বোক্ত পৃঃ ৫৬।

www.nagorikpathagar.org

৩. ছত্রিশ জাতের উৎপত্তি

নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেন ঃ 'কম্বোজ-বর্মন-সেন রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণেরা রাজ-পুরুষ হিসেবে দেখা দিচ্ছেন। রাষ্ট্রে তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমেই বাড়ছে। তাঁরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রচুর দাক্ষিণ্য লাভ করছেন, নানা উপলক্ষে দান গ্রহণ করে তাঁরা অগাধ জমির মালিক হয়ে বসছেন। এক বর্ণ, এক ধর্ম ও সমাজাদর্শের একাধিপত্যই সেন-বর্মন যুগের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। সে-বর্ণ ব্রাহ্মণ বর্ণ; সে-ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম; সে-সমাজাদর্শ পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সমাজের আদর্শ; সেই আদর্শই হল সমাজের মাপকাঠি। রাষ্ট্রের মাথায় রাজা, তার প্রধান খুঁটি ব্রাহ্মণেরা। কাজেই মূর্তিতে-মন্দিরে, রাজকীয় লিপিমালায়, স্মৃতিব্যবহারে ও ধর্মশাস্ত্রে সমস্ত রকম উপায়ে এই আদর্শ ও মাপকাঠির ঢাক পিটানো হতে লাগল। রাষ্ট্রের ইচ্ছায় ও নির্দেশে সর্বময় ব্রাহ্মণ্য একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হল।... ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক বর্ণ ব্যবস্থার মাথায় থাকলেন ব্রাহ্মণেরা। দ্বাদশ শতকেই জনপদ-বিভাগ অনুযায়ী ব্রাহ্মণদের দুটি স্পষ্ট ভাগ দেখা যায়–রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র। সেন-বর্মন আমলে বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণদেরও উদ্ভব। এই সব শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছাড়াও আরও দু'তিনশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের খবর এই যুগেই পাওয়া যায়। এঁরা হলেন দেবল বা শাকদ্বীপী এবং গণক বা গ্রহবিপ্র। ব্রাহ্মণ সমাজে এঁদের তেমন ইজ্জত ছিল না। গণক বা গ্রহবিপ্ররা 'পতিত' বলেই গণ্য হতেন। এঁদেরই একটি শাখা 'অগ্রদানী' নামে পরিচিত। এছাড়া ছিল নিম্নশ্রেণীর ভট্ট ব্রাহ্মণ– অন্য লোকের যশোগান করাই ছিল তাঁদের পেশা। শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা উত্তম সংকর পর্যায়ের ২০টি উপবর্ণ ছাড়া অন্য কারও পূজানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করতে পারতেন না, করলে যজমান বর্ণ বা উপবর্ণ হিসেবে গণ্য হতেন। এঁদের ছোঁয়া খেলে সৎব্রাহ্মণদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। এ ছাড়া অনেকগুলো বৃত্তিও ছিল তাঁদের নিষিদ্ধ; যেমন, চিকিৎসা ও জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা, চিত্র ও অন্যান্য বিভিন্ন শিল্পবিদ্যার চর্চা ইত্যাদি। কিন্তু কৃষিকাজে কিংবা যুদ্ধবৃত্তিতে আপত্তি ছিল না; মন্ত্রী, সান্ধিবিগ্রহিক ধর্মাধ্যক্ষ, সেনাধ্যক্ষ হলে কেউ পতিত হত না। অথচ বর্ণবিশেষের অধ্যাপনা বা পৌরোহিত্য খুবই দোষের ছিল। ব্রাহ্মণ ছাড়া বাংলাদেশের বাদবাকি আর সমস্ত বর্ণকেই সংকর শূদ্রবর্ণ হিসেবে ধরা হত। এদের তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করে ব্রাহ্মণেরা তাদের স্থান ও বৃত্তি বেঁধে দিয়েছিল। গোড়ায় এদের সংখ্যা ছিল ৩৬। তা থেকেই বাংলায় 'ছত্রিশ জাত' কথার উৎপত্তি। পরে এই সংখ্যা বেড়ে যায় এবং কয়েকটি কোমের নামও যুক্ত হয়।'[৯]

যারা উৎপাদনের সাথে যতো বেশি সম্পর্কিত, তাদের স্থান ছিলো সমাজে ততো নিচে– নিম্নবর্ণ স্তরে– কেউ কেউ একেবারে অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য পর্যায়ে।[১০] আর যারা যতো বেশি উৎপাদনবিমুখ, অন্যের শ্রমের উপর যতো বেশি নির্ভরশীল, যতো বেশি পরভোজী ও পরাশ্রয়ী, সমাজে সেই পরজীবীদের মর্যাদা ততো উপরে। ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-

৯. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, সংক্ষেপিত পৃঃ ৫৬-৫৭।
১০. পূর্বোক্ত পৃঃ ৫৮।

www.nagorikpathagar.org

বিন্যাসের এই ছিলো বৈশিষ্ট্য। এভাবে সেন-বর্মন শাসিত বাংলাদেশে একটি সর্বভুক পরগাছাশ্রেণীর স্বৈরাচার কায়েম হয়।

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন ঃ 'পাল-পর্বে এবং তার ঠিক আগে বাংলার সমস্ত রাজবংশই ছিল বৌদ্ধ; কিন্তু সেন-বর্মন-দেব বংশের রাজারা সবাই ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বিশ্বাসী। সেন-পর্বের এই দেড়শো বছরে বাংলাদেশ জুড়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই জয়জয়কার। জৈন ধর্মের কোন চিহ্ন নেই। বজ্রযানী-সহযানী-কালচক্রযানী বৌদ্ধেরা নিষ্প্রভ। বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি বিরল। বৌদ্ধ বিহার থাকলেও তাদের সেই অতীত গৌরব ও সমৃদ্ধি আর নেই। অন্যদিকে তেমনি এই যুগে বৈদিক যাগযজ্ঞে পৌরাণিক দেব-দেবী আর বিশেষ বিশেষ তিথিনক্ষত্রে স্নান-দান-ধ্যান ক্রিয়াকর্ম, মধ্যদেশ থেকে ব্রাহ্মণাভিযান, রাষ্ট্রে ও সমাজে ব্রাহ্মণাধিপত্য বেড়ে চলেছে।... বর্মন-বংশের রাজারা ছিলেন সবাই পরম বিষ্ণুভক্ত। এঁদের বংশ-বৃত্তান্তে বৈদিক ঔ পৌরাণিক নামের ছড়াছড়ি। সেন-রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সবিস্তারে ছড়িয়ে পড়ল; বাংলার স্মৃতি ও ব্যবহার-শাসন এই সময়কারই সৃষ্টি। দেববংশের রাজারাও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারে বিশ্বাসী; তাঁরা সবাই বিষ্ণু-ভক্ত। এই তিন রাজ-বংশের সচেতন চেষ্টাই ছিল বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে বাংলায় একচ্ছত্র মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা। তার জন্যে এই সব রাজবংশের রাজারা মধ্যদেশ থেকে ব্রাহ্মণদের আনিয়ে তাদের জমি দান করেছিলেন, ব্রাহ্মণ্য মতে যাগযজ্ঞ-স্নান-তর্পন-পূজো-আর্চার ব্যবস্থা করেছিলেন। উপনিষদের আশ্রম-তপোবন ছিল এ যুগের আদর্শ।... বেদের ব্যাপক চর্চা ছিল; বৈদিক যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্মের ব্যাপক প্রভাব ছিল। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা বৈদিক যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের রীতিপদ্ধতি জানতেন না বলে বাইরে থেকে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাবার একটা সচেতন চেষ্টা ছিল বলে মনে হয়। সেন-বর্মন আমলেই বাংলায় বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণের উদ্ভব দেখা যায়। এই পর্বেই বাংলার ব্রাহ্মণ্য জীবন সর্বভারতীয় শ্রুতি ও স্মৃতির বন্ধনে বাঁধা পড়ল।... এই সব সংস্কার দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার কাজে ব্রাহ্মণেরা সরাসরি রাষ্ট্রের সাহায্য পেয়েছিলেন।'[১১]

৪. সমাজ-জীবনে ভাঙা-গড়া

পাল শাসকদের আপোসকামী সমন্বয়-চিন্তার ফলে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের প্রচণ্ড দাপটে বৌদ্ধ দেবদেবীরা ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীদের সাথে মিলে-মিশে যাচ্ছিলো। ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীরা বৌদ্ধদের পূজা পাচ্ছিলো, তেমনি তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতেরও প্রভাব পড়ছিলো ব্রাহ্মণ্য পূজা-অনুষ্ঠানে। পাল আমলের ব্রাহ্মণেরা এই মিল-মিশালকে সাদরে গ্রহণ করেছিলো; কেননা এই সমন্বয়বাদ ছিলো ব্রাহ্মণ্য সাংস্কৃতিক আধিপত্য কায়েমের ষড়যন্ত্রেরই অংশ। সেন-বর্মন পর্বে তাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ষড়যন্ত্রের চোরাগলি থেকে বেরিয়ে এসে রাজপথ দখল করলো। এ যুগের ব্রাহ্মণ্য সমাজ তথাকথিত সমন্বয়ের আবরণ ছুঁড়ে ফেলে সমাজকে পুরোপুরি ব্রাহ্মণ্য ছাঁচে গড়ে

১১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৭-১৪৮।

www.nagorikpathagar.org

তোলার কাজে কোমর বেঁধে নামলো। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নির্দেশ অবলম্বনেই গড়ে উঠলো এ যুগের সকল স্মৃতি শাসন ও ব্যবহার গ্রন্থ। '... এই যুগের স্মৃতি শাসনই পরবর্তী বাংলার ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ভিত্তি।'[১২]

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায় ঃ 'এই যুগের প্রধান চেষ্টাই হল পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি-সংস্কৃতির আদর্শ অনুযায়ী বাংলার সমাজকে একেবারে নতুনভাবে ঢেলে সাজা। সেই চেষ্টার পিছনে ছিল রাষ্ট্র ও রাজবংশের পরিপূর্ণ সক্রিয় সমর্থন। উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীর লোকেরাও ছিল তার পোষক ও সমর্থক। এই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল বরেন্দ্রী ও রাঢ়দেশ এবং পরে বিক্রমপুর অঞ্চল। বিক্রমপুরে বৌদ্ধ সাধনা ও সংস্কৃতির একটি বড় ঘাঁটি থাকায়, সেখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি রাঢ়-বরেন্দ্রীর মত তেমন প্রবলপ্রতাপ হয়ে উঠতে পারেনি। আর ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধ সাধনার প্রভাব বহুদিন পর্যন্ত প্রবল ছিল। এইজন্যেই বোধ হয় মৈমনসিং-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম-শ্রীহট্ট অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য স্মৃতির শাসন আজও কিছুটা দুর্বল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে উত্তর-ভারতের চেয়ে দক্ষিণ-ভারত বরাবরই একটু বেশি রকমের গোঁড়া। কলিঙ্গ-কর্ণাট থেকে সেন ও বর্মনেরা সেই আদর্শ নিয়েই বাংলাদেশে এসেছিলেন। এই যুগে বাংলার সমাজ ও বাঙালী জাতিকে বর্ণ ও শ্রেণীর দিক থেকে খণ্ড খণ্ড করে ভেঙে নতুন করে গড়া হয়েছিল; এই গড়ার পেছনে মিলিয়ে মিশিয়ে দেবার কিংবা নিজের করে নেবার কোন আদর্শ সক্রিয় ছিল না। বাংলার রাষ্ট্র ও সমাজ এই যুগে ভেদবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন, স্তরে-উপস্তরে দুর্লংঘ প্রাচীরে বিভক্ত। রাজসভার চরিত্রবল ও আত্মশক্তির অভাব। ধর্ম ও সমাজ বিলাসব্যসনে মশগুল। শিল্প ও সাহিত্য বাস্তবতা হারিয়ে ফাঁকা উচ্ছ্বাস, অত্যুক্তি ও দেবসর্বস্বতায় ভরে উঠেছে। জনসাধারণের দেহমন বৌদ্ধ বজ্রযান-সহজযান প্রভৃতির এবং তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য-ডাকিনী-যোগিনীদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড ও তুক্-তাকে পঙ্গু। উচ্চতর বর্ণসমাজ ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বে আড়ষ্ট।'[১৩]

সেন-বর্মন পর্বে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের সকল প্রভাব মুছে ফেলার ব্যবস্থা নেয়া হয়। শত শত বছর ধরে বৌদ্ধ ধর্ম উত্তর ও পূর্ব বাংলায় প্রধান ধর্ম-বিশ্বাসরূপে স্বীকৃত ছিলো। সাড়ে তিনশো বছর ধরে বাংলাদেশ ছিলো ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান কেন্দ্র। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের যোগাযোগের ক্ষেত্রেও বৌদ্ধ ধর্ম দীর্ঘকাল পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। অথচ বারো ও তেরো শতকের ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন-বর্মন শাসনামলে এ ধর্ম ছিলো সব দিক থেকে রোষের শিকার। পাল আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি দেখানো হয়েছিলো উদারতা। কিন্তু সেন-বর্মন যুগের ব্রাহ্মণদের প্রতিদান ছিলো তার বিপরীত। সেন-বর্মনদের পক্ষপাতদুষ্ট ধর্মনীতির কারণে বৌদ্ধ ধর্ম বিপর্যয়ের শিকার হয়। বিহার, মহাবিহার এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রতিপত্তির বিলোপ ঘটে। নীহার রায়ের

১২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৬।
১৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৮।

www.nagorikpathagar.org

ভাষায় ঃ 'সেন-বর্মন রাজবংশ বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের প্রতি মোটেই শ্রদ্ধাপোষণ করতেন না; বরং তাঁদের বিরাগ ও ভর্ৎসনায় বৌদ্ধদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।'[১৪]

৫. দেশান্তরী বাংলা ভাষা

বারো শতকের সেন ও বর্মন রাজাদের আমলে বর্ণাশ্রম পাকাপোক্ত রূপ নিলো। বৈদিক শাস্ত্র-শাসন রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রধান নিয়ামক হয়ে দেখা দিলো। দেশের মানুষকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অধীন করার প্রক্রিয়া জোরদার হলো। আর্য-ব্রাহ্মণেরা বাংগালীর মুখের ভাষার বিরুদ্ধে দমনমূলক অভিযান এ সময় তীব্র করে তুললো। জনগণের মুখের ভাষার বিরুদ্ধে কঠোর ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা জারি করে তারা বললো, লোকজ ভাষায় অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ন-মহাভারত ইত্যাদি যে মানব শ্রবণ করবে, তার ঠাঁই হবে ভয়াবহ রৌরব নরকে। বাংগালীর মুখের ভাষাকে তারা অপবিত্র, ইতর ও পক্ষীর ভাষারূপে অভিহিত করলো। বাংগালীরা তাদের কাছে দস্যু, দাস, পক্ষী আর ইতর আখ্যা পেলো। বাংগালীদের ভাষা পরিত্যাজ্য গণ্য হলো।

'প্রাচীনতম বাংলা ভাষা'র রূপ সম্পর্কে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক লিখেছেন ঃ 'খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকে দণ্ডী যে ভাষাকে 'গৌড়ী প্রাকৃত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই 'মাগধী প্রাকৃত' বা প্রাচ্য-প্রাকৃতেরই প্রাচ্যতর রূপ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষাবিদ্‌গণ নিঃসন্দেহভাবেই প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, আধুনিক বাংলা-ভাষা 'মাগধী প্রাকৃত' তথা 'গৌড়ী-প্রাকৃতেরই' বিবর্তিত রূপ। ইহা যে সরাসরিভাবে সংস্কৃত হইতে উদ্ভুত নহে, বর্তমান বাংলা-ভাষাই তাহার প্রধান প্রমাণ। যে প্রাকৃত-ভাষা হইতে সংস্কৃত-ভাষার উদ্ভব এবং উর্দু, পাঞ্জাবী, সিন্ধী প্রভৃতি পাক-ভারত উপ-মহাদেশের উত্তর ও পশ্চিম এলাকাসমূহের যাবতীয় ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ, সেই প্রাকৃতের পূর্বীরূপ হইতেই বাংলা-ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ সাধিত হইয়াছে। বর্তমান বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের প্রত্যক্ষ প্রভাব যেমন অত্যন্ত নগণ্য, তেমনই অত্যন্ত আধুনিকও বটে।'[১৫]

নয় ও দশ শতকের জনগণের মুখের ভাষাকেই ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় 'প্রাচীনতম বাংলা ভাষা'রূপে উল্লেখ করেছেন। এ বাংলা ভাষাকে তিনি মাগধি অপভ্রংশের স্থানীয় গৌড়-বঙ্গীয় রূপ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'পাল-চন্দ্র পর্বে তান্ত্রিক ও বজ্রযানী বৌদ্ধ আচার্যেরা এক ধরনের যে প্রাকৃতধর্মী 'বৌদ্ধ-সংস্কৃতের' প্রচলন করেছিলেন, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে তারও ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে বিশুদ্ধ ব্যাকরণ সম্মত সংস্কৃত লেখা হতে থাকল।'[১৬] সবে মাত্র গড়ে উঠা বাংলা ভাষার প্রতি সেন-বর্মনশাসিত রাষ্ট্র কিংবা তাদের সমর্থনপুষ্ট সংস্কৃতভাষী বৈদিক ব্রাহ্মণেরা সামান্যতম দরদ বা দাক্ষিণ্য দেখায়নি।[১৭]

---

১৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫০।
১৫. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ঃ মুসলিম বাংলা-সাহিত্য, ১৯৬৮ পৃঃ ৭।
১৬, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, সংক্ষেপিত, পৃঃ ১৭২।
১৭, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭২।

www.nagorikpathagar.org

সে যুগের বাংলা ভাষার সাহিত্যকর্মীগণ ব্রাহ্মণ্য নিপীড়নের মুখে দেশের মাটি থেকে উৎখাত হয়েছিলেন। তাই সে ভাষার সামান্য কিছু নমুনাও এতোদিন আমাদের চোখের আড়াল হয়েছিলো।[১৮] সে আমলের বাংলা ভাষার নমুনা দীর্ঘদিন পর উদ্ধার করা হয়েছে দেশের বাইরে থেকে। দশ থেকে বারো শতকের মধ্যে রচিত চর্যাপদগুলিতে সে আমলের ব্রাহ্মণ্য নিপীড়ন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপাল থেকে চর্যাপদ নামে পরিচিত প্রাচীনতম বাংলা ভাষার চারটি পুঁথি সংগ্রহ করে আনেন। বাংলা সাহিত্যের এই প্রাচীন নিদর্শনগুলি বাংলার বাইরে নেপালে আশ্রয় পেয়েছিলো। জনগণের মুখের ভাষার বিরুদ্ধে বহিরাগত ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকদের অভিযান এ ভাষার সাহিত্যকে দেশান্তরী করেছিলো। চর্যাপদ বা চর্যাগীতি নামে পরিচিত এ সব পুঁথিতেই প্রাচীনতম বাংলা ভাষার নমুনা পাওয়া যায়।

নীহার রায়ের মতে ঃ এ সব পুঁথির বাগভঙ্গি ও ব্যাকরণরীতি পুরোপুরি বাংলা; বাংলা ভাষায় তা স্বীকৃত ও প্রচলিত। 'এর মধ্যে এমন অনেক প্রবাদ আছে যা আজো লোক মুখে শুনতে পাওয়া যায়। তাছাড়া বাংলাদেশের নদনদী, নৌকোর নানা উপমা এইসব গানের মধ্যে ছড়ানো। চর্যাগীতির কবিরা সবাই সিদ্ধাচার্য এবং সবাই প্রায় বাঙালী। গীতগুলি লেখা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে; পংক্তির শেষে মিল। চর্যাগীতির ছন্দ থেকেই বাংলা পয়ার বা লাচাড়ী এসেছে। যদিও বৌদ্ধ সহজ-সাধনার গুঢ় রহস্য ফুটিয়ে তোলবার জন্যেই গানগুলি লেখা হয়েছিল, তা সত্ত্বেও এর মধ্যে এমন বহু পদ আছে যা ধ্বনি, ব্যঞ্জনা ও চিত্র গৌরবের দিক থেকে অসামান্য।'[১৯]

সেন-বর্মন আমলের ব্রাহ্মণ্যবাদী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মুখে বাংলা ভাষার চরম দুর্গতির বিবরণ দিয়ে অধ্যাপক দেবেন্দ্রকুমার ঘোষ লিখেছেন ঃ 'পাল বংশের পরে এতদ্দেশে সেন বংশের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের চিন্তা অতিশয় ব্যাপক হইয়া ওঠে ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রবাহ বিশুষ্ক হইয়া পড়ে। সেন বংশের রাজারা সবাই ব্রাহ্মণ্যধর্মী, তাহাদের রাজত্বকালে বহু ব্রাহ্মণ বংগদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করে ও অধিকাংশ প্রজাবৃন্দ তাহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এভাবে রাজা ও রাষ্ট্র উভয়ই বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিরূপ হইলে বাংলার বৌদ্ধরা স্বদেশ ছাড়িয়া নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি পার্বত্য প্রদেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। বাঙ্গালার বৌদ্ধ সাধক কবিদের দ্বারা সদ্যোজাত বাঙ্গালা ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলিও তাঁহাদের সঙ্গে বাঙ্গালার বাহিরে চলিয়া যায়। তাই আদি যুগের বাঙ্গালা গ্রন্থ নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য।'[২০]

সেন-বর্মন আমলের 'গণ বিচ্ছিন্ন সস্কৃত সাহিত্যের জোয়ার' এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের রূপ তুলে ধরে ডকটর নীহার রায় লিখেছেন ঃ 'এই পর্বে এসে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির ভোল একেবারে বদলাতে শুরু করে। বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান, বৌদ্ধ

১৮. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, সংক্ষেপিত, পৃঃ ১৭২।
১৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭২, ১৭৩।
২০. অধ্যাপক শ্রীদেবেন্দ্রকুমার ঘোষ ঃ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস, পৃঃ ৯-১০।

www.nagorikpathagar.org

ধর্ম, আর জীবনাদর্শকে কোনঠাসা করে রাস্তা জুড়ে এসে দাঁড়াল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, ব্রাহ্মণ্য ধ্যান-ধারণা। পালপর্বের শেষের দিকেই তার পদধ্বনী শোনা যাচ্ছিল, সেন-বর্মন পর্বে তার প্রবল প্রতাপ চোখে পড়ল। বৌদ্ধ সংঘ-বিহার, অবৈদিক-অপৌরাণিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার চর্চা দেশ থেকে একেবারে উঠে গেল এমন নয়– টিম্ টিম্ করে ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে বেঁচে থাকল। ঠিক একই দশা হল প্রাকৃতধর্মী 'বৌদ্ধ সংস্কৃতে'র, প্রাচীনতম উঠতি বাংলা ভাষার আর শৌরসেনী অপভ্রংশের গৌড়-বঙ্গীয় স্থানীয় চেহারার।'[২১]

নীহাররঞ্জন রায় এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন ঃ 'ইসলাম-প্রভাবে প্রভাবান্বিত কিছু লোক বোধ হয় বাংলার কোথাও কোথাও সেই প্রাকৃতধর্মী বৌদ্ধ সংস্কৃতের ধারা অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন; সেক-শুভোদয়া গ্রন্থের ভাষায় তার কিছুটা আভাষ পাওয়া যায়।'[২২]

বাংগালীর জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্যকে প্রায় উৎখাত করে সেখানে চালু হলো ব্রাহ্মণ্য জ্যোতিষ শাস্ত্র, মীমাংসা শাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতি শাস্ত্র। যা কখনোই বাংগালীর নয়, এবং কখনোই বাংগালীর ছিলো না। এ দেশের মানুষের আশা-আকাংখা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিরোধী, তাদের বোধ-বিশ্বাস ও অগ্রগতির পরিপন্থী, সংস্কার-আচ্ছন্ন একটি ব্যবস্থা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হলো। এ প্রসঙ্গে নীহার রায় লিখেছেন ঃ 'হরিবর্মা, বল্লালসেন, লক্ষণসেন এই তিন রাজার আমলেই এ পর্বের যত কিছু গ্রন্থ রচনা। সমস্ত গ্রন্থই প্রায় জ্যোতিষ-মীমাংসা-ধর্মশাস্ত্র-স্মৃতিশাস্ত্র নিয়ে লেখা এবং সেই সঙ্গে কিছু আছে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যে ভরপুর মামুলী রীতিতে লেখা কাব্য-নাটক। ব্যাকরণে, ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে, বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের আলোচনায়, তান্ত্রিক-দর্শনে, বাঙালীর নিজস্ব নতুন সাহিত্যরীতির প্রবর্তন ও প্রচলনে এতদিন সারা ভারতবর্ষে যে বাংলাদেশের এত নাম ছিল, সেন-বর্মন আমলে সেদিকে তেমন কোন চেষ্টা দেখা গেল না।'[২৩]

৬. ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতির চেহারা

ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতির বিচারে সেন-বর্মন আমল ছিলো বাংগালীর ইতিহাসে চরম দুর্ভাগ্যের যুগ। বৌদ্ধ ধর্ম ও তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যকে অবলম্বন করে দেশ-বিদেশের সাথে বাংলাদেশের যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, সেন-বর্মন আমলে সে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। তখনকার বাংলাদেশ 'একেবারে নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিল'।[২৪] সেন-বর্মন শাসন বাংলাদেশের সব রূপ-রস-সৌন্দর্য ও আকর্ষণ হরণ করলো। জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-সংস্কৃতি-অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাংলার সমৃদ্ধি সেন-বর্মন

২১. ডকটর নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃঃ ১৭৬।
২২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭২।
২৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৬।
২৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০০।

www.nagorikpathagar.org

শাসনামলে লুপ্ত। এ যুগে বাংলার জনজীবন সকল দিক থেকেই অন্ধকারাচ্ছন্ন। নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন ঃ নানা দিক থেকে বিড়ম্বিত 'সে সমাজ জীবনে গণৎকার এসে জাঁকিয়ে বসল; বাঙালী সমাজকে স্তর-উপস্তরে টুকরো টুকরো করে ভেঙে আরও ভাল করে স্মৃতি-শাসন দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা হল। বামুন-পুরুতেরা হল সমাজের সর্বেসর্বা। ডাণ্ডাবেড়ি পরিয়ে সমাজকে রক্ষণশীলতার গর্তে ঠেলে ফেলা হল।'[২৫]

নীহাররঞ্জন রায় আরো উল্লেখ করেন ঃ সেন আমলে 'রাষ্ট্রের সামাজিক দৃষ্টি যত সংকীর্ণ হয়েছে, আমলাতন্ত্রের তত বিস্তার হয়েছে। রাজার সর্বময় কর্তৃত্ব বেড়েছে। রাষ্ট্রযন্ত্রে ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা আসর জাঁকিয়ে বসেছে; শিল্পী, বণিক, ব্যবসায়ীরা সেন-আমলে সমাজের নিচের স্তরে নেমে গেছে।'[২৬] এ অবস্থায় দেশের সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্ভোগ ছিলো অন্তহীন। তাদের এ দুর্ভোগের বিনিময়ে মুষ্টিমেয় সংখ্যক ব্রাহ্মণের কাছে সমাজের সকল সম্পদ জমা হচ্ছিলো। সেন-রাজারা বহু ব্রাহ্মণকে গ্রামের পর গ্রাম দান করছিলেন। সেন আমলের তাম্র শাসনগুলির অনেকাংশই 'শ্রী শ্রী শর্মা'রূপী ব্রাহ্মণদেরকে গ্রামের পর গ্রাম নিষ্কর হস্তান্তরের দলিল। এই ব্রাহ্মণেরা নিষ্কর জমি ভোগ করতো, অথচ সদ্যপ্রাপ্ত এই জমিদারিতে তারা প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করতো কড়ায়-গণ্ডায়। ব্রাহ্মণেরা রাজার কাছ থেকে ব্রাহ্মণ্য-দান রূপে জমি লাভ করছিলো, নিজেরা কিনেও বহু জমির মালিক হয়েছিলো।

বাংগালী জনগণকে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তর অথবা নির্মূল করা ছিলো ব্রাহ্মণদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে সেন-বর্মন আমলে বিরামহীন অভিযান চলে। বৌদ্ধদের ওপর কঠোর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা হয়। ব্রাহ্মণদের চাপের মুখে হিন্দুত্ববরণ করেও বৌদ্ধরা এই বর্ণবাদী নিপীড়ন থেকে রেহাই পায়নি। কৌলিন্য প্রথার নামে সমাজে উঁচু-নিচু ভেদরেখা টানার ফলে বৌদ্ধদের সাথে নবদীক্ষিপ্ত এই 'হিন্দু'দের নিগ্রহও চরমে পৌছে।

ডক্টর ইশতিয়াক হোসাইন কেরায়শী পুনিয়া নামক একজন সমসাময়িক লেখকের বিবরণীর উল্লেখ করেছেন। বৌদ্ধদের উপর সেন শাসক ও তাদের ব্রাহ্মণ অমাত্যদের বিপুল কর আরোপ ও কঠোর জবরদস্তি প্রয়োগের বিষয় তাতে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৭]

সেন শাসনে দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক দুরবস্থা চরমে পৌছেছিলো; তার কিছু বিবরণ চর্যাপদগুলিতে পাওয়া যায়। একটি গীতিতে বলা হয়েছে ঃ 'টিলাতে আমার ঘর, পাড়াপড়শী নেই। হাড়িতে ভাত নেই; সারাদিন ক্ষুধায় ধুঁকছি।' অন্যত্র বলা হচ্ছে ঃ 'শিশুরা ক্ষুধার্ত, তাদের দেহ কঙ্কালসার, বন্ধুবান্ধবেরা বিমুখ, পুরনো ফুটোফাটা পাত্রে সামান্যই জল ধরে–এসবও আমায় তেমন কষ্ট দেয়নি, যেমন কষ্ট

২৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০০।
২৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৮।
২৭. ডক্টর ইশতিয়াক হোসাইন কোরাইশী ঃ আসপেক্টস অব হিস্ট্রি, কালচার এন্ড রিলিজিয়নস অব পাকিস্তান, ব্যাংকক, থাইল্যান্ড, ১৯৬৩।

www.nagorikpathagar.org

দিয়েছিল যখন দেখেছিলাম গৃহিনী ছেঁড়া কাপড় সেলাই করার জন্যে রাগী প্রতিবেশিনীর কাছ থেকে ছুঁচ চাইছেন।' আরও নির্মম, আরও নিষ্করুণ চিত্র আছে ঃ 'পরনে তার ছেঁড়া কাপড়, বিষণ্ন শীর্ণ দেহ। ক্ষুধায় শিশুদের চোখ গর্তে-ঢোকা, পেট-পিঠ এক হয়ে গেছে; তারা খাবে বলে কাঁদছে। দীন দুস্থ ঘরের বৌ চোখের জলে বুক ভাসিয়ে প্রার্থনা করছেন, এক মুঠো চালে যেনো একশ দিন চলে।' অন্য একটি শ্লোকে ঘরের বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ 'কাঠের খুঁটি নড়ছে, মাটির দেয়াল গলে পড়ছে, চালের খড় উড়ে যাচ্ছে; কেঁচোর সন্ধানে আসা ব্যাঙেরা আমার ভাঙা ঘর ছেয়ে ফেলেছে।'[২৮] এ অবস্থায় সেন-শাসকরা ছিলো নির্বিকার। নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন ঃ 'সাধারণ মানুষের এই দুঃখদৈন্য নিয়ে রাষ্ট্র এতটুকু মাথা ঘামাতো বলে মনে হয় না।'[২৯]

ব্রাহ্মণদের জুলুম নিপীড়নের একটি চিত্র পাওয়া যায় মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে। তিনি লিখেছেন ঃ 'বাংলায় সেন বংশীয় রাজাদের রাজত্বকালে কনৌজ দেশীয় ব্রাহ্মণেরা এদেশে আগমন করেন। ইহাদের প্রভাবের ফলে বাংলার উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা এখানকার সাধারণ শ্রেণীর লোক হইতে সম্পূর্ণভাবে আলাদা হইয়া যায়। যে অন্যায় ও উৎপীড়নের ফলে ভারত হইতে বৌদ্ধ ধর্মের নাম নিশানা মুছিয়া যায়, এই উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের প্রভাবে সেন রাজাদের যুগে তাহা চরম আকার ধারণ করে। এই সময়কার বৌদ্ধগণ নাথ মতবাদের ছদ্ম আবরণে নিজেদের আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে বুদ্ধকে 'ধর্ম-ঠাকুর' এই হিন্দু নামে আখ্যায়িত করিতে শুরু করেন। তাঁহাদের আসল নাম ত্যাগ করিয়া তাঁহারা নিজদিগকে 'সদ্ধর্মী' নামে পরিচিত করেন এবং হিন্দুদের নাম দেন 'পাষণ্ডী'। শুন্য পুরাণে এইরূপ লেখা হইয়াছে যে, বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সদ্ধর্মীদের নিকট তাহাদের সামর্থ্যের অধিক অর্থ দাবী করিয়া তাহাদের ঘর-বাড়ী পেড়াইয়া দিয়া এবং নানাভাবে তাহাদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন চালাইয়া এ দেশে তাহাদের জীবন বিপন্ন করিয়া তোলে।'[৩০]

৭. বৌদ্ধ-সভ্যতার বিলুপ্তি

ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকদের বৌদ্ধবিরোধী অভিযানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিশ্বেশ্বর চৌধুরী লিখেছেন ঃ 'ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বৌদ্ধ ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিল্প ধ্বংসের জন্য এরূপ নির্মম সর্বাত্মক অভিযান শুরু করেছিল কেন? প্রশ্নটির স্বরূপ নির্ধারণ করতে হলে সর্ব প্রথম ব্রাহ্মণ্যবাদ কি এবং এর ধারক ও বাহক কারা এর রূপরেখা বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ্যবাদ আর্য ধর্ম। আর্যরা বহিরাগত। কাজেই ব্রাহ্মণ্যবাদকে ভারতীয় ধর্ম বলা চলে না। তারপর বর্ণাশ্রমই ব্রাহ্মণ্যবাদের মূল সূত্র। আর্যদের অভিযানকালে এ দেশ জনশূন্য ছিল না। যে মানুষগুলি ছিল তারাই মহেঞ্জোদারো,

২৮. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, সংক্ষেপিত, পৃঃ ৭৬।
২৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৬।
৩০. মোহাম্মদ আকরম খাঁ ঃ মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পৃঃ ৮২।

www.nagorikpathagar.org

হরাপ্পা, কোটদিজি ইত্যাদি নগরীর নির্মাতা ও অধিবাসী ছিল। অনার্য বলে আখ্যায়িতদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেই আর্যরা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এ প্রেক্ষিতে বিচার করলে অবশ্যই স্বীকার্য্য হয়ে ওঠে যে, বর্ণাশ্রমই সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশিকবাদের আদি ও অকৃত্রিম রূপ।... ব্রাহ্মণ্যবাদীর দল দেশের মধ্যে উপনিবেশ ও ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ বলবৎ রাখে। ধন উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে লাভের সিংহভাগ ভোগ দখলের কায়েমী স্বার্থ সৃষ্টি ও তা অব্যাহত রাখাই এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।... হোম, যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদি আড়ম্বর-সর্বস্ব মিথ্যা আচার-অনুষ্ঠানের ধুম্রজাল সৃষ্টি করে জনমানসকে সম্মোহিতের বিভ্রান্তিতে তলিয়ে দিয়ে শ্রেণীস্বার্থকে নিরঙ্কুশ রাখা হত। অসংখ্য দেবদেবী পরিকল্পনার মাধ্যমে দেবস্থান, পীঠস্থান, জাগ্রত বিগ্রহ ইত্যাদি নামকরণ এবং 'সোমনাথের' ন্যায় কৃত্রিমভাবে অলৌকিকতা সৃষ্টি করে ধর্মের নামে বিপুল অর্থাগমনের সহজ সুব্যবস্থা পরিচালিত হত। শ্রেণী-স্বার্থকে নিরঙ্কুশ রাখার এ সব ব্যবস্থা ছাড়াও দেব-ভাষা সৃষ্টি করে তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের মানুষগুলির শিক্ষালাভ ও জ্ঞানানুশীলনের পথ রুদ্ধ রাখা হয়েছিল। তথাকথিত জ্ঞানের খনি স্বরূপ বেদ নিম্নবর্ণের মানুষদের পাঠ্যাভ্যাস দূরের কথা শ্রবণ করলেই কানে তপ্ত সীসা ঢেলে দেওয়ার বিধান অক্ষরে অক্ষরে পালিত হত। নিত্য নতুন দেবদেবী পরিকল্পিত ও তাদের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হলেও নিম্নবর্ণের নরনারীর সে সব মন্দিরে প্রবেশাধিকার ছিল না। ... দেবালয়ে যৌবন মদমত্তা দেবদাসীর যৌনোচ্ছাস ছাড়াও মন্দিরের বহির্গাত্রে চিত্রকলার নামে নর-নারীর রতি সম্ভোগের বহু ক্রিয়াকৌশল উৎকীর্ণ থাকত।... এর অশ্লীলতা এরূপ বীভৎস যে, বৃটিশ সরকার এ সব মন্দিরের আলোকচিত্র গ্রহণ নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।... উল্লেখিত যাবতীয় বিষয়গুলি ব্রাহ্মণ্যবাদরূপ অকটোপাশের (পুরুভূজ) শোষণ বাহুমুখ হলেও এর অধিকর্তারূপে সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল ব্রাহ্মণের; তারাই দাবী করতেন পরম-পিতা পরমেশ্বর ও মানুষের মধ্যকার বাহন–সংযোগ রক্ষাকারী একমাত্র দালাল। (Sole agent between man and god).'[৩১]

'বর্ণাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যবাদী দলের নির্মম খড়গাঘাতেই যে ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের মৃত্যু ঘটেছিল' এটিকে সর্বজন স্বীকৃত সত্য বলে উল্লেখ করে বিশ্বেশ্বর চৌধুরী লিখেছেন ঃ 'ভারতের বুকে দাঁড়িয়ে একবার চার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, ভারতের প্রায় চতুর্দিক বৌদ্ধ রাষ্ট্র পরিবেষ্টিত। ভারতের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র নেপাল, ভূটান, সিকিম, তিব্বত, চীন, ব্রহ্মদেশ, সিংহল একান্তভাবেই বৌদ্ধ রাষ্ট্র। এ ছাড়া থাইল্যান্ড, ল্যাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েৎনাম ইত্যাদি দেশ–এক কথায় সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বৌদ্ধ রাষ্ট্র। যবদ্বীপ-সুমাত্রা-বালি অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়া ও জাপান বৌদ্ধ প্রভাবাধীন দেশ। ইহা দ্বারা কি প্রমাণিত হয়? এবং এরূপ একটা অতি বিস্ময়কর অবস্থা সৃষ্টির তাৎপর্যই বা কি?... মগধের বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের ধর্মদূতগণের অভূতপূর্ব প্রচারাভিযানের ফলে

৩১. বিশ্বেশ্বর চৌধুরী ঃ টেকনাফ থেকে খাইবার, পৃঃ ২৩-২৫।

www.nagorikpathagar.org

সমগ্র এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম দৃঢ়মূল শিকড় বিস্তার করেছিল।... (আজ) গৌতমবুদ্ধের সেই অমর নির্বাণবাণী তাঁর জন্মভূমিতে স্তব্ধ...। ভারতের মাটি ও আবহাওয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতা মৌসুমী ফুলের মতই অবলুপ্ত হয়নি। এই পতন ও অবলুপ্তি অবশ্যই স্বাভাবিক ঘটনা নয়–সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। ভারত ভূমিতে বৌদ্ধ ধর্ম ও সমাজের মৃত্যু বা অবলুপ্তি এর আয়ুষ্কালের স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি নয়–এটা কঠোর হস্তের একটা নির্মম হত্যাকাণ্ড...।... আমি শুধু বৌদ্ধ স্তূপ, মঠ, বিহার ও বুদ্ধমূর্তির ধ্বংসস্তূপগুলির প্রতি অংগুলি সংকেত দ্বারা উল্লেখ করব যে, ঐ সকল ধ্বংসস্তূপই বৌদ্ধ ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা, শিল্প ও সংস্কৃতি গঠনের সাধনা ও সিদ্ধি এবং বিরুদ্ধশক্তি কিরূপ নির্মম হস্তে সেসব ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে সমাহিত করেছে, তারই জ্বলন্ত প্রমাণ–জীবন্ত স্বাক্ষর।'[৩২]

বাংলায় বৌদ্ধ নির্মূল অভিযানের ব্যাপ্তি সম্পর্কে 'ডিসকভারিজ অব লিভিং বুদ্ধইজম ইন বেঙ্গল' গ্রন্থের বরাত দিয়ে ডকটর দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন ঃ 'যে জনপদে (পূর্ববঙ্গ) এক কোটির অধিক বৌদ্ধ এবং ১১৫০০ ভিক্ষু বাস করিত, সেখানে একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থ ত্রিশ বৎসরের চেষ্টায় পাওয়া যায় নাই। যে পূর্ব-ভারত বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান লীলাক্ষেত্র ছিল তথায় বৌদ্ধ ধর্মের যে অস্তিত্ব ছিল, তাহাও য়ুরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিক চেষ্টায় অধুনা আবিষ্কৃত হইতেছে।'[৩৩]

৮. মুক্তি সংগ্রামে নতুন ধারার সূচনা

সেন-বর্মন যুগের ব্রাহ্মণ্যবাদী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিপীড়ন এবং অর্থনৈতিক শোষণে বাংগালী জন-জীবন যখন বিপন্ন, সে সময় মজলুমের পক্ষের শক্তি হিসাবে ইসলাম প্রচারকগণ তাদের পাশে এসে দাঁড়ান। শশাংক ও হর্ষবর্ধনের সময় থেকেই এ দেশে ইসলাম প্রচারের ধারা শুরু হয়েছিলা।[৩৪] বাংলায় মাৎসান্যায় যুগের ঘোর অন্ধকার ভেদ করে ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ইনসাফের বাণী তখন উচ্চারিত হচ্ছিলো দেশের নানা জায়গায়। বাংলায় ব্রাহ্মণ্য নির্যাতনের প্রবল ঝড়ের সময়টিতে ইসলাম প্রচারকদের নেতৃত্বে বাংগালীর মুক্তি সংগ্রামের একটি নতুন ধারাও ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। ইসলাম প্রচারকগণ অত্যাচারিত জনগণের পক্ষের শক্তি হয়ে রুখে দাঁড়াচ্ছিলেন। দশ ও এগারো শতক থেকে ইসলামের মুক্তিমন্ত্র গুঞ্জরিত হচ্ছিলো গৌড় থেকে চট্টগ্রাম এবং সিলেট থেকে মঙ্গলকোট পর্যন্ত। সারা বাংলার গ্রামে-গঞ্জে, নগরে-বন্দরে সর্বত্র সে মুক্তির বাণী ছড়িয়ে পড়ছিলো। ব্রাহ্মণ্যবাদ মানুষে মানুষে যে কৃত্রিম বৈষম্য সৃষ্টি করেছিলো, ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী ছিলো তার বিরুদ্ধে এক

৩২. বিশ্বেশ্বর চৌধুরী ঃ টেকনাফ থেকে খাইবার, পৃঃ ১৯-২১।
৩৩. ডকটর দীনেশচন্দ্র সেন ঃ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান, পৃঃ ১১-১২।
বিশ্বেশ্বর চৌধুরী ঃ টেকনাফ থেকে খাইবার, পৃঃ ২২-২৩।
৩৪. এ সম্পর্কে পরে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

প্রবল প্রতিবাদ। ইসলাম প্রচারকগণকে কেন্দ্র করে বাংগালী দলিত জনতা ক্রমেই একটি সংগ্রামী কাফেলায় ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিলো।

এ প্রসঙ্গে এম.এন. রায় লিখেছেন ঃ 'ভারতে বৌদ্ধ বিপ্লবের পরাজয় ঘটেনি বরং তার অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্যই তা ব্যর্থ হয়েছে। সেই বিপ্লবকে জয়ের পথে নিয়ে যাবার জন্য সমাজ-শক্তি তেমনভাবে দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। তার ফল হলো এই যে, বৌদ্ধ মতবাদের পতনের সংগে সংগেই সমগ্র দেশ অর্থনৈতিক দুর্গতি, রাজনৈতিক অত্যাচার, বিচারবুদ্ধির স্বেচ্ছাচারিতা আর আধ্যাত্মিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে ডুবে গেলো। বাস্তবিকপক্ষে সমগ্র সমাজ তখন ধ্বংস ও বিলুপ্তির ভয়াবহ কবলে পড়ে গেছে। এ জন্য নিপীড়িত জনগণ ইসলামের পতাকার নীচে এসে ভিড় করে দাঁড়ালো আর ইসলামও রাজনৈতিক সমানাধিকার না হোক, অন্তত তাদের সামাজিক সমানাধিকার দিলো।... ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা ভারতীয় জনগণের সমর্থন লাভ করলো তার কারণ তার পেছনে জীবনের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গী ছিলো, হিন্দু দর্শনের চাইতে তা ছিলো শ্রেয়; কেননা হিন্দু দর্শনই সমাজ দেহে এনেছিলো বিরাট বিশৃঙ্খলা আর ইসলামই তা থেকে ভারতীয় জনসাধারণকে মুক্তির পথ দেখায়।'[৩৫]

আবদুল মান্নান তালিব লিখেছেন ঃ 'দ্বাদশ শতকের শেষ অবধি বাংলার প্রায় প্রত্যেকটি বিখ্যাত শহরে-বন্দরে এবং দেশের অভ্যন্তরভাগের বিখ্যাত গ্রামে সত্য ও মিথ্যা, হক ও বাতিল এবং ইসলাম ও কুফরের দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ দীর্ঘকালীন দ্বন্দ্বে সাধারণ মানুষের নিকট সত্যের চেহারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। গাঙ্গেয় উপত্যকার অভ্যন্তরে একটি নীরব বিপ্লবের ধারা এগিয়ে চলছিল। বাংলার অধিবাসীরা হাজার বছর থেকে আর্যদের বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্মের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে আসছিল ইসলামের আগমন তাদের সে প্রতিরোধ ক্ষমতা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিল। ... ইসলাম প্রচারকদের সাথে কুফরী শক্তির সংঘর্ষে অনেক ক্ষেত্রে বাংলার সাধারণ মানুষ ইসলাম প্রচারক আলেম-সুফী-মুজাহিদদের সাথে এক সারিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে এবং ইসলামের সামান্য শক্তি বিপুল কুফরী শক্তির মুকাবিলায় জয়যুক্ত হয়েছে।'[৩৬]

রাজা বল্লালসেনের বিরুদ্ধে বিক্রমপুরে বাবা আদম শহীদ মক্কী এবং রাজশাহীতে শাহ মখদুম রূপোসের লড়াই-এর ঘটনা এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। আদম শহীদের সে লড়াইয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সাত হাজার লোক যুদ্ধ করেছিলেন বলে জানা যায়। এ ঘটনা মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানকালে ব্রাহ্মণ শাসকদের দ্বারা নিপীড়িত জাঠ ও অন্যান্য কৃষিজীবীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা মনে করিয়ে দেয়। পার্থক্য হলো, বিন কাসিম এসেছিলেন সামরিক অভিযানে। আর আদম শহীদ ভিতর থেকে জনগণের সংগ্রাম সংগঠিত করেছেন। শাহ মখদুম রাজশাহীর সামন্ত রাজার সীমাহীন জুলুম

৩৫. এম. এন. রায় ঃ ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান (দি হিস্টোরিক্যাল রোল অব ইসলাম-এর অনুবাদ), শতদল প্রকাশনী, ঢাকা, পৃঃ ৬১-৬২।

৩৬. আবদুল মান্নান তালিব ঃ বাংলাদেশ ইসলাম, পৃঃ ৩২।

www.nagorikpathagar.org

নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সংগঠিত করেছেন; দুই দফা মুখোমুখি লড়াইয়ের পর তিনি জয়ী হয়েছেন।

সে যুগের ইসলাম প্রচারের ধারা এ দেশের মানুষের মুক্তি সংগ্রামের ধারার সাথে যুক্ত ও একাত্ম হয়েছিলো। ব্রাহ্মণদের জুলুম-নির্যাতন-নিপীড়নে অতিষ্ঠ বাংগালীর কাছে একেকজন ইসলাম প্রচারক আবির্ভূত হয়েছিলেন মুক্তি সংগ্রামের নায়করূপে। ব্রাহ্মণদের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য দলে দলে মানুষ ইসলামের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হচ্ছিলো। ইসলামকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা জনগণের সে সংঘশক্তি এ দেশে ব্রাহ্মণ্য নিপীড়নের তুফান মুকাবিলায় সবচে কার্যকর প্রতিরোধ-ব্যূহরূপে কাজ করেছে।

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ 'যখন ব্রাহ্মণেরা অত্যাচার উৎপীড়নে বৌদ্ধদের অস্তিত্ব এমনি বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল তখন ইছলাম গ্রহণের মাধ্যমে তাহারা এই অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে নিষ্কৃতি লাভের একটা উপায় খুঁজিয়া পায় এবং বহু বৌদ্ধ ইছলাম গ্রহণ করে। অনুরূপ কারণে অনেক নিগৃহীত হিন্দুও ইছলামের ছায়াতলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।'[৩৭]

সেন-বর্মন যুগের ব্রাহ্মণ্য বর্ণবাদী নিপীড়নের মুকাবিলায় ইসলাম প্রচারকগণ মানুষের কাছে মুক্তি-দূতরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইসলাম প্রচারক আলেম-সুফী-দরবেশ-মুজাহিদগণকে কেন্দ্র করেই তখনকার মুক্তি সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছিলো। তেরো শতকের বৌদ্ধ কবি রামাই পণ্ডিতের লেখা শূন্যপুরাণ-এর 'নিরঞ্জনে রুষ্মা' নামক কবিতায়ও তার প্রমাণ মিলে। রামাই পণ্ডিত লিখেছেন ঃ

জাজপুর পুরবাদি, সোল শত ঘর বেদি,
বেদি লয় কন্নএ নগুণ।
দক্ষিণ্যা মাগিতে জায়, জার ঘরে নাঞি পায়
শাপ দিআ পোড়ায় ভুবন।।
মালদহে লাগে কর ন চিনে আপন পর
জালের নহিক দিশপাশ।
বলিষ্ঠ হইআ বড়, দশ বিশ হৈয়্যা জড়,
সদ্ধর্মীরে করএ বিনাশ ।।
বেদে করি উচ্চারণ বেয়্যাঅ অগ্নি ঘনে ঘন,
দেখিআ সভায় কম্পমান।
মনেত পাইআ মম্ম সভে বোলে রাখ ধর্ম্ম,
তোমা বিনা কে করে পরিত্তান।।

৩৭. মোহাম্মদ আকরম খাঁ ঃ মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পৃঃ ৮৩।

www.nagorikpathagar.org

এইরূপে দ্বিজগণ, করে ছিষ্টি সংহরণ
ই বড় হইল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে থাকিআ ধর্ম্ম, মনেত পাইআ মর্ম্ম,
মায়াত হইল অন্ধকার।।
ধর্ম্ম হৈলা জবনরূপী, মাথয়েত কালটুপি
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিআ উত্তম হএ ত্রিভুবন লাগে ভএ
খোদাএ বলিয়া এক নাম।।
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেত বলএ দম্বদার।
জথেক দেবতাগণ সভে হৈয়্যা এক মন
আনন্দেত পরিলা ইজার ।।[৩৮]

অধ্যাপক আখতার ফারুক এ কবিতার তরজমা করেছেন ঃ উড়িস্যার ষোলশ ঘর বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলো। বংগদেশ তাদের লাখেরাজ কলোনী। কানে পৈতা জড়িয়ে তারা এ দেশে দক্ষিণা আদায় করে ফিরতো। দাবীমতে মোটা দক্ষিণা দিতে কেউ অস্বীকার করলে ক্রুদ্ধ হয়ে তারা তার সর্বনাশ সাধন করতো। মালদহ কাছে ছিলো বলে সেখানে প্রতি ঘরে তারা কর নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলো। এ কর নির্ধারণের ব্যাপারে কোনরূপ বাছ-বিচার তাদের ছিলো না। এ ছাড়া নানারূপ জাল-জুয়াচুরির তো অন্তই ছিলো না। এভাবে ব্রাহ্মণরা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হলো। দল বেঁধে তারা বাংলার বৌদ্ধ জনসাধারণকে বিনাশ করতে লাগলো। কথায় কথায় তারা বেদমন্ত্র আওড়াতো। যখন তখন তাদের মুখ দিয়ে যেন অভিশাপের আগুন ঝরতে থাকতো। তাদের ভয়ে দেশের জনসাধারণ সদা কম্পমান ছিলো। তারা অসহায়ের সহায় প্রভু নিরঞ্জনের কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা জানাতো–হে ধর্ম ঠাকুর, রক্ষা করো! তুমি ছাড়া কে আমাদের এ অমানুষিক অত্যাচার থেকে বাঁচাবে? ব্রাহ্মণেরা এভাবে সৃষ্টি বিনাশ করে চললো। এ যে বড় নির্মম অত্যাচার। ধর্ম ঠাকুর বৈকুণ্ঠে বসে ব্রাহ্মণদের এ পাশবিক অত্যাচারে ব্যথিত হলেন। উৎপীড়িত ভক্তের মর্মবিদারী প্রার্থনায় তিনি দয়ার্দ্র হলেন। তাই তিনি এবারে মাথায় কালোটুপী পরে হাতে তীর-ধনুক নিয়ে উত্তম অশ্বে চড়ে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনীতে ত্রিভুবন কাঁপিয়ে মুসলমানরূপে ভক্তের মুক্তির জন্য আবির্ভূত হলেন। তিনি এসে অত্যাচারীদের সব রীতিনীতি ও ধর্ম বিশ্বাস বদলে ফেললেন। ফলে সাকার প্রভূদের বদলে নিরাকার নিরঞ্জন হলো। অবতাররা সব বেহেশতের বাসিন্দা হলো। যত দেবতা ছিলো সবাই

৩৮. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ঃ মুসলিম বাংলা-সাহিত্য, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১৭।

www.nagorikpathagar.org

মহানন্দে মুসলমান হয়ে ইজার পরলো।'[৩৯]

১০. নীরব বিপ্লবের ধারা

বৌদ্ধ ও অন্যান্য 'নিম্নবর্ণে'র লোকেরা তখন মুসলমানদের মধ্যেই আত্মরক্ষার উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন। ইসলাম প্রচারকদের সীমাহীন ত্যাগ, অদম্য সাহস, অবিচল মনোবল, সাধারণ মানুষের প্রতি নিষ্ঠাপূর্ণ সেবা, আন্তরিক ভালোবাসা, নিষ্কলুষ চরিত্র বাংগালীদের সুপ্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা জাগিয়ে তুলতে ও সংগঠিত করতে সহায়ক হয়েছিলো। বহুদিন থেকেই নিজস্ব দুর্বলতার কারণে বৌদ্ধ ধর্মীরা বুদ্ধের নিষিদ্ধ ঘোষিত কিছু রীতিনীতিতে আত্মসমর্পণ করেছিলো। জীবনবিমুখ বৌদ্ধ ধর্মের সামাজিক ব্যবস্থায় কোন সুসংবদ্ধ নীতিমালা না থাকায় তারা একেবারেই নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলো। মহাযানী, সহজিয়া ও তান্ত্রিক মতবাদে আচ্ছন্ন হয়ে এ ধর্ম নানা কুসংস্কারে ডুবে গিয়েছিলো। এ সব দুর্বলতার কারণে বৌদ্ধ ধর্ম ব্রাহ্মণ্য আগ্রাসনের মুকাবিলায় শক্তভাবে দাঁড়াতে পারছিলো না। বৌদ্ধদের সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় এ পটভূমিতে ব্রাহ্মণ্যবাদী সন্ত্রাস মুকাবিলায়, তাদের প্রতিরোধ যুদ্ধে, মুক্তির লড়াইয়ে ইসলাম প্রচারকগণই হয়েছিলেন আশা ও ভরসার কেন্দ্রবিন্দু। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তথাকথিত অবর্ণ ও অচ্ছুত বলে অভিহিত সাধারণ হিন্দুদের নীরব প্রতিবাদও আন্দোলিত হচ্ছিলো ইসলাম প্রচারকদের নেতৃত্বে।

রামাই পণ্ডিত উল্লেখ করেন যে, ব্রাহ্মণ্য সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ ও অবর্ণ হিন্দু-জনতার প্রতিবাদী চেতনার নেতিবাচক উপাদান ছাড়াও ইসলামী আদর্শের ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যরাজি জনগণকে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হতে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করেছে। বিশ্বেশ্বর চৌধুরী লিখেছেন ঃ 'ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অমানবিক, অবাস্তব ধর্মীয় ও সামাজিক শাসন-শোষণ ও নির্য্যাতন অবিচার থেকে অব্যাহতি তথা মুক্তি লাভের জন্য তারা হাজারে হাজারে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো এবং অদ্যাবধি তা অব্যাহত রয়েছে বলা চলে। কাজেই পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, বর্ণাশ্রয়ীদের ধর্মীয় ও সামাজিক অত্যাচার অবিচারের ফলে ব্রাহ্মণ্য ভারতে প্রবল অসন্তোষের যে বহ্নি ধুমায়িত ছিল তা ইসলামের শান্তিবারি বর্ষিত হওয়ার ফলেই নির্বাপিত হয়েছিল...।'[৪০]

ইসলাম প্রচারকগণ জন্ম, বংশ, গোত্র, বর্ণ ও বিত্তের কৃত্রিম ব্যবধান ভেঙ্গে ফেলার যে আহবান সেদিন শুনিয়েছিলেন তারচে বিপ্লবী ও দ্রোহাত্মক কোন শ্লোগান বাংলার তখনকার সামাজিক পটভূমিতে কল্পনাতীত ছিলো। ব্রাহ্মণ্যবাদ তার দীর্ঘকালীন আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে জনজীবনে পুঞ্জিভূত করেছিলো ক্লেদ, গ্লানি ও দীর্ঘশ্বাস। ইসলাম প্রচারকগণ সে অভিশাপ মুছে ফেলতে যত্নবান ছিলেন। নির্যাতিত জনগণের প্রতি

৩৯. আখতার ফারুক ঃ বাংগালীর ইতিকথা, পৃঃ ৭৪-৭৫।
৪০. বিশ্বেশ্বর চৌধুরী ঃ টেকনাফ থেকে খাইবার, পৃঃ ২৭।

www.nagorikpathagar.org

তাঁদের ছিলো গভীর মমত্ববোধ এবং মানবতার কল্যাণে ছিলো গভীর তিতিক্ষা। সে কল্যাণস্পর্শে বাংলার নিস্তেজ জনপদ ধীরে ধীরে সুপ্তি ভেঙ্গে জেগে উঠেছিলো।

ইসলাম প্রচারকগণ জনগণের সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রত্যন্ত এলাকায় সংগঠন কায়েম করেন। তাঁদের গড়ে তোলা মসজিদ-মাদ্রাসা ও খানকাহগুলি জনগণের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণের কেন্দ্ররূপে চিহ্নিত হয়। সেসব খানকাহ নির্যাতিতের আশ্রয়স্থল, অভুক্তের জন্য লঙ্গরখানা এবং তাদের মুক্তি সংগ্রামের ঘাঁটিরূপে কাজ করছিলো। ইসলাম প্রচারক আলেম, দরবেশ ও মুজাহিদদের নেতৃত্বে বাংলার প্রত্যন্ত এলাকায় এ সব মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহকে কেন্দ্র করে মুক্তি পাগল জনতার সংগ্রাম ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো। ইসলাম প্রচারকদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সে সংগ্রামী ঐক্যের কথা চৌদ্দ শতকের ভূপর্যটক ইবনে বতুতার বিবরণীতেও পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন যে, বৌদ্ধরা মুসলিম দরবেশদের সম্মান জানাতেন, তাঁদেরকে নিজ বাড়িতে আশ্রয় দিতেন এবং খাদ্য দিতেন। ব্রাহ্মণদের প্রতি বৌদ্ধদের এ ধরনের আচরণ ছিলো অচিন্তনীয়।

১১. সেন রাজত্বের পতন

ইসলাম প্রচারকদের নেতৃত্বে বাংগালীর মুক্তি সংগ্রাম ক্রমশ সংহত ও তীব্রতর হচ্ছিলো। অন্তঃসারশূন্য সেন-রাজত্ব তখন দুর্বল হয়ে পড়ছিলো। সেনরাজাদের কুশাসন তাদের চারদিকে শত্রুর সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়ে তুলছিলো। লক্ষণসেনের আমলে রাজ্যের ভিতর ও বাইরে তার শত্রুসংখ্যা আরো বেড়ে যায়। তিনি ক্রমেই শত্রুবেষ্টিত হয়ে পড়েন। লক্ষণসেন শীঘ্রই নিজেকে গৌড় (তখন সম্ভবত পালদের কোন বংশধর কর্তৃক শাসিত ছিলো), কামরূপ (আসাম), কলিংগ (উড়িষ্যা) ও মগধের (বিহার) সাথে যুদ্ধরত দেখতে পান।[৪১] লক্ষণসেনের শাসনের শেষের দিকে বারো শতকের শেষভাগে দক্ষিণ বাংলা (সুন্দর বনের খাড়ি পরগনা) স্বাধীন হয়ে যায়। প্রায় একই সময়ে মেঘনার পুবপাড়ে দেববংশ স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।[৪২] মেঘনার পুব পাড়ে (ত্রিপুরা অঞ্চল) স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন রনবঙ্কমল্ল হরিকেলদেব। তাঁর রাজধানী ছিলো কুমিল্লা শহরের পাঁচ মাইল পশ্চিমে ময়মনামতি পাহাড় অঞ্চলে। ত্রিপুরা-নোয়াখালী-চট্টগ্রাম এলাকা জুড়ে সে সময় দেববংশের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো।[৪৩]

তৎকালীন সেন রাজত্বের পরিস্থিতি তুলে ধরে নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন ঃ 'পরাজয়ের মনোভাব রাষ্ট্রকে যে পেয়ে বসেছিল, অদৃষ্টের ওপর নির্ভরতার ভেতর দিয়ে তার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা, মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, সেনাপতি, বণিক, রাজপুরুষ সবাই

৪১. ডক্টর মোহাম্মদ মোহর আলী ঃ হিস্ট্রি অব দি মুসলিমস অব বেঙ্গল, ১ম (ক) খণ্ড, পৃঃ ৮।
৪২. পূর্বোক্ত।
৪৩. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃঃ ৯৭।

www.nagorikpathagar.org

জ্যোতিষশাস্ত্রে পরম বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিলেন।'[৪৪] সেন রাজাদের প্রধান দুর্বলতা ছিলো, তাঁরা ছিলেন জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। রাজার কুশাসনে জনগণ ছিলো ক্ষিপ্ত। ভেতর থেকে রাজার বিরুদ্ধে গড়ে উঠছিলো প্রবল প্রতিরোধ। রাজার অনুচরগণ ছিলেন আতঙ্কগ্রস্ত। উপদেষ্টা ও মন্ত্রীমণ্ডলী পরাজয়ের মনোভাবে আচ্ছন্ন। জ্যোতিষরাই ছিলো রাষ্ট্রবুদ্ধির নিয়ামক।[৪৫] এ পরিস্থিতিতে ভাড়াটিয়া সৈন্যদের শক্তির ওপর নির্ভর করে শাসন টিকিয়ে রাখা সম্ভব ছিলো না।

রমাপ্রসাদ চন্দ লিখেছেন ঃ 'প্রজাপুঞ্জের নির্ব্বাচিত গোপালের বংশধরগণকে গৌড়জন যেরূপ ভক্তি-নেত্রে দেখিতেন, বিদেশাগত পালরাজকুল-উন্মূলনকারী বিজয়সেনের এবং বল্লালসেনের উত্তরাধিকারী লক্ষণসেন সেরূপ ভক্তিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন না।... বরেন্দ্রের বিদ্রোহে গৌড়ের প্রজাশক্তি এবং রাজশক্তি এই উভয়ের মধ্যে যে ভেদ উপস্থিত হইয়াছিল, কর্ণাটাগত সেনবংশের অভ্যুদয়ে, তাহা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল; এবং "মাৎসান্যায়" নিবারণের, অথবা "অনীতিকারম্ভের" প্রতিকারের অধিকার বিস্মৃত হইয়া গৌড়জন কালস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন। মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের অভ্যুদয় গৌড়ের সর্বনাশের মূল বা সর্বনাশের ফল বলিয়া কথিত হইতে পারে না। বিজয়সেনের অভ্যুদয়ই গৌড়ের সর্বনাশের প্রকৃত মূল বা ফল বলিয়া কথিত হইতে পারে।... লক্ষণসেন যখন গৌড়াধিপ তখন কান্যকুব্জের সিংহাসনে গাহড়বাল-রাজ জয়চন্দ্র, এবং কলিঙ্গের সিংহাসনে দ্বিতীয় রাজরাজ, এবং তৎপরে দ্বিতীয় অনঙ্গভীম সমাসীন ছিলেন। ইহারা কেহই গৌড়াধিপের তুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন না। সুতরাং ইহাদিগের সহিত গৌড়াধিপের জয়লাভ অসম্ভব নহে। কিন্তু লক্ষণসেন গৌড়-রাষ্ট্রের বহিঃশত্রু দমনে সমর্থ হইয়া থাকিলেও, ... প্রজাপুঞ্জের সহযোগিতার অভাবে অভ্যন্তরীণ ঐক্য সাধনে এবং বিভিন্ন অংশের রক্ষার সুব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। সেই জন্যই মহম্মদ-ই-বখতিয়ার অবাধে মগধ ও বরেন্দ্র অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন।'[৪৬]

এমনি পরিস্থিতিতে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে মুসলিম সৈন্যদের একটি ছোট দল নদিয়ায় আবির্ভূত হলেন। অনন্যোপায়, কিংকর্তব্যবিমূঢ় লক্ষণসেন তখন দিশেহারা হয়ে ক্ষিপ্রগতিতে পূর্ববাংলায় পালিয়ে গেলেন। এ ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয় ১২০৩ সালের মার্চ মাসে।[৪৭]

১২. মুক্তির প্রতীকরূপে বখতিয়ার খিলজী

লক্ষণসেনের বিরুদ্ধে বখতিয়ার খিলজীর বিজয় কোন আকস্মিক ঘটনা ছিলো না।

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৭।
৪৫. পূর্বোক্ত।
৪৬. রমাপ্রসাদ চন্দ ঃ গৌড়রাজমালা পৃঃ ৮১-৮২।
৪৭. ডক্টর মোহাম্মদ মোহর আলী ঃ হিস্ট্রি অব দি মুসলিমস অব বেঙ্গল, পৃঃ ৫৪-৫৫-এর দ্বিতীয় টীকা।

www.nagorikpathagar.org

জনগণের দীর্ঘকালীন মুক্তি সংগ্রামের বিজয় সূচিত হয়েছিলো এ ঘটনার মাধ্যমে। ইসলাম প্রচারক সুফী-দরবেশ-মুজাহিদগণ এ দেশের জনগণকে সাথে নিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন রাজত্বের বিরুদ্ধে যে নিরন্তর সংগ্রাম পরিচালনা করছিলেন, সে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ইসলামের প্রতি জনগণের সমর্থন গড়ে উঠেছিলো। জনসমর্থনের সে ভিত্তির ওপরই সম্পন্ন হয়েছিলো বখতিয়ার খিলজীর বিজয়। এ বিজয় জনগণের প্রত্যাশাকে কতখানি ধারণ করেছিলো, তার উল্লেখ পাওয়া যায় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের বর্ণনায়। তিনি লিখেছেন যে, বৌদ্ধ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আধিপত্য ও নির্মূল অভিযানের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে বাংলার মুসলিম বিজয়কে দুবাহু বাড়িয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলো।[৪৮]

তিব্বতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু লামা তারানাথ তাঁর ষোল শতকের বিবরণীতে সেন আমলের ব্রাহ্মণ্য স্বৈরাচারের বিবরণ দিয়ে জানাচ্ছেন যে, ব্রাহ্মণ্য নির্মূল অভিযানের শিকার বৌদ্ধরা মুসলমানদের অভিনন্দিত করেছিলো এবং ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীকে বংগ বিজয়ে সাহায্য করেছিলো।[৪৯] আমিনুল ইসলাম তাঁর 'বাংলার রূপরেখা' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ '... সমাজ ব্যবস্থার বিভেদের ফলে নদীয়ার রাজাকে কোন রাজাই সাহায্য করেনি, এমন কি বৌদ্ধরা বখতিয়ার খিলজীকে সাহায্য করেছিল।'

শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ 'সেন রাজগণ বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বৌদ্ধরাও হিন্দুদের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিল। সাধনমালা বজ্রসূচি তত্ত্বকোষ, সরোরুহবজ্রের দোহাকোষ, আর্য্যদেরকৃত চিত্তশোধন-প্রকরণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বৌদ্ধদের হিন্দুবিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায়।... এই বিদ্বেষের একটি পরিচয় শূন্য-পূরাণের অন্তে সন্নিবিষ্ট নিরঞ্জনের উষ্মা ও ধর্মপূজাবিধানের কালিমা জাল্লাল। উহা ইহতে জানা যায়, সদ্ধর্মীরা (সধর্মী বৌদ্ধেরা) মুসলমান বিজেতার সাহায্যে হিন্দুদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়া কথঞ্চিত শান্তিলাভ করিয়াছিল।'[৫০]

বাংলায় মুসলিম বিজয়ের পটভূমি ও গুরুত্ব সম্পর্কে সুকুমার সেন লিখেছেন ঃ 'Superstitious beliefs and derogatory practices were slowly destroying the initiative, spirit of the people both high and low... . The gulf between the higher and the lower classes was widening. The Muslims in fact struck a stunning blow to the self complacency of the ruling classes and of the priesthood .'[৫১]

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বিজয়ের ফলে লাখনৌতিকে কেন্দ্র করে এ দেশীয় নও-মুসলিম ও বহিরাগত মুসলমানদের সমন্বয়ে বাংলার প্রথম

৪৮. ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন. বৃহৎ বঙ্গ, পৃঃ ৩৩৩।
৪৯. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস (মূল খণ্ড), পৃঃ ৫২৯।
৫০. শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ শূন্য পুরাণ, পৃঃ ১২৪-১২৬।
৫১. Sukumar sen : History of Bengali Literature, New Delhi, 1960, p-39.

www.nagorikpathagar.org

আনুষ্ঠানিক মুসলিম সমাজ গড়ে ওঠে। বাংলার এ নব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাজ্যের সীমানা উত্তরে পুর্নিয়া শহর হয়ে দেবকোট থেকে রংপুর শহর, পুব ও দক্ষিণ পুবে তিস্তা ও করতোয়া, দক্ষিণে গঙ্গার মূলধারা (পদ্মা) এবং পশ্চিমে কুশী নদীর নিম্নাঞ্চল থেকে গংগার কিনারায় রাজমহল পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো।[৫২]

বখতিয়ার খিলজীর নদিয়া বিজয়ের একশ বছরের মধ্যে বাংলার প্রায় অর্ধেক এলাকায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। চৌদ্দ শতকের মধ্যে বাংলার প্রায় সমগ্র এলাকা মুসলিম শাসনাধীনে আসে।

মুসলিম শামনামলে বাংলার জনগণ নরপূজা, প্রতীক পূজা, পৌত্তলিকতা ও অবতারবাদের অভিশাপ থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হতে থাকে। ব্রাহ্মণ্যবাদী দুঃশাসন তাদের সার্বিক জীবনে যে সীমাহীন ক্লেদ, গ্লানি ও পঙ্গুত্ব সৃষ্টি করেছিলো, সে অবস্থারও অবসান হয় এ সময়ে। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেন ঃ 'যে বঙ্গ ছিল আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত, যা ছিল পাল ও সেনদের আমলে কম গৌরবের ও (কম) আদরের সেই বঙ্গ নামেই শেষ পর্যন্ত তথাকথিত পাঠান (মুসলিম) আমলে বাংলার সমস্ত জনপদ ঐক্যবদ্ধ হল।'[৫৩]

এন. এন. ল লিখেছেন ঃ '....that the Mohammedan invasion of India marked the beginning of momentous changes not only in the social and political spheres, but also in the domain of education and bearing '[৫৪] এ মন্তব্য বাংলার জন্য অধিকতর প্রযোজ্য।

ডক্টর এম. এ. রহীম-এর মতে ঃ 'মুসলিম বিজয় ছিল বাংলার প্রতি বিরাট আশীর্বাদ স্বরূপ। যা বাংলা ভাষাভাষী লোকদেরকে একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐক্যমঞ্চে সংঘবদ্ধ করে, বাংলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করে দেয়। কেবল এই বিরাট সংহতি এবং মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার গুণেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি উৎসাহিত হয়। যদি বাংলায় মুসলিম বিজয় ত্বরান্বিত না হতো এবং এদেশে আর কয়েক শতকের জন্য হিন্দু শাসন অব্যাহত থাকতো, তাহলে বাংলা ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যেতো এবং অবহেলিত ও বিস্মৃত হয়ে অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত হতো।'[৫৫]

'নিরপেক্ষভাবে বিচার করে ইহা বলা যায় যে, মুসলমান রাজত্বকাল ছিলো বাংলার ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গঠনমূলক যুগ।'[৫৬] জনগণের দীর্ঘকালীন সংগ্রামের সুফলরূপে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তারই ফলে বাংগালীর সামনে দীর্ঘ প্রত্যাশিত মুক্তির দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

---

৫২. যদুনাথ সরকার ঃ হিস্ট্রি অব বেঙ্গল ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২-১৩।
৫৩. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, পৃঃ ২২।
৫৪. N. N. Law : Promotion of Learning during Mohammedan Rule p. XIX.
৫৫. ডক্টর এম. এ. রহীম ঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), ভূমিকা, পৃঃ নয়।
৫৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৭৪।

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম অধ্যায়

নতুন বিপ্লবের পদধ্বনি

১. 'রিয়েল কিংস অব বেংগল'

বাংলার জনগণের দ্বিতীয় পর্যায়ের মুক্তি সংগ্রামে ইসলাম প্রচারকগণ মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। জনগণের সামাজিক আন্দোলনকে তাঁরা সংগঠিত করেছেন। ধৈর্য, ত্যাগ ও যোগ্যতার সাথে সে সংগ্রামকে তাঁরাই সফল পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়েছেন। তাঁদের তাৎপর্যপূর্ণ অবদানের যথাযথ মূল্যায়ন ছাড়া এ দেশের মুক্তি সংগ্রামের যথার্থ ইতিহাস তুলে ধরা সম্ভব নয়।

বাংলার এবং আরো ব্যাপকভাবে এ উপমহাদেশের জনজীবন ও সমাজ সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব সম্পর্কে Doctor Luxmidha লিখেছেন ঃ 'If one desires to form a correct appreciation of Islam and its great contribution to the development of a greater India during the last six or seven hundred years he should study the writings of those spiritual leaders of Islam who lived with the masses of India and worked for their betterment, by precept and example, in the Islamic spirit of unselfish purpose of love.'[১]

বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যুগান্তকারী পরিবর্তন ইসলাম প্রচারকদের অবদান। প্রথম পর্যায়ের মুসলিম সমাজ গঠন, ইসলামের প্রতি জনসমর্থনের ভিত্তি রচনা এবং জনগণের মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব দান করেছেন তাঁরা। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা এবং এর পর সে শাসনকে জনগণের কল্যাণে টিকিয়ে রাখতেও প্রচারকগণ পালন করেছেন অসামান্য ভূমিকা। শাসকদের ওপর ইসলাম প্রচারকদের প্রভাব সম্পর্কে ১৮০৮ সালে বুকানন হ্যামিল্টন লিখেছেন ঃ 'There was truth in the assertion that these saints were the real kings of Bengal, as it was only according to their pleasure that the temporal kings could reign.'[২]

অধ্যাপক গিবন-এর ভাষায় ঃ 'Sufism increasingly attracted the creative social and intellectual energies within the community to become the bearer

১. Doctor Luxmidha (Cited in Calcutta) : Heritage of Pakistan, Karach, 1955.
২. Abid Ali khan (Cited) : Memoirs of Gaor and Pandua. p-107.

www.nagorikpathagar.org

of or instrument to a social and cultural revolution."[৩]

অধ্যাপক মোহাম্মদ গোলাম রসূল লিখেছেন ঃ 'No history of the country can, therefore, be complete without a proper appraisal of the contribution of sufies and saints, who really led the religious and cultural movement in the country.'[৪]

২. বাংলায় ইসলাম প্রচারের পটভূমি

ইসলাম প্রচারকগণ ঠিক কখন থেকে এ দেশে আসতে শুরু করেন তা ঐতিহাসিকভাবে সুচিহ্নিত নয়। তবে মক্কায় ইসলাম প্রচার শুরু হওয়ার পর সে বাণী এখানে পৌঁছতে মোটেই বিলম্ব হয়নি, বিভিন্ন তথ্য থেকে তা নিশ্চিতরূপে ধারণা করা যায়। ঐতিহাসিক এলফিনস্টোন জানাচ্ছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ) এর আমল থেকেই ভারতের সাথে আরবদের চমৎকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিলো।[৫]

খালিক আহমদ নিযামী লিখেছেন, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আবির্ভাবের আগেই ভারত ও আরব-উভয় অঞ্চলের জনগণের মধ্যে পরস্পরের ঘনিষ্ট যোগাযোগ বিদ্যমান ছিলো। তিনি লিখেছেন ঃ India's relation with the Arab world go back to hoary past. Long before the rise of Islam, there was brisk commercial contact between India and Arabia and the Arab traders carried Indian goods to the European markets by way of Egypt and Syria. Elphinstone has rightly observed that from the days of Joseph to the days of Marco Polo and Vasco de Gama the Arabs were the captains of Indian commerce. There were large number of Arab colonies on the western coast of India and many Indian settlements in the Arab countries. Ubulla, for instance, was known as arz-ul-Hind on account of the large number of Indians who inhibited that region. When Islam spread and the Arabs got converted to Islam, these colonies continued to flourish as before. The Indian rajas appointed Muslim judges, known as *hunurman,* to decide their cases and provided all facilities to them to organize their community life. Commercial contact led to cultural relations and while large number of Arab navigational and other terms were adopted by the Indians, Indian customs, institutions and practices found their way to Arabia. Philologists have traced three Sanskrit

৩. H. A. R. Gibb : An Interpretation of Islamic History; K. A. Nizami : Religion and Polities in India During the Thirteenth Century, Delhi, 1974, p-261.

৪. Prof. M. G. Rasul : The Advent of Islam in Bengal, its Social and Cultural Impact, Journal of the Department of Islamic History and Culture, Unviversity of Chittagong, October, 1986.

৫. Mountstuart Elphinstone : History of India : The Hindu and Mahometan Periods, Third Edition, London, 1849, Chapter X, p-167-168

www.nagorikpathagar.org

word—misk (musk), zanjbil (ginger), and kafur (camphor)—in the Quran.[৬]

দুই অঞ্চলের জনগণের মধ্যে বাণিজ্যিক সংযোগ থেকে সাংস্কৃতিক সম্পর্কের বিকাশ ঘটে। এ যোগাযোগ ও সম্পর্কের কারণেই হযরত মুহাম্মদ (স.) ভারতীয় এলাকা থেকে সুগন্ধি দ্রব্য উপহার পেয়েছেন। একজন ভারতীয় রাজা তাঁকে আচার পাঠিয়েছেন।[৭] রসূল (স.)-এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা.) একবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর চিকিৎসার জন্য তখন আরবে অবস্থানকারী একজন ভারতীয় চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করা হয়। এ কথা ইমাম বুখারী (রহ.) উল্লেখ করেছেন।[৮] চিকিৎসক হিসাবে ভারতীয়রা সে যুগে আরবে সমাদৃত ছিলেন, এ ঘটনা তার প্রমাণ। ইবনে খাল্লিকান জানাচ্ছেন, হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর পুত্র হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রহ.) ছিলেন ভারতীয় মায়ের সন্তান।[৯] মালাবারের অন্তর্গত চের দেশের রাজা চেরুমাল পেরুমাল রসূল (স.)-এর সময়ই ইসলাম গ্রহণ করেন। দশ শতকের পারস্য বণিক বুজুর্গ বিন শাহরিয়ার জানাচ্ছেন, আরবে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইসলাম প্রচারের কথা জানতে পেরে সরন্দ্বীপবাসীরা রসূল (স.)-এর কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এ দূত মদীনায় পৌঁছেন হযরত উমরের (রা.) খিলাফতকালে। হযরত উমরের সাথে সে দূতের সাক্ষাত হয়। ইসলাম, ইসলামের নবী এবং তাঁর অনুসারীদের সম্পর্কে আলোচনা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে দেশে ফিরার পথে দূত বালুচিস্তানের কাছে মাকরানে মারা যান। তাঁর একজন সাথি সরন্দ্বীপে পৌঁছে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা জানান। বিস্তারিত জেনে সরন্দ্বীপের জনগণের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়।[১০] ফিরিশতা জানান, সরন্দ্বীপের রাজা এ সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।[১১]

এসব ঘটনা থেকে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন ছিলো না। এ প্রসঙ্গে জেমস টেইলর উল্লেখ করেন ঃ হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের কয়েক হাজার বছর আগে থেকে দক্ষিণ আরবের সাবা কওমের লোকেরা এই উপমহাদেশের পূর্ব-উত্তর এলাকায় পালতোলা জাহাজে করে আসতো। তার নিদর্শন তাদের প্রতিষ্ঠিত সাভার বন্দরের নামে রয়েছে।[১২] 'সাবা'দের 'উর' বা নগর থেকে সাব-উর এবং তারই অপভ্রংশ হিসাবে পরবর্তীকালে এ বন্দর সাভার নামে পরিচিত হয়েছে।[১৩]

৬. কে. এ. নিযামী ঃ ডক্টর মুহাম্মদ যাকী সম্পাদিত 'এ্যারাব একাউন্টস অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থের ভূমিকা।
৭. পূর্বোক্ত।
৮. পূর্বোক্ত।
৯. পূর্বোক্ত।
১০. বুজুর্গ বিন শাহরিয়ার ঃ আযায়েব-উল-হিন্দ; ডক্টর মুহাম্মদ যাকী ঃ এ্যারাব একাউন্টস অব ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৫১।
১১. ডক্টর মুহাম্মদ যাকী ঃ এ্যারাব একাউন্টস অব ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৫১।
১২. James Tailar : Remarks on the Sequel to periplus of the Erithrian Sea, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol, 16, 1847, p-76; Asiatic Researches on the Arabs, Vol-11 By sir William jones. p-3.
১৩. মুফাখ্খারুল ইসলাম ঃ উপমহাদেশের ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্ব ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা, ১৯৮৪।

www.nagorikpathagar.org

রসূল (স.)-এর আবির্ভাবের আগেই আরব জনগণ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নৌ-পথের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কারণ, ইরান ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে অব্যাহত যুদ্ধ-বিবাদের দরুন আরবদের জন্য স্থল-বাণিজ্যের পথ সে সময় বিঘ্ন-সংকুল হয়ে পড়েছিলো। ইয়ামন-হাজরামাউতের মধ্য দিয়ে আরবদের নৌ-পথে বাণিজ্য করার অভিজ্ঞতা আরও আগে থেকেই ছিলো। তাদের বাণিজ্য বহর পাক-ভারত উপমহাদেশে, বার্মা, কম্বোডিয়া এবং মালাক্কা প্রণালী পর্যন্ত নিয়মিত যাতায়াত করতো।

খ্রীস্টীয় পাঁচ শতকের শেষভাগে খোদ মক্কার কুরাইশ বণিকরাও নৌপথে বহির্বাণিজ্যের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিলো।[১৪] আরবদের সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসারের সাথে সাথে ভারতীয় এ উপমহাদেশের উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির আশ-পাশে তাদের স্থায়ী উপনিবেশও গড়ে উঠেছিলো। দক্ষিণ-ভারতের মালাবার, কালিকট, চেরর এবং বাংলার চট্টগ্রাম ও আরাকান উপকূলে আরব জনগণের এরূপ বসতি ইসলামপূর্ব কয়েক শতক আগে থেকেই গড়ে উঠেছিলো, তার অনেক প্রমাণ রয়েছে।

মওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভী 'আরব ও হিন্দকে তা'আলুকাত' নামক তাঁর গবেষণা গ্রন্থে এ উপমহাদেশের উপকূল অঞ্চলে গড়ে ওঠা উপনিবেশগুলি সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সন্নিবেশ করেছেন। আরব দেশ থেকে বছরে অন্তত দু'বার এ সব উপনিবেশে নৌবহর এসে নোংগর করতো। ফলে বাণিজ্য-পণ্যের যেমন আদান-প্রদান হতো, তেমনি তথ্যেরও আদান-প্রদান চলতো।[১৫] ডক্টর এম. এ. রহীম উল্লেখ করেন যে, আরবরাই চট্টগ্রামের নাম দেন শাত-ইল-গঙ্গা বা গঙ্গার বদ্বীপ। চট্টগ্রাম সে সময় গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত ছিলো।[১৬]

সুলায়মান, ইদরীসী প্রমুখ নয় ও দশ শতকের আরব বণিক ও ভৌগোলিক ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীরে বাংলার অন্যতম প্রাচীন জনপদ কার্পাসখ্যাত কাপাসিয়ার টোক বন্দরকে 'তওক' বন্দর বলে উল্লেখ করেছেন। আরবীতে 'তওক' অর্থ গলার হার। এখানে বানার নদী 'তওক' বা হারের মতো বেঁকে ব্রহ্মপুত্রের কণ্ঠলগ্ন হয়েছে বলে আরবরা তাঁদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তখনকার এ পোতাশ্রয়টিকে তওক নামে অভিহিত করেন।[১৭]

মিনহাজউদ্দীন সিরাজ উত্তর বাংলা বুঝাতে 'বররিন্দ' লিখেছেন। মুফাখ্খারুল ইসলাম উল্লেখ করেন, আরবরা জাহাজে করে বিশাল সাগরে-মহাসাগরে ভাসতে ভাসতে দূর থেকে উত্তর বংগের লালমাটি-ভূখণ্ড দেখে চীৎকার করে উঠতো 'বার্‌রি

১৪. মুহিউদ্দীন খান ঃ বাংলাদেশে ইসলাম- কয়েকটি তথ্যসূত্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা ১৯৮৮। (সূরা কুরাইশেও এ সম্পর্কে আভাস মিলে।)

১৫. পূর্বোক্ত।

১৬. ডক্টর এম. এ. রহীম ঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১২।

১৭. মুফাখ্খারুল ইসলাম ঃ উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্ব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা ১৯৮৪।

www.nagorikpathagar.org

হিন্দ' বলে। 'বার' অর্থ মাটি। বাররি-হিন্দ অর্থ হিন্দুস্তানের মাটি। সেই থেকে এ অঞ্চল বররিন্দ বা বরিন্দ নামে পরিচিত হয়েছে। বাংলার অন্যতম নদী বন্দর ভৈরবের নামও আরবদের দেয়া 'বহর-ই-আব' বা পানির সাগর থেকে হয়েছে বলে মনে করা হয়। নয় শতকের আরব বণিক সুলায়মানের ভ্রমণ কাহিনীতে 'সালাহাত' ও 'কামরুতে'র নাম পাওয়া যায়। 'সালাহাত' সিলেটের আরব প্রদত্ত নাম, যার অর্থ সদনুষ্ঠান। কামরূপের নাম মিনহাজউদ্দীন সিরাজও 'কামরুত' লিখেছেন। 'বাংগালী যুগে যুগে' গ্রন্থের লেখক নাজির আহমদ 'কামরুত' নামটি 'কওম-ই হারুত' থেকে উদ্ভূত বলে উল্লেখ করেছেন। যে সব নামের প্রথমে 'কম', 'কাম' বা 'কুম' আছে, সেগুলি আর্যভাষা থেকে উদ্ভূত নয়, এ কথা সুনীতিকুমার সেনও স্বীকার করেছেন।[১৮]

৩. সাহাবী আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর বাংলায় আগমন প্রসঙ্গ

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বাংলাদেশের সাথে আরবদের সুপ্রাচীন সম্পর্কের পটভূমি পাওয়া যায়। ইসলামের আবির্ভাব সমগ্র আরব জুড়ে একটা দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে আরবরা বন্দর স্থাপন ও বসতি গড়েছেন, তাঁদের কাছে তাঁদের পিতৃভূমি আরবে ইসলামের নবীর আবির্ভাবের মতো সাড়া জাগানো খবর বণিকদের মাধ্যমে এসে পৌছাতে বিলম্ব হবার কারণ ছিলো না। রসূল (স.)-এর আবির্ভাব এবং তাঁর প্রচারিত দীনে হকের আওয়াজ লোকের মুখেমুখে বাইরেও প্রচারিত হয়েছিলো। এ কথা উপরের আলোচনার ভিত্তিতে নিশ্চিত করেই বলা যায়।

ইসলাম এক ব্যাপক প্রচারমুখী জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের প্রত্যেক অনুসারীই একেকজন মুবাল্লিগ বা প্রচারকের দায়িত্ব পালন করবেন, এটা ইসলামের একটি মৌলিক শিক্ষা। ইসলামের বাণী বাইরে প্রচার করার জন্য সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক বিজ্ঞ সাহাবীকে রসূল (স.) হাবশায় পাঠিয়েছিলেন। কারণ লোহিত সাগরের প্রবেশ পথে অবস্থিত হাবশা ছিলো তখন উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র। পশ্চিমে মিসর এবং পূবে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্রপথে চলাচলকারী নৌবহর হাবশায় এসে যাত্রাবিরতি করতো। এখানকার বাজারে বিপুল পরিমাণে পণ্য বিনিময় হতো। রসূল (স.) এই গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রটিকে খবর আদান-প্রদানের কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।[১৯] মওলানা মুহিউদ্দীন খান লিখেছেন ঃ 'শেষ পর্যন্ত এখান থেকেই সাহাবী হযরত আবু ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে আরও তিনজন সাহাবী এবং বেশ কিছুসংখ্যক হাবশী মুসলমানসহ পূর্ব দিককার সুদীর্ঘ বাণিজ্য পথটি ধরে প্রচারকগণের একটি দল বের হয়ে

১৮. মুফাখ্খারুল ইসলাম ঃ উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্ব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা, ১৯৮৪।

১৯. মুহিউদ্দীন খান ঃ বাংলাদেশে ইসলাম—কয়েকটি তথ্যসূত্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ১৯৮৮।

www.nagorikpathagar.org

পড়েছিলেন। আর তাঁদের মাধ্যমেই আমাদের এ উপমহাদেশের প্রতিটি উপকূলীয় বাণিজ্যকেন্দ্র ও আরব উপনিবেশ থেকে শুরু করে সুদূর চীনের ক্যান্টন পর্যন্ত ইসলামের বাণী রসূল-ই-মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশাতেই পৌঁছে গিয়েছিল বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়ে গেছে।'[২০]

মুহিউদ্দীন খান উল্লেখ করেন ঃ 'হাবশায় হিজরত হয়েছে নবুওতের পঞ্চম সালে। সপ্তম সালেই হযরত আবু ওয়াক্কাস সম্রাট নাজ্জাসীর দেওয়া একখানা সমুদ্রগামী জাহাজ নিয়ে বের হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন সাহাবী হযরত কায়েস ইবনে হুযাফা (রা.), হযরত ওরওয়াহ ইবনে আছাছা (রা.) এবং হযরত আবু কায়স ইবনুল হারেছ (রা.)। রিজাল-এর প্রসিদ্ধ কিতাবগুলিতে উপরোক্ত চারজন সাহাবীরই নাম পাওয়া যায়। তাঁরা যে হাবশায় হিজরত করেছিলেন এ তথ্যও পাওয়া যায়। কিন্তু হাবশা থেকে তাঁরা মক্কা বা মদীনায় ফিরে গিয়েছিলেন কি-না, কিংবা তাঁদের মৃত্যু কোথায় হয়েছে, এ সম্পর্কে কোন তথ্য সে সব কিতাবে নেই। চীন অভিযানকারী দলের নেতা ছিলেন হযরত আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনে ওহাইব ইবনে আবদে মানাফ। তাঁর সুযোগ্য পুত্র কাদেসিয়া বিজয়ী হযরত সাআদ বিন আবু ওয়াক্কাসের সাথে হযরত মালিকের 'আবু ওয়াক্কাস' নামই বেশী খ্যাত হয়েছে। হযরত আবু ওয়াক্কাস ছিলেন রসূল-ই-মকবুল (স.)-এর মাতা হযরত আমিনার আপন চাচাত ভাই। সে হিসাবে রসূল-ই-মকবুল (স.)-এর মামা। চীনা ভাষায় সে দেশে ইসলামের আগমন সম্পর্কিত যেসব তথ্যসূত্র রয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, খ্রীস্টীয় ৬২৬ সনের কাছাকাছি কোন একটা সময়ের মধ্যে চীন উপকূলে ইসলাম-প্রচারকগণ অবতরণ করেন। দলের নেতা ছিলেন রসূল (স.)-এর মাতুল। তাঁর সাথে রসূলুল্লাহর আরও তিনজন সাহাবী ছিলেন। দলনেতা হযরত আবু ওয়াক্কাস (রা.) ক্যান্টন বন্দরে অবস্থান করেন। তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোয়াংটাং মসজিদটি এখনও সমুদ্র তীরে সুউচ্চ মিনার নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মসজিদের অদূরেই তাঁর কবর গত প্রায় চৌদ্দশ বছর ধরে চীনা মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও প্রিয় জিয়ারতগাহ রূপে পরিচিত হয়ে আসছে। অন্য দু'জন সাহাবী উপকূলীয় ফু-কীন প্রদেশের চুয়ানচু বন্দরের নিকটবর্তী লিং নামক পাহাড়ের উপর সমাহিত রয়েছেন। চতুর্থ জন দেশের অভ্যন্তরভাগে চলে গিয়েছিলেন বলে উল্লেখিত হয়েছে।'[২১]

হযরত আবু ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে এই সাহাবীগণ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ক্যান্টন যাওয়ার পথে বাংলাদেশেও অবস্থান করেছিলেন এবং চীন দেশে ইসলাম প্রচারে তাঁদের সাথে বাংলাদেশের মুসলমানদের অংশগ্রহণের সম্ভাব্যতার কথাও মওলানা মুহিউদ্দীন খান উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ 'হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইমাম আবাদান মারওয়াযীর বয়ান মুতাবিক হযরত আবু ওয়াক্কাস মালিক

২০. পূর্বোক্ত।
২১. পূর্বোক্ত।

www.nagorikpathagar.org

ইবনে ওহাইব (রা.) নবুওতের পঞ্চম সনে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। সপ্তম সনে তিনজন সাহাবী এবং কিছু সংখ্যক হাবশী মুসলমানসহ দুইটি সমুদ্রগামী জাহাজযোগে চীনের পথে বের হয়ে যান। চীনা মুসলমানদের বই-পুস্তকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী হযরত আবু ওয়াক্কাসের জামাত ৬২৬ খ্রীস্টাব্দ মুতাবিক হিজরী তিন সনে চীনে পৌছেছিলেন। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, এঁরা হাবশা থেকে বের হওয়ার পর অন্যূন নয় বছর পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে অতিবাহিত করেছেন। আর এই নয় বছর সময়-সীমার মধ্যেই ইসলামের বাণী ভারত এবং বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে পৌছেছে।'[২২] এ সব তথ্যের আলোকে মওলানা মুহিউদ্দীন খান লিখেছেন ঃ

'ক. বাংলাদেশে ইসলাম স্থলপথে নয় সমুদ্রপথে এসেছে।

খ. খোদ রসূল-ই-করীম (স.)-এর জীবদ্দশায় এমনকি সম্ভবতঃ হিজরতেরও আগে বাংলার উপকূল অঞ্চলে ইসলামের আলো বিস্তার লাভ করেছে।

গ. বাংলাদেশে সাহাবীর আগমন হয়েছে এবং তাঁরা এদেশে যথেষ্ট সংখ্যক অনুসারী বা তাবেয়ী রেখে গেছেন।

ঘ. অসম্ভব নয় যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দূরবর্তী এলাকা–এমনকি চীনে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুসলমানগণও অংশগ্রহণ করেছেন। কেননা, হযরত আবু ওয়াক্কাসের (রা) সুদীর্ঘ সফরে প্রতিটি বিরতিস্থান থেকেই পরবর্তী মনযিল পর্যন্ত যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় লোক-লস্কর এবং রসদাদি সংগ্রহ করার প্রয়োজন নিশ্চয়ই হয়েছিল।'[২৩]

৪. রাজা চেরুমালের ইসলাম গ্রহণ

সাহাবী হযরত আবু ওয়াক্কাস মালিক ইব্ন ওহাইব (রা.)-এর দীর্ঘ নয় বছরের ভ্রমণ বৃত্তান্তের কোন লিখিত দলিল আমাদের হাতে নেই। এ সম্পর্কিত কিছু বিবরণ রয়েছে চীনদেশীয় মুসলমানদের প্রাচীন বই-পত্রে এবং দ্রাবিড় অধ্যুষিত মালাবার এলাকার প্রাচীন কিছু লোক-কাহিনীতে। তামিল ভাষায় লেখা এ সব লোককাহিনীর সত্যতার আভাস কলিকাতা থেকে প্রকাশিত 'বাংলা বিশ্বকোষে' পাওয়া যায়। মালাবারের চের দেশ বা চেরর রাজ্যের বর্ণনায় বিশ্বকোষে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ 'পুরাবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, "চেরর রাজ্যের শেষ রাজা চেরুমাল্ পেরুমাল্ ইচ্ছাপূর্বক সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ অভিলাষে মক্কা নগরীতে গমন করেন।'[২৪]

২২. পূর্বোক্ত।
২৩. পূর্বোক্ত।
২৪. বাংলা বিশ্বকোষ, চতুর্দশ খণ্ড, পৃঃ-২৩৪।

www.nagorikpathagar.org

চেররের রাজা চেরুমাল পেরুমালের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত বেশ কিছু তথ্য প্রাচীন তামিল বই-পত্রে এবং স্থানীয় লোকদের বিবরণে পাওয়া যায়। সেসব বিবরণের ভিত্তিতে শায়খ যয়নুদ্দীন তাঁর 'তোহফাতুল মোজাহেদীন' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'আরব দেশের একদল লোক জাহাজযোগে মালাবার আগমন করেছিলেন। তাঁদের প্রভাবেই রাজা চেরুমাল-পেরুমাল ইসলামে বায়আত হন। এরপর ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত লাভ করার বাসনা নিয়ে রাজা একদল লোকসহ মক্কা শরীফে পৌছেন। রাজা আল্লাহর নবীর জন্য কিছু মূল্যবান উপহার সামগ্রী নিয়ে গিয়েছিলেন। তারমধ্যে আদা এবং এ দেশে নির্মিত একটি মূল্যবান তরবারীও ছিলো। রসূল-ই করীম (সা.) সেই আদা নিজে খেয়েছেন এবং সাহাবীগণের মধ্যেও বণ্টন করে দিয়েছিলেন।

'তরবারীটি বরাবরই তাঁর সাথে ছিলো। রাজা কিছুকাল নবী-ই-করীম (সা.)-এর সাহচর্যে থাকার পর দেশের পথে রওয়ানা হন। পথে 'শাহর' নামক বন্দরে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে রাজার ইন্তেকাল হয়ে যায়। ইসলাম গ্রহণকারী এই রাজা দেশবাসীর নিকট এতই প্রিয় ছিলেন যে, এমন একটা মহৎপ্রাণ লোকের মৃত্যু হতে পারে, এ কথা যেন তারা বিশ্বাসই করতে পারলো না। ফলে তাদের মধ্যে এমন একটা বিশ্বাস প্রচলিত হয়ে গিয়েছিলো যে, ধর্মপ্রাণ সেই রাজা একদিন অবশ্যই ফিরে আসবেন।'[২৫]

রাজা চেরুমালের রাজ্য চেররে জাহাজযোগে আরবদের আগমন, তাঁদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে রাজার ইসলাম গ্রহণ ও মক্কা শরীফ যাওয়ার কাহিনী ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও বহুল প্রচলিত। তাই এ ঘটনা ভিত্তিহীন বলার সুযোগ নেই। মওলানা মুহিউদ্দীন খান উল্লেখ করেন যে, হযরত আবু ওয়াক্কাসের নেতৃত্বাধীন দলটিই হাবশা থেকে এসে এখানে কিছুকাল অবস্থান করে ইসলাম প্রচার করেছিলেন এবং তাঁর চেষ্টায় রাজা এবং আরও বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মালাবার থেকে রওনা হওয়ার পর হযরত আবু ওয়াক্কাসের দ্বিতীয় মনযিল বাংলাদেশ হওয়াই স্বাভাবিক।

আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী লিখেছেন, মিসর থেকে সুদূর চীন পর্যন্ত প্রলম্বিত সুদীর্ঘ সমুদ্রপথে আরব নাবিকগণ নৌ-পরিচালনা করতেন। মালাবার উপকূল হয়ে তাঁরা চীনের পথে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করতেন। এখানকার চট্টগ্রাম এবং সিলেটে তাঁদের বাণিজ্যবহর নোঙ্গর করতো। দীর্ঘ পথে পালেটানা জাহাজের একটানা যাত্রা সম্ভবপর ছিলো না। পথে পথে বিভিন্ন মনযিলে থেমে জাহাজ মেরামত এবং পরবর্তী মনযিলের জন্য রসদপাতি সংগ্রহ করতে হতো।[২৬] এ থেকে ধারণা করা যায় যে, মালাবার থেকে রওনা হয়ে হযরত আবু ওয়াক্কাসের জাহাজ বাংলার বন্দরে নোঙ্গর

২৫. শায়খ যয়নুদ্দীন ঃ তোহফাতুল মোজাহেদীন; মোহাম্মদ আকরম খাঁ ঃ মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসি, পৃঃ ৪৯-৫০।

২৬. সৈয়দ সুলায়মান নদভী ঃ আরবোঁকা জাহাজরানী।

www.nagorikpathagar.org

করেছিলো।

বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক মাহুয়ান জানাচ্ছেন, বর্তমান চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের মধ্যবর্তী স্থানে একটি বন্দর-নগরীতে খুব উন্নত মানের সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরী হতো। এ সব জাহাজ সমগ্র প্রাচ্য জগতে ব্যবহৃত হতো। এই বন্দরে জাহাজ মেরামতও করা হতো। দূর পথে যাতায়াতকারী প্রতিটি জাহাজ এই বন্দরে যাত্রা বিরতি করতো। হযরত আবু ওয়াক্কাসের কাফেলা বাংলার সেই বিখ্যাত বন্দরে যাত্রাবিরতি না করেই সুদূর চীনের পথে অগ্রসর হয়েছিলো, এমনটি ভাবা যায় না। মওলানা মুহিউদ্দীন খানও তাই মনে করেন যে, হযরত আবু ওয়াক্কাস ও তাঁর সাথিগণ অবশ্যই বাংলার বন্দরে যাত্রাবিরতি করেছিলেন এবং এখানে বেশ একটা যুক্তিসঙ্গত সময় পর্যন্ত অবস্থান করে তাঁরা কিছু লোককে ইসলামে বায়আত করে গিয়েছিলেন।[২৭]

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ লিখেছেন ঃ 'আরবরা মালাবারকে মা'বার বলিয়া থাকেন। উহার অর্থ, অতিক্রম করিয়া যাওয়ার স্থল–পার ঘাট। আজকালকার ভূগোলে পূর্ব ঘাট ও পশ্চিম ঘাট। যেহেতু আরব বণিক ও নাবিকরা এই ঘাট দুইটি পার হইয়া মাদ্রাজে ও হেজাজ প্রদেশে যাতায়াত করিতেন এবং মিছর হইতে চীন দেশে ও পথিপার্শ্বস্থ অন্যান্য নগরে-বন্দরে গমনাগমন করিতেন, এইজন্য তাঁহারা এই দেশকে মা'বার বলিয়া উল্লেখ করিতেন। এই নাম দুইটি হইতে ইহাও জানা যাইতেছে যে, এই দেশের সহিত তাঁহাদের পরিচয় অতি পুরাতন এবং সম্বন্ধ ছিল অতি ঘনিষ্ট। বস্তুতঃ ইছলাম ধর্ম প্রচারিত হওয়ার বহু পূর্বে বহু আরব এই দেশে আগমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বহু লোক এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়া আসিতেছিলেন। ফলতঃ স্বীকার করিতে হইবে, আরবরা এ দেশে বসবাস স্থাপনের পর তাহার পুরাতন নাম পরিবর্তিত ও নতুন আরবী নাম প্রবর্ত্তিত হওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল। ... আরব নাবিক ও বণিকগণ সদাসর্ব্বদা এই পথ দিয়া বঙ্গদেশ ও কামরূপ হইয়া চীন দেশে যাতায়াত করিতেন। এই মালাবারই ছিল তাহাদের মধ্যপথের প্রধান বন্দর। এখানকার মোহাজেরদিগের ভাষাও ছিল আরবী। সুতরাং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার ও ইছলাম ধর্মের সকল প্রকার বিবরণ যে তাঁহারা যথাসময়ে সম্যকরূপে অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আরব বণিকরাই ছিলেন হিজরীর সপ্তম শতক পর্য্যন্ত এশিয়া ও আফ্রিকায় ইছলাম প্রচারের প্রধান উদ্যোগী ও সদা সক্রিয় উপলক্ষ। আমার মতে, এই উৎসাহী ও ধর্ম্মপ্রাণ প্রচারকদিগের সংশ্রবে আসার ফলেই মালাবারের আরব মোহাজেরগণ, হজরতের জীবনকালে–খুব সম্ভব হিজরী সনের প্রথম দিকেই ইছলাম ধর্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, মালাবারের অনারব অধিবাসীদিগের মধ্যে ইছলামের প্রসার আরম্ভ হয়, ইহার কিছুকাল পরে–স্থানীয়

২৭. মুহিউদ্দীন খান ঃ বাংলাদেশে ইসলাম–কয়েকটি তথ্যসূত্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ১৯৮৮।

www.nagorikpathagar.org

রাজার ইছলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে।'[২৮]

৫. হযরত উমরের খিলাফতকালে ইসলাম প্রচার

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, মক্কায় ইসলাম প্রচারের প্রায় সাথে সাথেই বাংলায় ইসলামের আলো প্রবেশ করেছিলো। ডকটর হাসান জামান লিখেছেন ঃ 'হযরত উমরের (রা.) খিলাফতকালে (খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে) কয়েকজন প্রচারক (মু'মিন) বাংলাদেশে আসেন। এঁদের নেতা ছিলেন হযরত মামুন ও হযরত মুহায়মিন। দ্বিতীয়বার প্রচার করতে আসেন হযরত হামেদউদ্দীন, হযরত মুর্তাজা, হযরত আবদুল্লাহ ও হযরত আবু তালিব। এই রকম পাঁচটি দল পর পর বাংলাদেশে আসেন। তাঁদের সংগে কোনও অস্ত্রশস্ত্র বা বই-কিতাবও থাকত না। তাঁরা রাজক্ষমতার সাহায্যও নিতেন না। তাঁদের প্রচার পদ্ধতির একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, তাঁরা এ দেশের চলতি ভাষার মাধ্যমেই ধর্ম-প্রচার করতেন। অল্পসংখ্যক সত্যিকার মুসলমান তৈরী করা তাঁদের লক্ষ্য ছিল। এঁরা গ্রামে বাস করতেন ও সফর করে ধর্ম প্রচার করা এঁদের প্রধান কাজ ছিল। এরপর আরও পাঁচটি দল মিশর ও পারস্য থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন। এদের বলা হত 'আবিদ'। এরা বিভিন্নস্থানে 'খান্‌কা' বা প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করে ধর্ম প্রচারকার্য চালিয়ে যেতেন।'[২৯]

ডকটর হাসান জামান এ দেশে প্রথম পর্যায়ের ইসলাম প্রচারকদের কয়েকজন সম্পর্কে যে তথ্য উল্লেখ করেছেন, তার সূত্র পাওয়া যায়নি। এই তথ্য পরবর্তীতে অনেক লেখক উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু এসব প্রাথমিক পর্যায়ের ইসলাম প্রচারকের পরিচয় কি, তাঁরা কোথা থেকে কোন পথে এসেছেন, এসব তথ্যের ভিত্তি কি, সে সম্পর্কে কোন বিস্তারিত তথ্য বা তথ্যসূত্র তাঁর বইতে নেই।[৩০] অন্তত প্রথম দু'জন প্রচারক হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে অর্থাৎ ১৩ থেকে ২৪ হিজরীর মধ্যে ইসলাম প্রচার করলেও তাঁরা সাহাবী ছিলেন না বলেই মনে হয়। কেননা সাহাবীগণের পরিচিতিমূলক গ্রন্থ সুবিখ্যাত 'আসমাউর-রিজাল'-এ নাম দু'টির উল্লেখ দেখা যায় না। এ প্রসঙ্গে মওলানা মুহিউদ্দীন খান মনে করেন যে, হয়তো বা তাঁরা সাহাবীদের যুগেই এ দেশে এসেছিলেন; কিন্তু সাহাবী ছিলেন না। তাঁর মতে ডকটর হাসান জামান হযরত

২৮. মোহাম্মদ আকরম খাঁ ঃ মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পৃঃ ৪৮-৪৯।

২৯. ডকটর হাসান জামান ঃ সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য, পৃঃ ২১১।

৩০. ডকটর হাসান জামানের লেখা 'সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য' বইটির প্রথম সংস্করণ ১৯৬৭ সালে বাংলা একাডেমী থেকে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮০ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর ঢাকাস্থ ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশনার দায়িত্ব পালনকারী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের তৎকালীন পরিচালক অধ্যাপক আবদুল গফুরের কাছ থেকে বর্তমান গ্রন্থকার জেনেছেন যে, এ বইয়ের একটি সমৃদ্ধ তথ্যপঞ্জী ছিলো, যা প্রথম সংস্করণের প্রকাশকালে বাদ দেয়া হয় এবং সে তথ্যপঞ্জী হারিয়ে যায়। পরবর্তী সংস্করণে তা সংযোজন করার সুযোগ লেখকের আর হয়নি।

www.nagorikpathagar.org

মামুন ও হযরত মুহাইমেন নামক যে দু'জন প্রাথমিক যুগের প্রচারকের কথা একাধিক প্রসঙ্গ আলোচনায় উল্লেখ করেছেন, তাঁরা সাহাবী হযরত আবু ওয়াক্কাসের নিকট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোক হয়ে থাকবেন। ফলে তাঁরা সাহাবী নন, তাবেয়ী ছিলেন বলেই অনুমিত হয়।[৩১]

৬. ঊনসত্তুর হিজরীর মসজিদ

বাংলাদেশে ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের কোন নিদর্শন এ যাবত অনাবিষ্কৃত ছিলো। সম্প্রতি রংপুর শহর থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে লালমনিরহাটের সদর উপজেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের রামদাস মৌজার মজদের আড়া গ্রামে ৬৯ হিজরীতে প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে।[৩২] কারবালায় নবী-দৌহিত্র ইমাম হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাতের মাত্র আট বছরের ব্যবধানে এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের চব্বিশ বছর আগে উমাইয়া শাসনকর্তা প্রথম মারওয়ানের পুত্র আবদুল মালিকের শাসনামলের এই মসজিদ বাংলাদেশে এ যাবত প্রাপ্ত ইসলামের প্রাচীনতম নিদর্শন। 'মজদের আড়া' নামে পরিচিত ৩০ শতাংশ জমিতে একটি বাঁশ ঝাড়ের উঁচু মাটির টিলা সমতল করতে গিয়ে এ মসজিদটি আবিষ্কৃত হয়। এর গম্বুজ থেকে প্রাপ্ত ৬´´ × ৬´´ × ১ ১/৪ আকৃতির বিশেষ ধরনের ইটগুলিতে নানা প্রকার ফুল, নকশা ও আরবী হরফে কালেমা তাইয়্যেবাসহ 'হিজরী ৬৯ সন' লেখা আছে। এছাড়া ১৭ হাত দীর্ঘ ও ১৫ হাত প্রস্থের একটি দালানের ছাদের ছক মাটির নিচে দেখা যায়, যা মসজিদের ছাদ বলে মনে হয়। এ স্থানটি থেকে মাত্র দু'শ গজ দূরের প্রায় দশ গজ উঁচু প্রাচীরবেষ্টিত প্রায় এক হাজার গজ দীর্ঘ ও এক হাজার গজ প্রস্থ একটি গড় ছিলো বলে জানা যায়। এই গড়টিকে এখন আবাদি জমিতে পরিণত করা হয়েছে। গ্রামের নাম 'মজদের আড়া' আসলে 'মসজিদের আড়া'র অপভ্রংশ বলে মনে হয়। আড়া মানে ঘাঁটি, ডাঙ্গা বা কিনারা। এ মসজিদকে ঘাঁটি করে ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে এখানে একটি মুসলিম জনপদ গড়ে উঠেছিলো এবং এ অঞ্চলটি মসজিদের আড়া নামে পরিচিত হয়েছিলো বলে মনে হয়। এই স্থানটি থেকে মাত্র সিকি মাইল দূরে ফকিরের তকেয়া নামে একটি জায়গা এবং মুস্তবীর হাট নামে একটি হাট রয়েছে। এই মুস্তবীর হাট মস্ত পীর কিংবা ইসলাম প্রচারক কোন মস্ত বীরের নামে হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। মজদের আড়া গ্রামের চারদিকে তিন চার মাইলের মধ্যে অনেক প্রাচীন মাযার রয়েছে।

এসব নিদর্শন থেকে ধারণা করা যায় যে, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও খননকার্যের

৩১. মুহিউদ্দীন খান ঃ বাংলাদেশে ইসলাম–কয়েকটি তথ্যসূত্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ১৯৮৮।

৩২. দৈনিক বাংলায় ১৯৮৬ সালের ২৩শে এপ্রিল 'হিজরী ৬৯ সনের মসজিদ আবিষ্কার' শিরোনামে এ সম্পর্কে প্রথম খবর প্রকাশিত হয়। এরপর 'দৈনিক ইনকিলাব' ও 'দৈনিক সংগ্রাম' এ সম্পর্কে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। বর্তমান লেখকও উক্ত এলাকা সফর করে এ বিষয়ে আরো তথ্য অবগত হন এবং প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। বিষয়টি এখনো প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকদের বিবেচনা লাভের অপেক্ষায়।

www.nagorikpathagar.org

মাধ্যমে শুধু ৬৯ হিজরীর মসজিদ নয়, ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগের বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখানে আবিষ্কৃত হতে পারে। মসজিদটি ৬৯ হিজরীর বলে স্বীকৃতি লাভ করলে তার ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে যে, এ মসজিদ প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার শুরু হয়েছিলো এবং মুসলিম জনপদও গড়ে উঠেছিলো। এমনি ধরনের মুসলিম জনপদ এবং তাদের দীনী কার্যক্রমের কেন্দ্র হিসাবে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও সে সময় মসজিদ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না।

৭. পনেরো হিজরী সনে মুসলিম অভিযান

ভারত অভিযান সম্পর্কে রসূল (স.)-এর দু'টি হাদীস প্রাথমিক যুগের মুসলমানদেরকে এ অঞ্চলের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। নাসায়ী ও মুসনাদে আহমাদ নামক হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে সংকলিত সাহাবী হযরত সওবান বর্ণিত একটি হাদীস ঃ *'আসাবাতানি মিন উম্মাতী আহরাযা হুমুল্লাহ তায়ালা মিনান্নার, আসাবাতুন তাগযুল হিন্দ, ওয়া আসাবাতুন তাকুনু মাআ ঈসাবনি মারিয়ামা আলাইহিস সালাম।'* অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে দু'টি সেনাদলকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি দেবেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ভারত আক্রমণকারী সেনাদল আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঈসা ইব্নে মরিয়ম আলাইহিস্ সালামের সহযোগী সেনাদল। নাসায়ীতে সংকলিত অন্য একটি হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (স.) আমাদেরকে ভারত অভিযানের নিশ্চিত ওয়াদা দিয়াছেন। কাজেই সে সময় আমি জীবিত থাকলে তাতে অবশ্যই আমার ধন ও প্রাণ দান করতে কুণ্ঠিত হবো না। এতে যদি আমাকে হত্যা করা হয় তবে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদের অন্তর্ভুক্ত হবো; আর সহি সালামতে ফিরে আসতে পারলে আমি হবো দোযখমুক্ত।'[৩৩]

হযরত উমরের (রা.) খিলাফতকালে ১৫ হিজরী সনের মধ্যভাগ থেকে সিন্ধু অভিযান শুরু হয়। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ওফাতের ৩২ বছরের মধ্যে ৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে আফগানিস্তান মুসলমানদের অধীনে আসে। এ সময়ই ৬৩৬ সালে ভারতীয় জলসীমায় প্রথম মুসলিম রণতরীর আগমন ঘটে বোম্বের থানা নামক স্থানে।[৩৪] আমীর মুয়াবিয়ার শাসনকালে ৪৪ হিজরীতে সেনাপতি মুহাল্লাব ইবনে আবু সুফরী স্থলপথে সিন্ধু সীমান্ত অতিক্রম করে মুলতান ও কাবুলের মধ্যবর্তী বান্না ও আহওয়াজে পৌঁছেন। ৯৩ হিজরীতে (৭১১ খ্রীঃ) মুহাম্মদ বিন কাসিমের পাঞ্জাব ও মুলতান অভিযানকালে চার হাজার জাঠ সৈন্য তাঁর সাথি হন। বিন কাসিম পুরাতন ব্রাহ্মণাবাদ এলাকা জয় করে অগ্রসর হওয়ার সময় সাওয়ান্দারবাসীরা (তারা সবাই মুসলমান ছিলেন) বিন কাসিমের

৩৩. নাসায়ী ঃ কিতাবুল জিহাদ ও মুসনাদে আহমাদ ঃ সাওবান বর্ণিত হাদীস অধ্যায়, আবদুল মান্নান তালিব ঃ বাংলাদেশে ইসলাম, পৃঃ ৬০।

৩৪. এস. সি. রায় চৌধুরী ঃ সোশ্যাল, কালচারাল এন্ড ইকনোমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, সুরজিদ পাবলিকেশনস, দিল্লী, ১৯৪৮।

www.nagorikpathagar.org

সাথে মিলিত হন।[৩৫]

এ বিজয় সম্পর্কে ডক্টর মুহাম্মদ যাকী লিখেছেন ঃ The conquest of Sind (711 A. D.) by Muhammad bin Quasim during the Umayyid period brought the province of Sind within the orbit of the Islamic empire. It established the basis for direct and closer cultural relations.[৩৬]

৮. ভারতীয় ও আরব পণ্ডিতদের সংলাপ

উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনকালে ভারতীয় শাসক ও পণ্ডিতদের সাথে আরব মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় যোগাযোগের কথা ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন। বালাযুরী লিখেছেন যে, উমাইয়া খলিফা উমর বিন আবদুল আযীয (৭১৭-৭২০ খ্রী) ভারতীয় রাজাদেরকে ইসলাম কবুল করার দাওয়াত দিয়ে বহু-সংখ্যক পত্র লিখেন। পত্র যোগাযোগের ফলে ব্রাহ্মণাবাদের রাজা জয় সিংহ ইসলাম কবুল করেন।[৩৭] তখনকার বাংলার অবস্থা সম্পর্কে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক লিখেছেন যে, সে সময় চট্টগ্রাম এলাকায় মুসলমান আমীর বা সুলতানের অধীনে একটি ক্ষুদ্র শাসন ব্যবস্থা (Principality) কায়েম হয়েছিলো।[৩৮]

আব্বাসীয় শাসনামলে ভারতের সাথে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় যোগাযোগ আগের চেয়ে বৃদ্ধি পায়। এর কারণ ব্যাখ্যা করে ডকটর মুহাম্মদ যাকী লিখেছেন ঃ With the coming of the Abbasids to power (750 A. D.) the centre of gravity shifted from Damascus to Baghdad which stood on the Bank of the Tigris. The proximity of the Abbasid capital gave a new turn to the commercial activities of the Arabs. They penitrated into the South and established numerous colonies there. The unprecedented literary activity under the Abbasid caliphs and the establishment of *Baitul Hikma* produced vast literature on religious and secular sciences. Large number of Greek works and Indian classics on science and other subjects were translated into Arabic. Through these translations and cultural contacts between Baghdad and India, the Arabs became familier with the life and thought of the Indian people.[৩৯]

ঐতিহাসিকগণ আব্বাসীয় শাসনামলের ভারতীয় পণ্ডিত ও আরব মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে সংলাপ বা মত বিনিময়ের কথাও উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন আরব

৩৫. কে. এ. নিযামী ঃ ডক্টর মুহাম্মদ যাকী সম্পাদিত এ্যারাব একাউন্টস অব ইণ্ডিয়া গ্রন্থের ভূমিকা।
৩৬. ডক্টর মুহাম্মদ যাকী ঃ এ্যারাব একাউন্টস অব ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৬।
৩৭. বালাযুরী ঃ ফুতুহুল বুলদান, পৃঃ ৫৪১; ডক্টর মুহাম্মদ যাকী ঃ এ্যারাব একাউন্টস অব ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৫৪।
৩৮. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ঃ মুসলিম বাংলা-সাহিত্য, পৃঃ ৪।
৩৯. ডক্টর মুহাম্মদ যাকী ঃ এ্যারাব একাউন্টস অব ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৬।

www.nagorikpathagar.org

লেখকের এ সংক্রান্ত বিবরণ আলোচনা প্রসঙ্গে ডকটর মুহাম্মদ যাকী লিখেছেন ঃ 'An interesting incident about religious debate is narrated thus : During the Caliphate of Harun al Rashid, a certain Raja of India sent a message to Harun al Rashid, asking him to send a scholar of Islamic theology to acquaint him (the Raja) with Islam, and to enter into a debate with one ot the Raja's pandits.... There is another story of a learned scholar of the Buddhist religion at the court of a Raja of Sind... The Buddhist pandit had a debate with (a) Muslim scholar and yielded the palm to him... It indicates that religious discussions between the Muslims and Indian scholars were held frequently in those days and there was a genuine desire among the Indians to understand the basic principles of the Muslim faith.'[৪০]

ভারতীয় বিভিন্ন রাজার দরবারে মুসলমানগণ 'বিচারক' বা 'হুনুরমান্দ'-এর মর্যাদাপূর্ণ আসন লাভ করেছেন বলেও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন।[৪১] এসব ভারতীয় শাসক আরবদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন বলে নয় শতকের আরব বণিক সুলায়মান উল্লেখ করেছেন। তাঁদের শাসনে আরবরা পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করেছেন এবং মসজিদে নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন। আরব ঐতিহাসিকগণ তাঁদের উদারনীতির জন্য তাঁদেরকে 'আরবপন্থী মহান ভারতীয় শাসক'রূপে উল্লেখ করেছেন।[৪২] উল্লেখ্য যে, তখন ছিলো বাংলায় বৌদ্ধ শাসনের স্বর্ণযুগ।

৯. স্থল ও নৌপথে ইসলাম প্রচার

রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে আব্বাসীয় বাদশাহ হারুনুর রশীদের আমলের (৭৮৬-৮০৯) একটি মুদ্রা পাওয়া গেছে। এ মুদ্রা সে যুগের বাংলায় স্থলপথে ইসলাম প্রচারের ঐতিহাসিক প্রমাণ বহন করে। আট, নয় ও দশ শতকে নৌপথে চট্টগ্রাম উপকূল থেকে মেঘনার তীর পর্যন্ত এবং স্থলপথে রাজশাহীর পাহাড়পুর ও কুমিল্লার ময়মনামতিতে ইসলাম পরিচিতি লাভ করেছিলো।

আরব বণিকদের আগমনকালে বর্তমান চট্টগ্রাম অঞ্চল গঙ্গার মোহনার নিকটবর্তী ছিলো। চট্টগ্রাম ও সোনারগাওয়ের মধ্যে তখন সংক্ষিপ্ত নদীপথ ছিলো। পনেরো শতকের গোড়ার দিকেও সে সংক্ষিপ্ত নদীপথ বিদ্যমান ছিলো। এ পথেই চীনা পর্যটক মাহুয়ান চট্টগ্রাম থেকে নৌকাযোগে রাজধানী সোনারগাঁওয়ে গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের

৪০. Ahmad bin Yahya Murtaza : Kitab-ul-Manabah wal amal fi Sharh-e-Kitab-ul-Melal-wan-Nihal, p.31-34; Moulana Suleyman Nadvi : Religious Relations between Arabia and India; Islamic Culture, 1934, p-205-206; Doctor Muhammad Zaki : Arab Accounts of India, p. 52-54.

৪১. ডক্টর মুহাম্মদ যাকী ঃ এ্যারাব একাউন্টস অব ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৩৩।

৪২. পূর্বোক্ত পৃঃ ৩৩।

www.nagorikpathagar.org

দরবারে হাযির হয়েছিলেন। ইসলামের ব্যাপক প্রচারের যুগে পদ্মা নদী রামপুর বোয়ালিয়া (রাজশাহী শহর) পাশে রেখে চলন বিলের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চল অতিক্রম করে বর্তমান ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গার গতিপথে প্রবাহিত হতো। তারপর এ নদী ঢাকা শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ফিরিঙ্গি বাজারের কাছে মেঘনায় গিয়ে পড়তো। বুড়িগঙ্গা নাম গঙ্গার সে পুরনো গতিপথটি স্মরণ করিয়ে দেয়। এ নদী ধীরে ধীরে অনেক দক্ষিণে সরে যায়। ষোল শতকের ইংরেজ পর্যটক র‍্যালফফিচ ১৫৮৬ সালে ঈসা খাঁর শাসনাধীন সোনারগাও সফর করে লিখেছেন যে, তিনি সোনারগাও থেকে ১৮ মাইল দক্ষিণে শ্রীপুর থেকে গঙ্গা নদীপথে চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে পেগু গমন করেন। প্রাচীনকালে 'লোহিত' নামে অভিহিত বাংলার অন্যতম প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্র মধুপুরের পাশ দিয়ে মোমেনশাহী জেলার মাঝামাঝি অঞ্চল ও ঢাকার পূর্বাংশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সোনারগাওয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে লাঙ্গলবন্দে পতিত হতো। ব্রহ্মপুত্র সতেরো শতকে এই গতিপথ পরিবর্তন করে এবং ভৈরব বাজারের কাছে সুরমা ও মেঘনার সাথে মিলিত হয়। ভৈরব বাজার থেকে সন্দ্বীপের কাছে সমুদ্র পর্যন্ত এই যুক্ত স্রোতধারা মেঘনা নামে পরিচিত। ব্রহ্মপুত্রের মোমেনশাহী প্রবাহটি উনিশ শতকের মধ্যভাগে শুকিয়ে যায়। যমুনা নামে পরিচিত শাখানদীটি প্রধান নদী হয়ে দেখা দেয়। দেশের প্রধান প্রধান নদীর পুরনো প্রবাহ থেকে বোঝা যায় যে, সে যুগে বাংলাদেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের মধ্যে চমৎকার নৌ-যোগাযোগের সুযোগ ছিলো। যোগাযোগের এ সুব্যবস্থা ইসলাম প্রচারের সহায়ক হয়েছিলো।

বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান ফখরউদ্দীন মোবারক শাহের আমলে রাজধানী সোনারগাও সফরকালে বিশ্ব-বিখ্যাত ভূপর্যটক ইবনে বতুতা সোনারগাঁওকে দেখেছেন একটি প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধ বন্দররূপে। প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন পণ্য সংগ্রহের জন্য বিদেশী বাণিজ্য জাহাজ এ বন্দরে এসে ভিড়তো। ইবনে বতুতা এখানে চীন দেশীয় তলা-চ্যাপ্টা পালতোলা বাণিজ্য জাহাজ দেখেছেন জাভা যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইবনে বতুতার সফরের অনেক আগে থেকেই সোনারগাও ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ ছিলো। মিসরের পিরামিডে ফেরাউনের মমিতে প্রাপ্ত সোনারগাওয়ের মসলিন বহির্বাণিজ্যে এ অঞ্চলের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের প্রমাণ বহন করে।

১০. জনগণের ভাষায় ইসলাম প্রচার

ইসলাম প্রচারকগণ দুর্লংঘ ও অপরিচিত পথ ও পরিবেশের বাধা তুচ্ছ করে দেশের নানা স্থানে ইসলামের শিক্ষা ও প্রচারকেন্দ্র গড়ে তোলেন। স্থান থেকে স্থানান্তরে সফরের মাধ্যমে প্রধানত গ্রাম এলাকায় বাংলার জনগণের ভাষায় তাঁরা প্রচার কাজ চালাতেন। জনগণ ছিলেন নরপূজা, প্রতীক পূজা, পৌত্তলিকতাবাদ ও অবতারবাদের অভিশাপে এবং দখলদার আর্য-ব্রাহ্মণ্য শাসনে জর্জরিত। বৌদ্ধ ও অবর্ণ হিন্দু জনতা ইসলামের মানবতা ও সাম্যের আদর্শের সাথে পরিচিত হয়ে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ

www.nagorikpathagar.org

করেন। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দানের ফলে বাংলার বিভিন্ন স্থানে মুসলিম প্রধান ছোট ছোট এলাকা গড়ে ওঠে।

সে সময় হিন্দুস্থানী ভাষায় আল-কুরআন তরজমা হওয়ার কথা জানা যায়। বুযুর্গ বিন শাহারিয়ার জানান, আলোয়ারের রাজা মাহরোক বিন রাইকের অনুরোধে সিন্ধুর শাসক আবদুল্লাহ বিন উমর বিন আবদুল আযীয ২৭০ হিজরীতে (৮৮৩ খ্রীঃ) আল-কুরআনের তরজমার ব্যবস্থা করেন। আল-কুরআনের সত্যতা অনুধাবন করে রাজা ইসলাম গ্রহণ করেন।[৪৩] সমসাময়িক বাংলায় এ ধরনের কোন ঘটনা ঐতিহাসিক বিবরণীতে স্থান পায়নি, তবে এ এলাকা ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সে সময় কম অগ্রসর ছিলো না, তা পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

৪৩. বুযুর্গ বিন শাহরিয়ার ঃ আযায়েব-উল-হিন্দ; ডক্টর মুহাম্মদ যাকী ঃ এ্যারাব একাউন্টস অব ইন্ডিয়া, পৃঃ ৫১-৫২।

www.nagorikpathagar.org

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুক্তি সংগ্রামের মহানায়কেরা ঃ প্রথম পর্যায়

১. ভিত্তি গড়লেন যাঁরা

ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায়ে বাংলায় চলছিলো মাৎসান্যায় যুগ। তখন বাংলায় শক্তিশালী কোন রাজা ছিলেন না। ছোট ছোট অনেক রাজ্যে বিভক্ত ছিলো এ এলাকা। এ অবস্থার মধ্যেই এখানে মুসলমানদের স্বশাসিত বা সামাজিক শাসিত অঞ্চল গড়ে উঠতে থাকে। সাত শতকের মধ্যভাগ থেকে বারো শতকের শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় সাড়ে পাঁচশ' বছর রাজশক্তির কোন রকম পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই ইসলাম প্রচারকগণ এ জনপদে কাজ করেন। প্রচারকগণের ত্যাগ ও কোরবানীর মধ্য দিয়ে এ দেশে মুসলিম শাসনের ভিত্তিভূমি রচিত হয়। এ বিস্তীর্ণ সময়ের ইসলাম প্রচারের ইতিহাস আজ এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়। কিছু রাজ-রাজড়ার ঘটনার সাথে যুক্ত হয়ে সে অধ্যায়ের মাত্র অল্প ক'জন ইসলাম প্রচারকের ত্যাগ ও সংগ্রামের কিছু কাহিনী ঐতিহাসিকদের দ্বারা এ যাবত সংগৃহীত হয়েছে। এ দীর্ঘ সময়ে অসংখ্য আলিম, সুফী ও মুজাহিদ বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করেন। তাঁদের মধ্যে বায়েজিদ বিস্তামী (চট্টগ্রাম, মৃত্যু ৮৭৪ খ্রীঃ), সুলতান মাহমুদ বলখী মাহিসওয়ার (ঢাকা ও বগুড়া, ১০৪৭), শাহ মোহাম্মদ সুলতান রুমী (নেত্রকোনা, ১০৫৩), বাবা আদম শহীদ মক্কী (বগুড়া ও বিক্রমপুর, ১১৭৯), শাহ নিয়ামত উল্লাহ বুতশিকন (ঢাকা), শাহ মখদুম রূপোস (রাজশাহী, ১১৮৪) প্রমুখের নাম জানা যায়।

মওলানা মুহম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার আগেকার আরো ক'জন ইসলাম প্রচারকের কথা কোন তথ্যসূত্র ছাড়াই উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ '... অষ্টম কি নবম শতাব্দিতে একদল ইসলাম প্রচারক সমুদ্রপথে আরব দেশ থেকে এসে এখানে সাগর তীরে নামেন এবং কিছুকাল তথায় অবস্থান করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে নিমগ্ন হন। চট্টগ্রাম রেল স্টেশনের পাশে পাহাড়ের আশপাশে এরূপ কতিপয় নাম না জানা সেকালের আউলিয়ার মাযার আছে।... যদিও কবরের চিহ্ন আজ বিদ্যমান নেই, তবুও ঐতিহাসিক সত্য যে, শেখ আব্বাস বিন হামজাহ নিশাপুরী এই ঢাকাতেই ইসলাম প্রচার করতে করতে ২৮৮ হিজরী/৯০০ ঈসায়ী সনে ইন্তেকাল করেন। সোজা কথায়, মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার তিন শত বছর পূর্বেই ঢাকায় ইসলাম

www.nagorikpathagar.org

প্রচারিত হয়েছে। এই দশম শতাব্দিতে ঢাকায় আরো যাঁরা ইসলাম প্রচার করেন তাঁদের মধ্যে হযরত শেখ আহমদ-বিন-মুহম্মদ (মৃত ৩৪১ হিঃ ৯৫২ ঈঃ), হযরত শেখ ইসমাইল-বিন-নযন্দ নিশাপুরী (মৃত ৩৬৬ হিঃ ৯৭৫ ঈঃ) প্রমুখ রয়েছেন।'[১]

মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার আগের ক'জন ইসলাম প্রচারক সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করা হলো ঃ

২. বায়েজিদ বিস্তামী

নয় শতকের ইসলাম প্রচারক হযরত বায়েজিদ বিস্তামীর কর্মস্থল ছিলো চট্টগ্রাম। তিনি ৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে পারস্যের বিস্তাম নগরে ইন্তেকাল করেন। চট্টগ্রাম শহরের অদূরে নাসিরাবাদের এক পাহাড় চূড়ায় তাঁর স্মারক সমাধি রয়েছে। এই এলাকা সে সময় ঘন বন-জঙ্গলে পূর্ণ ছিলো। জনশ্রুতি অনুযায়ী এ দুর্গম জঙ্গলে ছিলো হিংস্র জানোয়ার ও জ্বীনদের বসবাস। বায়েজিদ বিস্তামী এ এলাকায় ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন এবং তাঁকে ঘিরে এখানে জনবসতি গড়ে উঠেছিলো।

৩. সুলতান মাহমুদ বলখী মাহিসওয়ার

মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার দেড়শ' বছর আগে ৪৩৯ হিজরীতে (১০৪৭ খ্রীঃ) মীর সাইয়েদ সুলতান মাহমুদ বলখী মাহিসওয়ার বগুড়ার অদূরে মহাস্থানে আগমন করেন। এখানেই তাঁর মাযার অবস্থিত। অনুমান করা হয় যে, তিনি ছিলেন বলখের যুবরাজ। রাজপ্রাসাদের আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে তিনি কঠোর সংযমের জীবন অবলম্বন করেন এবং ইসলামের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন।[২] তিনি তাঁর শিক্ষক দামেস্কের শায়খ তৌফিকের উপদেশে সন্দ্বীপ হয়ে সমুদ্রপথে বাংলাদেশে আসেন। তিনি হরিরাম নগর বা হরিরামপুরে (বর্তমান মানিকগঞ্জ জেলা?) উপস্থিত হলে সেখানকার কালীদেবীর উপাসক হিন্দুরাজা বলরাম তাঁকে বাধা দেন।

এ প্রসঙ্গে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক লিখেছেন ঃ শাহ সুলতান বলখী হরিরাম নগরে পৌঁছে সোজা রাজার মন্দিরে প্রবেশ করে উচ্চস্বরে আযান ধ্বনি উচ্চারণ করেন। আযানের আশ্চর্য মহিমায় কালী মন্দিরের ছোট বড় মূর্তিগুলি একের পর এক ভেংগে টুকরো টুকরো হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ কেরামতির ঘটনা রাজার কানে পৌঁছলে ভীত সন্ত্রস্ত রাজা দরবেশকে রাজ্য থেকে বিতাড়নের জন্য সেনাবাহিনী পাঠান। কিন্তু সৈন্যরা দরবেশের কোন ক্ষতি করতে ব্যর্থ হয়। এবারে রাজা বলরাম নিজেই দরবেশকে মুকাবিলা করতে এগিয়ে আসেন। যুদ্ধে রাজা নিহত হন। রাজার মন্ত্রী দরবেশের কাছে হাজির হয়ে ইসলাম কবুল করেন। দরবেশ মন্ত্রীকে সিংহাসন দান

১. মুহম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার ঃ বাংলাদেশে ইসলাম (প্রবন্ধ), দৈনিক ইকিলাব, ২৫ শে জুলাই, ১৯৮৬।
২. ডক্টর এম. এ. রহীম ঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯০-৯১।

www.nagorikpathagar.org

করেন। এভাবে হরিরামপুরে ইসলামের বিজয় সম্পন্ন হয়।[৩]

হরিরামপুরে অবস্থানকালে শাহ সুলতান মাহমুদ বলখী মাহিসওয়ার মহাস্থানের অত্যাচারী ক্ষত্রিয় শাসক পরশুরামের প্রজা-নিপীড়নের কাহিনী জানতে পারেন। তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে মহাস্থানে গমন করেন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, উল্লেখ করেন যে, মহাস্থানের রাজা পরশুরাম তাঁর আরাধ্যা দেবী কালী-করালীর মন্দিরে প্রতি বছর নরবলি দিতেন। তাঁর বোন শীলাদেবী যাদুবিদ্যা ও তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য প্রতিদিন কালীদেবীর পূজা করতেন। শীলাদেবী যাদুর সাহায্যে দরবেশকে বাধা দানের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এরপর রাজা সেনাবাহিনী নিয়ে দরবেশের মুকাবিলা করেন। যুদ্ধে রাজা ও তাঁর মন্ত্রী নিহত হন। শীলাদেবী করতোয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। দরবেশের হাতে পরশুরামের সেনাপতি ও বহু হিন্দু ইসলামে দীক্ষিত হন। পরশুরামের সেনাপতি সুরখাবের সাথে তিনি রাজকন্যা রত্নমণিকে বিয়ে দেন।[৪]

হরিরামপুরের রাজা বলরাম ও মহাস্থানের রাজা পরশুরামের সাথে সুলতান মাহমুদ বলখী মাহিসওয়ারের যুদ্ধকে ঘিরে সৃষ্ট কিংবদন্তী দরবেশের অলৌকিক ক্ষমতার কেচ্ছা-কাহিনীর বেড়াজালে কণ্টকিত। এ সম্পর্কে আবদুল মান্নান তালিব লিখেছেন ঃ '... ইসলামের ইতিহাসে এ রকম একটিও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না যে, কোনো সেনাবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া সেনাপতি একাই নিছক অলৌকিক ক্ষমতাবলে কোনো যুদ্ধ জয় করেছেন। এমন কি রসূলুল্লাহ (স.) নিজেও যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করেছেন, সেনাবাহিনীকে সুসজ্জিত করেছেন এবং সেনাদল নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। কাজেই আমাদের মতে হযরত শাহ সুলতান বলখী অবশ্যই বলরাম ও পরশুরামের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। দেশের বিক্ষুব্ধ ও হিন্দু শাসনে উৎপীড়িত এবং নিপীড়িত বৌদ্ধ, অনার্য ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু জনগোষ্ঠী তাঁর সাথে সহযোগিতা করেছিল। তাদের সশস্ত্র সহযোগিতায় তিনি এ হিন্দু রাজাদের জুলুম ও নিপীড়ন থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করেছিলেন এবং এ সংগে ইসলামের আলোকে তাদের হৃদয়দেশ আলোকিত করেছিলেন।'[৫]

ডকটর এম. এ. রহীম লিখেছেন, '... রাজা পরশুরাম অত্যাচারী ছিলেন এবং বিশেষ করে তিনি মুসলমান প্রজাদের উপর ছিলেন খুবই কঠোর। সুতরাং জনসাধারণ অসন্তোষে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। এ থেকে এইচ. বেভারিজ সিদ্ধান্ত করেন যে, মাহীসওয়ার পরশুরামের অত্যাচার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দান করেন। এমনকি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও এই গণ-বিপ্লবে যোগদান করেছিল। কিংবদন্তীতে আরও জানা যায় যে, হরপাল নামে পরশুরামের একজন ঝাড়ুদার রাজার

৩. মুহম্মদ এনামুল হক ঃ এ হিস্ট্রি অব সুফিইজম ইন বেঙ্গল, পৃঃ ২০৬-২০৭।
৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৭-২০৮।
৫. আবদুল মান্নান তালিব ঃ বাংলাদেশ ইসলাম, পৃঃ ৬৮-৬৯।

www.nagorikpathagar.org

অত্যাচারের বিষয় নিয়মিতভাবে সুফী দরবেশ মাহীসওয়ারকে সরবরাহ করত।'[৬]

হরিরামপুরের রাজা বলরাম এবং মহাস্থানের রাজা পরশুরামের বিরুদ্ধে সুলতান মাহমুদ মাহীসওয়ারের লড়াই এবং বিজয় লাভের সংক্ষিপ্ত এ দু'টি বর্ণনা থেকে ধারণা করা যায় যে, যেখানেই উৎপীড়িতদের আহাজারি, সেখানেই ছুটে গেছেন এই সংগ্রামী ইসলাম প্রচারক। হিন্দু রাজাদের অত্যাচার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। সে বিদ্রোহ গণ-বিপ্লবে পর্যবসিত হয়েছিলো এবং নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও তাঁর নেতৃত্বে সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন। হরপালের মতো ঝাড়ুদারদেরকেও মাহীসওয়ার একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন। হরপালরাও তাকে তাদের অত্যন্ত কাছের মানুষরূপে পেয়েছিলেন। এ থেকে আরো অনুমান করা যায় যে, সুলতান মাহমুদ বলখী মাহীসওয়ার বাংলার ব্যাপক এলাকার মানুষের কাছেই মুক্তিদূতরূপে পরিচিত হয়েছিলেন। এ কারণেই অত্যাচারিত জনগণ তাদের দুঃখ মোচনের জন্য এই মুক্তি সংগ্রামীর শরণাপন্ন হতেন।

৪. শাহ মোহাম্মদ সুলতান রুমী

সুলতান মাহমুদ বলখী মাহীসওয়ারের সমসাময়িক আরেকজন সংগ্রামী ইসলাম প্রচারক ছিলেন শাহ মোহাম্মদ সুলতান রুমী। বৃহত্তর মোমেনশাহীর নেত্রকোনার মদনপুর গ্রামে তাঁর মাযার রয়েছে। এ মাযারের নিষ্কর সম্পত্তির স্বীকৃতি দিয়ে ১০৮২ হিজরীতে (১৬৭১ খ্রীঃ) সম্রাট শাহজাহানের পুত্র বাংলার সুবাহদার শাহ সুজা একটি সনদ প্রদান করেন। ফার্সী ভাষায় লিখিত এ শাহী সনদে উল্লেখ আছে যে, শাহ মোহাম্মদ সুলতান রুমী ৪৪৫ হিজরীতে (১০৫৩ খ্রীঃ) তাঁর মুরশিদ সাইয়েদ শাহ সুর্খুল আনতিয়াহসহ মদনপুরে আসেন। স্থানীয় কিংবদন্তী থেকে জানা যায় যে, সে সময় এ এলাকায় একজন শক্তিশালী কোচ রাজা রাজত্ব করতেন। দরবেশ ও তাঁর সঙ্গী-সাথিগণ ছাড়া এ এলাকায় তখন কোন মুসলমান ছিলেন না। এ দরবেশের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ছিলো খুবই প্রবল। কেউ একবার তাঁর সাথে সাক্ষাত করলে ইসলামের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে মুসলমান হতো। রাজাকেও তিনি ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। দরবেশের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং আদর্শনিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে রাজা সপারিষদ ইসলাম গ্রহণ করেন। মদনপুর গ্রামটি তিনি ইসলাম প্রচারের সুবিধার্থে দরবেশকে দান করেন।[৭]

শাহ মোহাম্মদ সুলতান রুমীর সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, পাল রাজত্বের শেষ পর্যায়ে এগারো শতকের মধ্যভাগে বাংলার অমুসলিম অধ্যুষিত একটি এলাকায় ইসলামের বাণী প্রচার এবং

৬. ডক্টর এম.এ. রহীম ঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯১।
৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯০; আবদুল মান্নান তালিব ঃ বাংলাদেশে ইসলাম, পৃঃ ৬৯-৭০।

www.nagorikpathagar.org

মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে তিনি সব ধরনের বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করেছিলেন। মোমেনশাহীর সংশ্লিষ্ট এলাকায় সে সময় মুসলিম বসতি ছিলো না। তিনিই ছিলেন মোমেনশাহী এলাকায় প্রাচীনতম ইসলাম প্রচারক। অন্যদিকে সুলতান মাহমুদ বলখী বগুড়া যাওয়ার আগেই সেখানে মুসলিম বসতি গড়ে উঠেছিলো। মুসলমানদের ওপর পরশুরামের নিপীড়ন থেকে বোঝা যায়, সে মুসলিম বসতি নেহায়েত অনুল্লেখযোগ্য ছিলো না।

৫. বাবা আদম শহীদ

বাংলাদেশে সেন রাজাদের প্রচণ্ড দাপটের সময়ে মুক্তি সংগ্রামের এক বিস্ময়কর ইতিহাস সৃষ্টি করেন বারো শতকের কিংবদন্তীর নায়ক বাবা আদম শহীদ। বাংলার প্রথম যুগের অন্যান্য মুজাহিদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাঁরা একাকী অথবা মুষ্টিমেয় সংখ্যক সাথি নিয়ে এদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। ইসলামের সংগ্রামী প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে তাঁরা তৌহিদের বাণী প্রচার ও মানুষকে শৃংখলমুক্ত করেছেন। কিন্তু বাবা আদম শহীদ মক্কী রাজা বল্লাল সেনের রাজত্বকালে (১১৫৮-১১৭৯) একজন মুসলিম হজ্জযাত্রীর মুখে সেন রাজাদের নিপীড়নের কাহিনী শুনে রীতিমতো একটি ছোটখাটো বাহিনী নিয়ে বিক্রমপুর পরগণার আব্দুল্লাহপুর গ্রামে উপস্থিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশ ও আসামের বিভিন্ন এলাকায় বাবা আদম সম্পর্কিত কিংবদন্তী ও জনশ্রুতির ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন মুখে শ্রুত এ কিংবদন্তীর মূল কাহিনীতে অদ্ভূত মিল দেখা যায়। তা থেকে এ কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য প্রশ্নাতীত বলে মনে হয়।

কিংবদন্তী অনুযায়ী বাবা আদম প্রায় সাত হাজার সৈন্য নিয়ে রাজা বল্লাল সেনের প্রজা-নিপীড়নের প্রতিকার করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। বল্লাল সেন দরবেশকে বাধা দেয়ার জন্য আবদুল্লাহপুরে সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু চৌদ্দ দিনব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধে বল্লালের বাহিনী বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। 'যবনরা' তাদের কাছে অজেয় বলে মনে হয়। সেনাবাহিনীর হতাশা লক্ষ্য করে রাজা নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। বিজয় সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। পরাজয় ঘটলে 'মেচ্ছ' মুসলমানদের হাতে রাজপরিবারের মহিলাদের অমর্যাদা হবে, এই ভয়ে রাজা যুদ্ধযাত্রার আগে রাজ অন্তঃপুরে একটি অগ্নিকুণ্ড বা চিতা জ্বালিয়ে রেখে যান। তাঁর পরাজয়ের বার্তা পাওয়ার সাথে সাথে রাজ-পরিবারের মহিলারা তাতে আত্মাহুতি দিবে। পরাজয়ের বার্তা বহন করার জন্য তিনি এক জোড়া সংকেতবাহী কবুতর পোশাকের নীচে গোপনে রেখে দেন।

রাজা নিজে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পর যুদ্ধের মোড় পরিবর্তন হয়। বাবা আদমের সাথিগণ বল্লাল-বাহিনীর হামলা প্রতিরোধে ব্যর্থ হন। তাঁরা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে একের পর এক শাহাদত বরণ করেন। মুসলিম বাহিনীর সিপাহসালার বাবা আদম

www.nagorikpathagar.org

শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে এক সময় অনুভব করেন যে, তাঁরও শাহাদাতের সময় উপস্থিত। তাই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে জীবনের শেষ নামাজ আদায়ে রত হন। এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে রাজা বল্লাল সেন তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু বল্লালের শত আঘাত বাবা আদমের গায়ে সামান্য আঁচড় কাটতেও ব্যর্থ হয়। বাবা আদম এই অবস্থার মধ্যে নিশ্চিত মনে নামাজ শেষ করে নিজের তরবারিটি রাজাকে এগিয়ে দেন। সে তরবারির আঘাতেই এ মর্দে মুজাহিদ শাহাদত বরণ করেন।

বিজয়ের আনন্দে উল্লসিত রাজা প্রাসাদে ফিরে যাওয়ার আগে তাঁর শরীরের রক্ত ধোয়ার জন্য নিকটবর্তী পুকুরে নেমে পোশাক খুলতে গেলে বার্তাবাহী কবুতর দুটি উড়ে যায়। রাজা বিপদ বুঝতে পেরে প্রাসাদের দিকে ছোটেন। কিন্তু ততোক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। দুঃখে ও অনুশোচনায় রাজা নিজেও জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে মরে 'পোড়া রাজা' উপাধি লাভ করেন। স্থানীয় জনগণ রাজাকে আজো এ উপাধিতেই চিনে। অন্যদিকে অত্যাচারী রাজার হাত থেকে প্রজাদের মুক্ত করার সংগ্রামে জীবন দিয়ে বাবা আদম লাভ করেন শহীদের সম্মান।

দরবেশের রক্ত বৃথা যায়নি। তাঁর সাধনা ও আদর্শের বিজয় ঘটলো বিক্রমপুরে। সমগ্র এলাকাবাসী রাজার অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামগ্রহণ করলো। মুন্সিগঞ্জ শহরের অদূরে আবদুল্লাহপুরে বাবা আদম শহীদের মাযার এবং মাযারের অদুরে আদম শহীদের মসজিদ আজো মুক্তি সংগ্রামের এই মহান নায়কের ত্যাগ, সাহস ও সংগ্রামের সাক্ষ্য দিচ্ছে। মসজিদে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে দেখা যায় ৮৮৮ হিজরী মুতাবিক ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে জালালুদ্দীন ফতেহ শাহের রাজত্বকালে মালিক কাফুর এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্র জনসংখ্যা নিয়ে গড়ে ওঠা একটি সামান্য গ্রামে আবিসিনীয় সেনাপতি কর্তৃক এ মসজিদ নির্মাণ এ গ্রামটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের প্রমাণ বহন করে।

ডক্টর এম. এ. রহীম লিখেছেন ঃ 'বাবা আদম শহীদের মাজার এ স্থানটিকে একটি ধর্মীয় পবিত্রতা ও গুরুত্ব দান করেছে। বিভিন্ন এলাকা থেকে মুসলমানগণ এই শহীদের পবিত্র মাজার জিয়ারত করতে সমবেত হতেন। এই সমবেত মুসলমানদের নামাজ পড়ার সুবিধার জন্য ইলিয়াসশাহী সুলতানের অধীনস্থ আবিসিনীয় সেনাপতি মালিক কাফুর মসজিদটি নির্মাণ করেন। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত যে, মসজিদের চেয়ে মাজারটি অনেক বেশী পুরাতন ছিল এবং বাবা আদম শহীদ ঐ স্থানে এত বেশী সুপরিচিত ছিলেন যে, মসজিদে উৎকীর্ণ লিপিতে তাঁর নামের কোন বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন হয়নি।'[৮] বাংলাদেশে দরবেশদের মৃত্যুর পরই সাধারণত তাঁদের মাযারের পাশে মসজিদ নির্মিত হতে দেখা গেছে। কখনো কখনো শত শত বছর পরও এ ধরনের মসজিদ গড়ে উঠেছে।

৮. ডক্টর এম. এ. রহীম ঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯০।

www.nagorikpathagar.org

গোপাল ভট্টের লেখা সংস্কৃত গ্রন্থ 'বল্লাল চরিত'-এ বাবা আদমের যুদ্ধের কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর 'এ হিস্ট্রি অব সুফিইজম ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে 'বল্লাল চরিতে'র নিম্নোক্ত চরণগুলি 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন ঃ

"অথা বর্ষান্তরে প্রাপ্তে দৈব চক্রাৎ সুদারুনাৎ
বিক্রমপুর মধ্যে চ রামপাল গ্রামে তথা ॥
বায়াদুম্ নাম ম্লেচ্ছোহসৌ যুদ্ধার্থং সমুপাগতঃ।
যযৌস যুদ্ধে চ বল্লাল বিপক্ষ সম্মুখং তথা ।।
প্রণম্য মাতরং স্ত্রীভ্যো দত্তালিঙ্গন চুম্বনং।
স্ত্রিয়োহক্র বংস্তু রাজানাং বাষ্পাকুলিত লোচনৈঃ।।
যদিস্যাদ শিবং যুদ্ধে কিং নো নাথ গতিস্তদা।
ততো গদ্‌গদ্‌সৌ রাজা সংচুম্ব্যালিঙ্গৎ তাঃ পুনঃ।।
দুরাত্মা যবনাৎ ধর্ম্মং সতীত্বং রক্ষিতুং চ বৈ।
শ্রেয় মৃত্যুশ্চ যুষ্মাকং চিতাদাহেন নিশ্চিতং।।
কপোত যুগলং দূতং মমামঙ্গলসূচকং।
পূর্ব্ব প্রস্তুত চিতায়াং দৃষ্টৈবমরণং ধ্রুবং।'[৯]

উদ্ধৃত সংস্কৃত চরণগুলিতে বিক্রমপুরের রামপাল গ্রামে বায়াদুম নামক জনৈক ম্লেচ্ছের সাথে রাজা বল্লালের যুদ্ধের যে কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তার সাথে বাংলা-আসামের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা কিংবদন্তীর যথেষ্ট মিল লক্ষ্যণীয়। এখানে বায়াদুম যে বাবা আদমের বিকৃত উচ্চারণ তাতে সন্দেহ নেই। এখানে বায়াদুমের পাঁচ হাজার ম্লেচ্ছ সৈন্যের কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ডক্টর এম. এ রহীম লিখেছেন ঃ 'বায়াদুম' বাবা আদম-এর অপভ্রংশরূপে অবশ্যই গ্রহণ করা চলে এবং ম্লেচ্ছ নামটি হিন্দুরা সাধারণত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকে।[১০]

রাজা বল্লাল সেনের প্রাসাদ আজো মুন্সীগঞ্জ জেলার রামপালে বল্লাল-বাড়ি নামে পরিচিত। একটি টিলার আকারে এর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। চারদিকে দুর্গ-পরিখাবেষ্টিত একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের মধ্যে প্রাসাদটি অবস্থিত।

বাবা আদম শহীদের আগমন, তাঁর সংগ্রাম এবং তাঁর স্মৃতিবাহী মাযার ও মসজিদের সাথে আবদুল্লাহপুর নামটিও জড়িত। আবদুল মান্নান তালিব আবদুল্লাহপুর প্রসংগে লিখেছেন ঃ 'কিংবদন্তীতে বাবা আদম শহীদের আগমনের পূর্বে মুসলমান ও

৯. মুহম্মদ এনামুল হক ঃ এ হিস্ট্রি অব সুফিইজম ইন বেঙ্গল, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৭৫, পৃঃ ২১৩-২১৪।

১০. ডক্টর এম. এ. রহীম ঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮৯।

www.nagorikpathagar.org

আবদুল্লাহপুর নামের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এ কথা সত্য বলে ধরে নিলে সংগে সংগে এ কথাও মেনে নিতে হয় যে, বাবা আদম শহীদ এ এলাকায় প্রথম ইসলাম প্রচারক নন। তাঁর পূর্বে এ এলাকায় আরো এক বা একাধিক ইসলাম প্রচারক এসেছিলেন।'[১১]

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বিভিন্ন তাম্র শাসন ও অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে উল্লেখ করেন যে, বল্লাল সেন বারো শতকের শুরু থেকে ১১১৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। অপর দিকে ব্লকম্যান-এর বিবরণ উল্লেখ করে মুহাম্মদ মুজাম্মিল হক লিখেছেন যে, বাবা আদম শহীদ ১১০৬ সালে বল্লাল সেনের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। ব্লকম্যানের মতে, ১১০৬ সালে বল্লাল সেনের মৃত্যু হয়।[১২] এ সব তথ্যের ভিত্তিতে বাবা আদম শহীদ মক্কীর ইসলাম প্রচারের সময়কাল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

৬. শাহ নিয়ামতউল্লাহ বুতশিকন

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে এখানে যাঁরা ইসলাম প্রচার এবং মানুষের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করেন, শাহ নিয়ামতউল্লাহ বুতশিকন তাঁদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট নাম। তাঁর সময়কাল সঠিকভাবে আজো নির্ণীত হয়নি। তবে পণ্ডিতগণ উল্লেখ করেন যে, 'পূর্ববঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বে' তিনি বর্তমান রাজধানী ঢাকা এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন। বঙ্গভবনের উত্তরে মাত্র অল্প কয়েক গজ দূরে দিলকুশায় তাঁর মাযার এবং মাযারের পাশে পাঠান আমলে নির্মিত একটি প্রাচীন মসজিদ বিদ্যমান। কিংবদন্তী থেকে জানা যায়, মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার বহু আগে তিনি ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। সে সময় স্থানীয় প্রভাবশালী হিন্দুরা তাঁকে নানাভাবে বাধা দিতো। একদিন তিনি ইবাদতে মশগুল থাকাকালে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুরা দেব-মূর্তি নিয়ে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হয়। দরবেশের আস্তানার কাছে এসে তারা বাদ্যের আওয়াজ বাড়িয়ে দেয় এবং ভীষণ শোরগোল সৃষ্টি করে। ফলে দরবেশের ইবাদাতে ব্যাঘাত হয়। তিনি মূর্তিগুলির প্রতি রাগতভাবে আঙ্গুলের ইশারা করা মাত্র সেগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এ ঘটনায় গোলযোগকারী লোকদের মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হয়। তারা দলে দলে এসে শাহ নিয়ামতউল্লাহর কাছে ইসলাম গ্রহণ করে। কিংবদন্তীটিতে অতিরঞ্জন থাকা অস্বাভাবিক নয়। তবে তিনি যে তাঁর প্রচার কাজে যথেষ্ট সফল হয়েছিলেন এ কাহিনী থেকে স্পষ্টভাবে সে ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর আঙ্গুলের ইশারায় দেবমূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার কারণে পরবর্তীকালে তিনি 'বুত শিকন' বা মূর্তি বিনাশকারী নামে পরিচিত হন।

---

১১. আবদুল মান্নান তালিব ঃ বাংলাদেশে ইসলাম, পৃঃ ৭৬-৭৭।

১২. Blockman : Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LVii, p. 17; Muhammad Muzammil Haq : Some Aspects of the Principal Sufi orders in India, N-2, p-30.

www.nagorikpathagar.org

৭. শাহ মখদুম রূপোস

ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর অভিযানের আগে বহু ইসলাম প্রচারক বাংলায় আসেন। তাঁরা জনগণকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হন। সম্পূর্ণ বিরোধী পরিবেশে ইসলামের সত্যবাণী প্রচার করে তাঁরা এ দেশে ইসলামের দৃঢ় ভিত গড়ে তোলেন। শাহ মখদুম রূপোস তাঁদের মধ্যে একটি বিখ্যাত নাম। তাঁকে রাজশাহী এলাকার সুফী ও ইসলাম প্রচারকদের অভিভাবক বা উস্তাদ বলা হয়।

শাহ মুখদুম রূপোসের মাযারের খাদেম গোলাম আকবর ১৯০৪ সালে রাজশাহী জেলা কোর্টে দরগাহ সম্পত্তি পরিচালনা সম্পর্কিত একটি বিবৃতি দেন। তা থেকে জানা যায় যে, ১০৪৪ হিজরী (১৬৩৪ খ্রীঃ)-এর ৪৫০ বছর আগে শাহ মখদুম রূপোস জীবিত ছিলেন। সে তথ্য অনুযায়ী শাহ মখদুম ১১৮৪ খ্রীস্টাব্দে রাজশাহীতে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক লিখেছেন ঃ This date (1184 A. D.) of Shah Makhdum's life appears to be probable even if we consider it from another point of view. The traditional account of the saint, recorded above, contains most of the characteristics of traditions, now metamorphosed into legends connected with the advent of the Darwishes of the preconquest of Bengal by the Muslim Turks. This is why Makhdum Shah is still considered as thd 'Guardian Saint" of Rajshahi.[১৩]

সম্প্রতি রাজশাহীর দরবেশপাড়ার কাছে পাঠানপাড়াতে 'হজরত শাহ মখদুম সাহেবের বাঙ্গালাদেশের জীবনী তোয়ারিখ' নামে একটি প্রাচীন গদ্য গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে। বর্তমানে তা বাংলা একাডেমীতে সংরক্ষিত। উক্ত পাণ্ডুলিপির একটি সম্পাদিত রূপ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মুহম্মদ আবু তালিব প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থটির ভূমিকা থেকে জানা যায়, এটি মূল ফারসী গ্রন্থের তরজমা। মূল গ্রন্থটি ১০৭৬ হিজরীর ২২শে শাওয়াল (১৬৬৬ খ্রী) সম্রাট আওরঙ্গযীবের রাজত্বকালে রচিত হয়েছিলো। পরে জরাজীর্ণ হয়ে দলীলপত্রাদি নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিলে ১৮৩৮ সালে এই গ্রন্থটির বাংলা তরজমা করা হয় এবং এটিও মখদুম সেরেস্তায় আসল কাগজপত্রের শামিল করা হয়েছিলো।[১৪]

মূল গ্রন্থ রচনার যে পটভূমি উক্ত বাংলা গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায় তা হলো ঃ 'দিল্লীর বাদশাহ আওরঙ্গযীবের লস্কর বহর জাহাজ এই নদীপথে (পদ্মা) যাইবার সময় এই মাযার শরীফ দর্শন ও রসদ সংগ্রহার্থে জাহাজ ঐ নদীঘাটে ছিল। বাদশাহ লস্করদার মহাসমারোহে মখদুম আস্তানায় জেয়ারত ও হাজত নেয়াজ উপস্থিত করেন। মজমুন বিবরণ বাদশাহ সমীপে দাখিল করার জন্য তলব করিলে সেজরানামা ও তোয়ারিখাদি

১৩. মুহম্মদ এনামুল হক ঃ এ হিস্ট্রি অব সুফিইজম ইন বেঙ্গল, পৃঃ ২৩২।
১৪. মুহম্মদ আবু তালিব ঃ বাংলা সাহিত্যের একটি হারানো ধারা, পৃঃ ১৯।

www.nagorikpathagar.org

দৃষ্টে নিজ জ্ঞানে ও দেখা ঘটনাবলী হইতে যথাসাধ্য বৃত্তান্তসমূহের মেস্তফাক হযরত শাহ মখদুম বিবরণী বর্তমান ওয়ারিশানগণের ও খাদেমগণের দস্তখত ও মোহরযুক্ত মতে দাখিল করা গেল ও অনুরূপ অত্র নকল মখদুম সেরেস্তায় সামিল করা গেল। হিঃ ১০৭৬/২২ সোয়াল।'[১৫]

গ্রন্থটি থেকে জানা যায়, শাহ মখদুমের আগমনকালে রাজশাহী এলাকা দেবদেবীর মূর্তি ও মন্দিরে পূর্ণ ছিলো। রাজশাহী শহরের নাম ছিলো মহাকালগড়। মহাকালদেবের মন্দির থেকে এই নাম হয়েছিলো। জনশ্রুতি অনুযায়ী এখানে বহু সভ্য হিন্দু (ব্রাহ্মণ?) এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। এই গড়ের অধিপতি ছিলেন অংশুদেব চান্দভণ্ডি বর্মভোজ ও অংশুদেব খেজ্জুর চান্দ খড়্গ বর্মগুজ্জভোজ নামে দু'জন সামন্ত রাজা। প্রতি বছর এখানে নরবলি দেয়া হতো। বলি দেয়ার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ খরিদ করে কিংবা জোর করে ধরে আনা হতো। দেবরাজাদ্বয় ভগবানের অবতার সেজে বসেছিলেন। প্রজা নিপীড়নকারী এই রাজাদের অত্যাচার বন্ধ করার লক্ষ্যে এবং ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে হযরত শাহ মখদুম 'বহু দরবেশ ও মওলাং ফকিরা-গাযী' সমভিব্যাহারে 'ঐ দানবকুল ধ্বংস করার জন্য প্রেরিত' হয়েছিলেন। শাহ মখদুম বাঘা নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে পদ্মা নদীর কাছে একটি কেল্লা স্থাপন করেন। তা মখদুম নগর নামে পরিচিত হয়।

শাহ মখদুমের কেল্লাটি নির্যাতিত জনগণের আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলো। তার প্রমাণ পাওয়া যায় উক্ত গ্রন্থে উল্লেখিত একটি কাহিনী থেকে। এক নাপিতের তিনটি পুত্রের মধ্যে দুই পুত্র রাজার নির্দেশে পর পর বলি হয়েছিলো। এরপর উক্ত গরীব নাপিতের তৃতীয় পুত্রটিকেও বলি দেয়ার সিদ্ধান্ত করা হয়। এ অবস্থায় দরিদ্র নাপিত গোপনে মখদুম নগরে হাজির হয়ে শাহ মখদুমের কাছে এ অত্যাচারের প্রতিকার কামনা করে। এরপরের বর্ণনা দরবেশের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচায়ক ঃ '... মখদুম সাহেব বলেন, "যাও তোমার সন্তানসহ নদীর ধারে অবস্থান করিবে, আমার সাক্ষাৎ পাইবে।" নাপিত দম্পতি ঐ সন্তানসহ দিবারাত্রি নদীর ধারে কান্দিয়া কান্দিয়া বেড়াইতে থাকে। হতাশ হইল, রাজা (শাহ মখদুম) আসিল না। বলি হইবার পূর্বরাত্রি নাপিত-দম্পতি সন্তানসহ এক সঙ্গে পানির মধ্যে ডুবিয়া মরিবে বলিয়া পানিতে নামিতেছে। এমন সময় পদ্মাগর্ভে ভয় নাই ভয় নাই রবে কুম্ভীর বাহন মখদুম অসাধারণ রূপ ধারণে নাপিত-দম্পতির নিকট আবির্ভূত হইলেন। ভয়ে বিহ্বল দম্পতিকে অভয় প্রদানে তাহার পুত্রের গলদেশে পাক হস্ত বুলাইয়া দিলেন এবং ফুঁ দিলেন। বলিলেন, "ভয় নাই, চলিয়া যাও।" নাপিত বলে, "হে দেবতা! মুসলমান রাজা এখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন।" বলিলেন, "সেই আমি রাজা নহি। আমি মখদুম। শীঘ্রই তোমাদের দেওরাজ ধ্বংস হইয়া যাইবে। আমাকে পুনর্বার দেখিতে পাইবে। ভয় নাই, তোমার পুত্র বলি হইবে না। কোন কথা প্রকাশ করিও না, বলিয়া কুম্ভীর বাহন কুমীরে চড়িয়া

১৫. পূর্বোক্ত।

www.nagorikpathagar.org

অন্তর্ধান হইলেন।"

এর পরের কাহিনীর সার কথা হলোঃ নাপিত-পুত্রকে যথাসময়ে মহাকাল দেবের মন্দিরে নেয়া হলেও তাকে বলি দেয়া সম্ভব হয়নি। এর ক'দিন পরই মখদুম শাহের প্রেরিত ফকির-দরবেশ-গাযীগণ দেবালয় ঘিরে ফেললেন। দেবধর্মীদের সাথে যুদ্ধ শুরু হলো। সে যুদ্ধে অনেক দেবধর্মী মারা পড়লো। ফকিরগণও কয়েকজন শহীদ হলেন। দরবেশদের ঘোড়া এই যুদ্ধে শহীদ হওয়ার কারণে সে স্থান ঘোড়ামারা নামে আজো পরিচিত।

এই যুদ্ধের পর সামন্ত রাজারা দরবেশদেরকে দেশ থেকে তাড়ানোর জন্য প্রস্তুতি শুরু করলেন। সৈন্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তারা নানা স্থানে খবর পাঠালেন। স্থানে স্থানে দেব ধর্মাবলম্বীরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। শাহ মখদুম এ খবর জানতে পেরে সেই স্থানে পৃথক পৃথকভাবে ফকির-দরবেশ-গাযীগণকে প্রেরণ করলেন। শাহ মখদুম বহু 'মওলাং ফকির' সাথে নিয়ে রামপুর বোয়ালিয়ায় (মহাকালগড়) উপস্থিত হলেন। যুদ্ধে শাহ মখদুমের বাহিনীর জয় হলো। রাজা ও তাঁর পরিবার-পরিজন এবং অন্য অনেক দেব ধর্মাবলম্বী পালিয়ে গেলো। এই যুদ্ধে শাহ মখদুমের অনেক সাথি শহীদ হয়েছিলেন। তাঁদের সম্পর্কে উক্ত জীবনী গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ 'মখদুমের মাযারের চতুর্দিকে অনুমান ১৫-১৬ বিঘা জমি লইয়া কবর ও মোকবেরায় পরিপূর্ণ। ঐ কবরগুলি ... দর্শকবৃন্দের মনপ্রাণ উদাস করিয়া দিতেছে। এই কারবালা দেখিয়া ইমাম হুসায়ন (রা.) শহীদের কারবালা স্মরণ করিয়া দিতেছে।' দ্বিতীয় যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর 'দৈত্য ধর্মাবলম্বিগণ' তাদের তীর্থস্থান উদ্ধারের জন্য পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে রামপুর বোয়ালিয়ায় উপস্থিত হয়েছিলো। কিন্তু এই যুদ্ধে শায়েস্তা হওয়ার পর "দৈত্য রাজদ্বয়ের প্রকৃত ধর্মচক্ষু উন্মিলন হইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল।... দৈত্য রাজদ্বয় সপরিজনে ঈমান আনিয়া মুসলমান হইল। ইহা দেখিয়া শুনিয়া ক্রমে বিস্তর দৈত্য ধর্মাবলম্বী মুসলমান হইল...।'

'হযরত শাহ মখদুম সাহেবের বাঙ্গালাদেশের জীবনী তোয়ারিখ'-এ শাহ মখদুম রূপোসের কিছু অলৌকিক কাহিনী বা কারামতেরও উল্লেখ আছে। সেগুলি বাদ দিয়ে শুধু স্বাভাবিক মানবীয় ঘটনাগুলি বিবেচনা করলে তাতে বারো শতকের এক মহান মুক্তি সংগ্রামী জননেতার প্রতিকৃতি খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি অমিততেজ ও শৌর্য-বীর্যেরই শুধু প্রতীক নন, অসাধারণ সাংগঠনিক নৈপুণ্যেরও অধিকারী। উপরের বিবরণ থেকে অনুমান করা যায় যে, অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে তিনি তাঁর কেল্লায় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু ইসলাম প্রচারক মুজাহিদকে সমবেত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্থানীয় বহু লোকও তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলো। জন-সমর্থনের দৃঢ় ভিত্তি অর্জন ছাড়া শক্তিদর্পী রাজার বিরুদ্ধে সর্বত্যাগী ফকিরের পক্ষে এরূপ অসম যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব ছিলো না। শাহ মখদুমের এ সংগ্রাম পরবর্তী যুগের ফকির মজনু শাহ, সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী ও তীতুমীরের মুক্তি সংগ্রামেরই প্রাক-নযীর।

www.nagorikpathagar.org

হযরত শাহ মখদুম-এর কাছে দূর-দূরান্ত থেকে এসে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অনেকে নিজেদের পুরাতন আবাসে ফিরে না গিয়ে তাঁকে ভালোবেসে তাঁর আস্তানার আশপাশে বসতি গেড়েছেন। অমুসলিম সমাজ ও রাজশক্তির নির্যাতন এড়াবার জন্যও অনেকে এক স্থানে জোটবদ্ধভাবে বাস করার প্রেরণা পেয়েছেন। এভাবেই রামপুর-বোয়ালিয়ায় মুসলমানদের নিজস্ব সমাজ গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এ এলাকাটি রাজশাহী নাম ধারণ করে। হযরত শাহ মখদুম (রহ.) এখানেই ইন্‌তেকাল করেন।

www.nagorikpathagar.org

সপ্তম অধ্যায়

মুক্তি সংগ্রামের মহানায়কেরা ঃ দ্বিতীয় পর্যায়

১. মুসলিম শাসনের ভিত্তি রচনা

বাংলায় প্রথম পর্যায়ের ইসলাম প্রচারকগণ কোনও রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেননি। তাঁদের কার্যক্রমই পরবর্তীকালে এখানে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আ. ন. ম. বজলুর রশীদ লিখেছেন যে, তাঁদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা, সংগ্রাম-সংঘর্ষ, ত্যাগ ও কোরবানির মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম প্রধান ছোট ছোট এলাকা গড়ে উঠেছিলো।[১] দীর্ঘ প্রায় সাড়ে পাঁচ'শ বছর ধরে ইসলাম প্রচারক আলিম ও সুফী-দরবেশগণ ত্যাগ, সংগ্রাম ও কোরবানির মাধ্যমে মুসলিম সমাজের ভিত্তি গড়ে তোলেন। সে ভিত্তির ওপরই ১২০৩ সালে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। এ দেশের জনগণ ইসলাম প্রচারকদেরকে পেয়েছিলেন তাঁদের মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্বের ভূমিকায়। ইসলাম প্রচারকগণ জনগণের প্রত্যাশা ও সংগ্রামের মাঝে একাত্ম হতে পেরেছিলেন বলেই ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি জনগণের সমর্থন ও সহমর্মিতার দৃঢ় ভিত্তি নির্মিত হয়েছিলো। জনগণ বহিরাগত সেন শাসন উচ্ছেদকারী বখতিয়ার খিলজীকে আরেক বহিরাগত উৎপীড়ক হিসাবে দেখেননি; বরং এই মুসলিম বিজেতার মাঝে তারা দেখেছেন তাদের মুক্তিদাতার প্রতিচ্ছবি। ইসলাম প্রচারকগণই ছিলেন বাংলায় মুসলিম শাসকদের এ ইমেজ গড়ার কারিগর। এ সম্পর্কে আসকার ইবনে শাইখ লিখেছেন ঃ '... বাংলার আদি অধিবাসীর সন্তানেরা যারা আর্যদের পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে গিয়ে নির্যাতিত হয়ে আসছিল এতদিন, তারাও ইসলাম প্রচারকদের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। তারপর যখন প্রতিষ্ঠিত হল লাখনৌতির মুসলিম রাজ্য, তখন এক বহিরাগত জালেম শক্তিকে উচ্ছেদকারী অন্য বহিরাগত মুসলিম শক্তিকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে এল না কেউ। এর তো একটি মাত্রই উত্তর। চরম অত্যাচারী বহিরাগত ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনদের উচ্ছেদকারী নতুন বহিরাগত মুসলিম শক্তিকে শত্রু না ভেবে মুক্তিদাতা হিসাবেই গ্রহণ করেছিল বাংলার নির্যাতিত জনসাধারণ।'[২]

---

১. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ ঃ পাকিস্তানের সুফী সাধক, পৃঃ ৫।
২. আসকার ইবনে শাইখ ঃ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার (প্রবন্ধ), ১৯৮৯।

www.nagorikpathagar.org

বখতিয়ার খিলজীর বিজয়ের ফলে লাখনৌতিকে কেন্দ্র করে এ দেশীয় নওমুসলিম ও বহিরাগত মুসলমানদের সমন্বয়ে বাংলায় প্রথম আনুষ্ঠানিক মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার এ নব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাজ্যের সীমানা উত্তরে বর্তমান বিহারের পূর্ণিয়া শহর হয়ে দেবকোট থেকে রংপুর শহর, পুব ও দক্ষিণ-পুবে তিস্তা ও করতোয়া, দক্ষিণে গঙ্গার মূলধারা (পদ্মা) এবং পশ্চিমে কুশী নদীর নিম্নাঞ্চল থেকে গঙ্গার কিনারায় রাজমহল পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো।[৩] বখতিয়ার খিলজীর নদীয়া বিজয়ের একশ বছরের মধ্যে বাংলার প্রায় অর্ধেক এলাকায় মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। চৌদ্দ শতকের মধ্যে বাংলার প্রায় সমগ্র এলাকা মুসলিম শাসনাধীনে আসে। বাংলায় মুসলিম রাজ্য বিস্তার, মুসলিম সমাজ গঠন ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের কাজে এ সময়ও ইসলাম প্রচারকগণই প্রধান ভূমিকা পালন করেন।

২. মুসলিম শাসনামলের ইসলাম প্রচারের ধারা

১২৫৮ সালে মধ্য এশিয়ায় হালাকু খানের ধ্বংস-তাণ্ডব চলাকালে ইয়েমেন, ইরাক, ইরান ও তুর্কিস্তান এবং হিন্দুস্তানের উত্তরাংশ থেকে অসংখ্য আলিম, দরবেশ ও মুজাহিদ বাংলায় আসেন। প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনুকূল অবস্থার কারণে বাংলাকে তাঁরা কর্মস্থলরূপে বেছে নেন। ফলে এ ভূখণ্ডে ইসলাম প্রচারের এক স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। চৌদ্দ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলায় ইসলাম প্রচারের প্রবল একটি ধারা অব্যাহত থাকে। বাংলায় ইসলাম প্রচারের এই স্বর্ণযুগের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ হলেন ঃ হযরত মখদুম শাহ মাহমুদ গজনভী (মোঙ্গল কোট), হযরত জালালউদ্দীন তাবরিযী (লাখনৌতি ও পাণ্ডুয়া, ১২১৬), হযরত মাহমুদ শাহ দৌলাহ শহীদ (শাহজাদপুর, ১২৪০-৭০), শাহ তুরকান শহীদ (বগুড়া), মওলানা তকীউদ্দীন আরাবী (রাজশাহী, ১২৫০ সালের মধ্যে), শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (সোনারগাঁও, ১২৭৮), শায়খ শরফউদ্দীন ইয়াহিয়া মানেরী (সোনারগাঁও, ১২৭৮), শাহ সুফী শহীদ (হুগলী, ১২৯০), জাফর খাঁ গাযী (উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিম বংগ, ১২৯৮), সৈয়দ নাসিরউদ্দীন শাহ নেকমর্দান (দিনাজপুর, ১৩০২), শাহ জালাল (পূর্ব বংগ ও আসাম, ১৩০৩), সৈয়দ আহমদ কল্লাহ শহীদ (বৃহত্তর কুমিল্লা ও নোয়াখালী, ১৩০৩), সৈয়দ আহমদ শাহ তান্নুরী ওরফে মীরান শাহ (লক্ষ্মীপুর, ১৩০৩), মওলানা আতা (দিনাজপুর, ১৩০৫-৫০), মখদুম শাহ জালালউদ্দীন জাহাঁগাশত বুখারী (রংপুর, ১৩০৭), সাইয়েদ আব্বাস আলী মক্কী ও রওশন আরা (চব্বিশ পরগনা ও খুলনা, ১৩২৪), শায়খ আখি সিরাজউদ্দীন (গৌড় ও পাণ্ডুয়া ১৩২৫), শায়খ আলাউল হক (পাণ্ডুয়া, ১৩২৫), সাইয়েদ আশরাফ জাঁহাগীর সিমনানী, শায়খ হোসাইন যোক্করপোশ ও শায়খ বদরুল ইসলাম শহীদ (পাণ্ডুয়া ১৩২৫), শাহ মোল্লাহ মিশকিন, শাহ নূর, শাহ আশরাফ

৩. যদুনাথ সরকার ঃ হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২-১৩।

www.nagorikpathagar.org

কাবুলী, শাহ বান্দারী শাই ও শাহ মোবারক আলী (চট্টগ্রাম, ১৩৪০), সাইয়েদ রিযা ইয়ামানী (উত্তর বংগ, ১৩৪২-১৩৫৮), রাসতি শাহ ও শাহ মুহাম্মদ বাগদাদী (কুমিল্লা ও নোয়াখালী, ১৩৫১-১৩৮৮), শায়খ নূর কুত্‌ব -উল-আলম, শায়খ আনোয়ার শহীদ, শায়খ জাহিদ (উত্তর ও পূর্ব বংগ, ১৩৫০-১৪৪৭), সাইয়েদুল আরেফীন (পটুয়াখালী, ১৩৫০ থেকে ১৪০০ সালের মধ্যে), শাহ লংগর (ঢাকা ১৪০০ সালের আগে), শায়খ যায়নুদ্দীন বাগদাদী ও চিহিল গাজী (রংপুর-দিনাজপুর, চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি), খান জাহান আলী (যশোর-খুলনা-বরিশাল, ১৪৩৭-১৪৫৮), বদরুদ্দীন বদরে আলম শাহিদী ও শাহ মজলিস (১৪৪০), শায়খ হুসামউদ্দীন মানিকপুরী (১৪৭৭), হাজী বাবা সালেহ (নারায়ণগঞ্জ, পনেরো শতকের শেষভাগ), শাহ সাল্লাহ (সোনারগাঁও, ১৪৮২-১৫০৬), শাহ আলী বাগদাদী (ফরিদপুর ও ঢাকা, ১৪৮৯), একদিল শাহ (চব্বিশ পরগনা, ১৪৯৩-১৫১৯), শাহ মুয়াজ্জাম হোসাইন দানিশমান্দ (রাজশাহী, ১৫১৯-১৫৪৫), শাহ জামাল (জামালপুর, ১৫৫৬-১৬০৬), হাজী বাহরাম সাক্কা (পশ্চিম বংগ), খাজা শরফউদ্দীন চিশতী (ঢাকা, ১৫৫৬-১৬০৬) প্রমুখ।

৩. মুসলিম শাসনামলের ইসলাম প্রচারের বৈশিষ্ট্য

এগারো শতক থেকে আঠারো শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সাড়ে সাতশ বছর। এ বিস্তীর্ণ সময়কাল ধরে এদেশে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন আলিম, সুফী-দরবেশ ও মুজাহিদগণ। কোন কোন ইসলাম প্রচারকের মধ্যে এই তিনটি বৈশিষ্ট্যেরই সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। আলিমগণ বিভিন্নস্থানে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করে ইসলাম প্রচার এবং ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা চালাতেন। মুসলিম শাসনের প্রথম দু'শ-আড়াইশ বছর পর্যন্ত বাংলায় বহু খ্যাতিসম্পন্ন আলিম ও মুহাদ্দিসের পদচারণা লক্ষ্য করা যায়। এ যুগে বিপুল সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং দেশ-বিদেশের শিক্ষার্থীগণ বাংলার এ শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে সমবেত হয়ে ইসলামী নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

ইসলাম প্রচারক সুফী-দরবেশগর্ণ অনেকেই দলে দলে এ দেশে এসেছেন। দু'চার জন ছাড়া তাঁরা সবাই এখানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছেন। মুসলিম বিশ্বের তৎকালীন শিক্ষা-ব্যবস্থার কারণে তাঁরা বিভিন্ন ইসলামী শাস্ত্রে পারদর্শী, সমরকুশলী ও রাজনৈতিক যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। অত্যাচারী শাসক ও সামন্ত রাজাদের বিরুদ্ধে তাঁরা অনেকে প্রত্যক্ষ জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই সম্মুখযুদ্ধে কেউ হয়েছেন গাযী, আবার কেউ শহীদ হয়েছেন। তাঁরা জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে মজলুম মানুষের পক্ষ হয়ে লড়াই করেছেন। সাধারণ মানুষ মুক্তির এ সংগ্রামে তাঁদের পিছনে কাতারবন্দী হয়েছেন। বাংলার বড় বড় শহর তো বটেই, এমন কোন ছোট শহর ও গ্রাম ছিলো না,

www.nagorikpathagar.org

যেখানে ইসলাম প্রচারকদের আগমন ঘটেনি। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় এ সব সংগ্রামী সুফী-দরবেশের মাযার রয়েছে। জনগণের মুক্তি সংগ্রামে তাঁরা কেউ হয়েছেন শহীদ, আবার কেউ হয়েছেন গাযী।

মুজাহিদগণ মুসলিম শাসকদের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে মুসলিম রাজ্য বিস্তারে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছেন। ইসলাম প্রচারই ছিলো তাঁদের জীবনের প্রকৃত মিশন। তাঁরা সেনাবাহিনীর সহায়তায় যুদ্ধ করে নগর ও অঞ্চল জয় করে সেখানে ইসলাম প্রচারে ব্রতি হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ইসমাইল গাযী মক্কী, জাফর খাঁ গাযী ও খান জাহান আলীর মতো ইসলাম প্রচারকগণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইসলাম প্রচারক আলিম, সুফী-দরবেশ ও গাযীগণ বাংলার সাধারণ মানুষের ভাষায় ইসলামের দাওয়াত প্রচার করেছেন। তাঁরা অধিকাংশই বাস করতেন গ্রামে। বিভিন্নস্থানে প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করে, এক এলাকা থেকে অন্য এলাকা সফর করে তাঁরা মানুষকে দীনের দাওয়াত দিতেন। মুসলিম সমাজের সুষ্ঠু সংগঠন, বলিষ্ঠ চরিত্র ও উন্নত আদর্শের কারণে আশপাশের সমাজের ওপর তার প্রভাব পড়তো। ইসলাম প্রচারকগণ বাংলার জনগণের নৈতিক ও মানসিক উন্নতি বিধানে, তাদের মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের চরিত্র ও নৈতিক শক্তি, মানুষের প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম দরদ ও ভালোবাসা সকল স্তরের জনগণকে বিপুলভাবে আকৃষ্ট করেছে। তৎকালীন সমাজ মুখ্যত গোষ্ঠীভিত্তিক ছিলো। তাই কোন বৌদ্ধ বা হিন্দু সমাজপতি ইসলাম গ্রহণ করলে সমাজের অন্য লোকেরাও তাঁর সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করতো।

আর্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণাশ্রম প্রথার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার চাইতেও ইসলামী আদর্শের ইতিবাচক প্রভাব বাংলায় দ্রুত ইসলাম বিস্তারের মুখ্য কারণ ছিলো। জাতিভেদ প্রথা বাংলার চাইতেও দক্ষিণ ভারতে অনেক বেশী সংগঠিত। অথচ সেখানে ইসলামের বিস্তার ঘটেছে বাংলার তুলনায় অনেক কম। আলিম, সুফী-দরবেশ ও মুজাহিদদের প্রচারমূলক কাজ বাংলায় অনেক বেশী সংগঠিত ছিলো। শাহ মখদুম রূপোস, মখদুম শাহ দৌলাহ শহীদ, জালালউদ্দীন তাবরিযী, আখি সিরাজ, আলাউল হক, নূর কুত্ব উল আলমসহ অসংখ্য ইসলাম প্রচারকের সংস্পর্শে এসে উত্তরবংগের বিপুল সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। শাহ জালাল সিলেটসহ আসামের বিস্তীর্ণ এলাকার লোককে ইসলামের ছায়াতলে আনেন। খান জাহান আলীর চেষ্টায় খুলনা-যশোর এলাকায় ইসলামের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী এলাকা মুসলিম শাসনাধীনে আসে চৌদ্দ শতকের শেষভাগে। অথচ তার আগেই ইসলাম প্রচারকদের চেষ্টায় এ অঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তেরো শতকের শেষ ভাগে মুসলিম শাসকদের দ্বারা সোনারগাও ও বিক্রমপুর বিজিত হয়। কিন্তু তার অনেক আগেই এ এলাকায় ইসলামের প্রসার ঘটে। তেরো শতকের সত্তর দশকে শায়খ

www.nagorikpathagar.org

শরফউদ্দীন আবু তাওয়ামা সোনারগাঁয় সে যুগের বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে শিক্ষার্থীরা আসতেন জ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যে। এ তথ্য নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, মুসলিম বিজয়ের বহু আগেই এ অঞ্চল ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

৪. ইসলাম প্রচারকদের রাজনৈতিক ভূমিকা

ইসলাম প্রচারকগণ বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার-প্রসার ছাড়াও মুসলিম রাজ্য বিস্তার, রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি বিধান প্রভৃতি ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা কখনো নিজেরা, কখনো সেনাপতি বা সেনাদলের সহায়তায় বাংলার শেষসীমা পর্যন্ত মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করেছেন। ইসলাম-প্রচারকগণ অনেকেই ইসলামী শাসন-সীমা বিস্তার এবং অত্যাচারী রাজা ও জমিদারদের এলাকায় জনগণকে জুলুম-নির্যাতনের হাত থেকে মুক্ত করতে মুসলিম শাসনকর্তা ও সেনাপতিদের সাথে যোগদান করেন। তাঁদের অংশগ্রহণের ফলে মুসলিম বাহিনীতে অপরাজেয় নৈতিক শক্তি ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছিলো।

মুজাহিদ দরবেশ জাফর খাঁ গাযী ও শাহ সফিউদ্দীন সাতগাঁওয়ের হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এ অঞ্চল মুসলিম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। শাহ জালাল ও তাঁর সাথিগণ সিলেটের হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে সিকান্দার শাহের মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলে যুদ্ধ করে সেখানে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহের সেনাপতি খান জাহান আলী খুলনা ও যশোরের দুর্গম অঞ্চল মুসলিম শাসনাধীনে আনেন। রুকনউদ্দীন বারবক শাহের আমলে বিখ্যাত দরবেশ ইসমাইল গাযী মক্কী উড়িষ্যার রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মান্দারন জয় করেন। কামরূপের হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে লড়াইয়েও তিনি সাফল্য অর্জন করেন এবং রাজাকে বাংলার সুলতানের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করেন।

ইসলাম প্রচারক আলিম ও সুফী-দরবেশগণ মুসলিম শাসকদেরকে রাষ্ট্রীয় কাজে পরামর্শ দিতেন। মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজের বিপদের সময় জনগণের স্বাধীনতা ও ঈমানের হেফাজতের ব্যাপারেও তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ আলিম শায়খ আলাউল হক ইলিয়াস শাহী শাসকদেরকে রাষ্ট্র পরিচালনায় ভ্রান্ত নীতি অনুসরণের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন। সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহকে সতর্ক করে চিঠি লিখেছিলেন মওলানা মুজাফফর শামস বলখী। তাঁদের সে সতর্কবাণী রাজনৈতিক দূরদর্শিতামূলক ছিলো, পরবর্তী ইতিহাস তার প্রমাণ বহন করে। সে সতর্কবাণী অনুযায়ী যথাসময়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে রাজা গনেশের অভ্যুত্থান সম্ভব হতো না। রাজা গনেশের মুকাবিলায় নূর কুত্ব-উল-আলম ও অন্যান্য ইসলাম প্রচারকই ঐক্যবদ্ধ সফল প্রতিরোধ গড়ে তুলে মুসলিম রাজত্ব

www.nagorikpathagar.org

পুনরুদ্ধার করেছিলেন।[৪]

৫. শিক্ষা বিস্তারে প্রচারকদের ভূমিকা

বাংলায় শিক্ষা বিস্তারে ইসলাম প্রচারকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। গৌড়, পাণ্ডুয়া, দরসবাড়ি, রংপুর, রাজশাহী, মুরশিদাবাদ, চট্টগ্রাম, সোনারগাঁও, ঢাকা ও সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁরা বহু বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সোনারগাওয়ে শেখ শরফউদ্দীন আবু তাওয়ামার মাদ্রাসায় মখদুম শাহ শরফউদ্দীন ইয়াহিয়া মানেরীর মতো ভারত-বিখ্যাত মনীষীগণ শিক্ষালাভ করেন। এ ছাড়া উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানের এমনকি বাইরের জ্ঞান-পিপাসু বহু লোক এখানে জমায়েত হতেন নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য। পাণ্ডুয়ায় শায়খ আলাউল হকের মাদ্রাসায় মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী, শায়খ নাসিরউদ্দীন মানিকপুরী, শায়খ হোসেন যোক্করপোশ এবং উত্তর ভারতের বহু বিখ্যাত আলিম শিক্ষালাভ করেন। ইসলাম প্রচারক আলিমগণের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায়, জনসাধারণের অর্থানুকূল্যে এবং মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠান বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশের কেন্দ্ররূপে কাজ করেছে। মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট মক্তবগুলিতে কুরআন শিক্ষা ছিলো অপরিহার্য। সুফীদের প্রতিষ্ঠিত খানকাহগুলি হিন্দু-মুসলমান সকলের মিলনকেন্দ্র এবং ধর্মীয় ও অন্যান্য ব্যাপারে খোলাখুলি ও নিয়মিত আলোচনার কেন্দ্র ছিলো। বাংলার এই বর্ণাশ্রমভিত্তিক জনপদে সার্বজনীন শিক্ষার ধারণা ইসলাম প্রচারকগণই প্রথম তুলে ধরেন। ইংরেজদের শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় প্রতি তিনশ লোকের জন্য একটি করে আশি হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু ছিলো, একথা ম্যাক্সমুলার উল্লেখ করেছেন।[৫]

৬. প্রচারকদের মানবসেবার আদর্শ

ইসলাম প্রচারক সুফী-দরবেশদের খানকাহগুলির তিনটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ এ খানকাহগুলি ছিলো ইসলামের মুক্তিবাণী প্রচারের কেন্দ্র। দ্বিতীয়তঃ এ খানকাহগুলি ছিলো নির্যাতিত জনগণের আশ্রয়কেন্দ্র। তৃতীয়তঃ প্রতিটি খানকাহর সাথে লঙ্গরখানা চালু ছিলো। খানকাহ ও লঙ্গরখানাগুলি দুঃস্থ ও বিপন্ন মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলো। এসব খানকাহর মাধ্যমে দুঃখী সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে এসে ইসলাম প্রচারকগণ জনগণের আশা-আকাংখার সাথে পরিচিত হতে পেরেছিলেন। বাংলার সাধারণ ও দরিদ্রশ্রেণীর লোকদের জন্য ইসলাম প্রচারকগণের সেবামূলক কার্যক্রমের পরিসর ছিলো অত্যন্ত ব্যাপক। এমনও দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, কোন কোন প্রচারক তাঁদের

৪. রাজা গনেশের বিরুদ্ধে নূর কুতুব-এর প্রতিরোধ সংগ্রাম সম্পর্কে অষ্টম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।
৫. ডক্টর এ. কে. এম. আইয়ুব আলী ঃ হিস্ট্রি অব ট্রাডিশনাল ইসলামিক এডুকেশন ইন বাংলাদেশ।

www.nagorikpathagar.org

লঙ্গরখানার নামেই পরিচিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে নারায়ণগঞ্জের বিখ্যাত ইসলাম প্রচারক শাহ্ লঙ্গরের নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি একটি বড় লঙ্গরখানা পরিচালনা করতেন। তাই দুঃখী মানুষের একান্ত আপনজনরূপে শাহ্ লঙ্গর নামের আড়ালে তাঁর আসল নামটি আজ বিস্মৃত।

ইংরেজ লেখক ব্লকম্যান উল্লেখ করেন যে, উত্তর বংগের বিখ্যাত ইসলাম প্রচারক জালালউদ্দীন তাবরিযী অভাবী ও মুসাফিরদের জন্য একটি লঙ্গরখানা পরিচালনা করতেন।[৬] এভাবে সাধারণ মানুষের হৃদয় জয় করে তিনি একাধারে প্রায় ২৩ বছর ইসলাম প্রচার করেন এবং বাংলার হাজার হাজার মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। তাঁর ব্যাপক ইসলাম প্রচারের ফলে মুসলিম সমাজের পরিধি বিস্তৃত হয়। এ অঞ্চলে মুসলিম শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করতেও তা সহায়ক হয়। পাণ্ডুয়ায় প্রতিষ্ঠিত তাঁর খানকাহ নব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সমাজের ভিত্তি সংহত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাঁর এ খানকাহ ছিলো তৎকালীন বাংগালী মুসলিম সমাজের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্র।[৭]

নিজামউদ্দীন আউলিয়ার খলিফা ও শায়খ আলাউল হকের উস্তাদ শায়খ আখি সিরাজ লাখনৌতিতে একটি খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেটি ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও যাবতীয় মানবসেবামূলক কাজের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলো। তাঁর খানকায় অসহায় দীন-দুঃখী, বৃদ্ধ ও দুঃস্থ মানুষ আশ্রয় লাভ করতো। এ খানকাহগুলি দাতব্য চিকিৎসালয় ও অনাথ আশ্রয় হিসেবে ভূমিকা পালন করতো। আখি সিরাজ একটি লঙ্গরখানাও প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে গরীব, ক্ষুধার্ত, ভিক্ষুক ও ফকির-দরবেশগণ সব সময় খাবার পেতেন।

শায়খ আলাউল হক লঙ্গরখানার জন্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতেন। তৎকালীন সুলতান সিকান্দার শাহ তাঁর এই দানশীলতাকে হিংসার চোখে দেখতেন। অথচ শায়খ আলাউল হক বলতেন, লোকদের খাওয়াবার জন্য তাঁর শিক্ষক আখি সিরাজ যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতেন, তিনি তার দশভাগের একভাগও করেন না।[৯]

মানবসেবাকে তৎকালীন ইসলাম প্রচারকগণ সবচে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। নূর কুত্ব-উল আলমের একটি ঘটনা থেকে এ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যায়। নূর-কুত্ব-এর দীক্ষা শুরু হয়েছিলো তাঁর বিজ্ঞ পিতা শায়খ আলাউল হকের তত্ত্বাবধানে। নূর কুত্ব ফকির-মিসকিনের কাপড় ধুতেন, তাদের অযুর পানি গরম করতেন, খানকাহ ঝাড়ু দিতেন এবং খানকাহ সংলগ্ন পায়খানা সাফ করতেন। একজন রুগ্ন

৬. ব্লকম্যান ঃ কন্ট্রিবিউশন টু দি জিওগ্রাফী এন্ড হিস্ট্রি অব বেঙ্গল।
৭. আবদুল মান্নান তালিব ঃ বাংলাদেশে ইসলাম, পৃঃ ৮৪।
৮. ডক্টর এম. এ. রহীম ঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১২৩।
৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৩-১২৪।

www.nagorikpathagar.org

ভিক্ষাজীবী ফকিরকে পায়খানায় যেতে সাহায্য করার সময় একদিন তাঁর কাপড় ও শরীর মল লেগে অপবিত্র হয়ে যায়। তাঁর পিতা এ সেবার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে লঙ্গরখানার জন্য জ্বালানী কাঠ বহনের দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। এটি ছিলো কঠোর পরিশ্রমের কাজ। এ কাজ ছেড়ে দিয়ে রাজ দরবারে চাকুরী নিয়ে ঐশ্বর্যময় জীবন যাপনের জন্য তাঁকে আহবান জানানো হয়। কিন্তু নূর কুত্‌বের কাছে দরবারের জাঁকজমক অপেক্ষা খানকা হতে জ্বালানী কাঠ বহন শ্রেয়তর ছিলো। তাই তিনি রাজ দরবারের চাকুরীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।[১০]

এ ধরনের কঠোর সাধনা ও জনসেবার মাধ্যমে ইসলাম প্রচারকগণ দেশের সাধারণ মানুষের কাছের মানুষ ও আপন জন হতে পেরেছিলেন।

৭. শাসক ও জনগণের মধ্যে যোগসূত্র

দেশের সাধারণ মানুষের সাথে ইসলাম প্রচারকদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিলো। ফলে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা ও আশা-আকাংখা সম্পর্কে জানা ও বোঝার তাঁদের স্বাভাবিক সুযোগ ছিলো। এ কারণে তাঁরা শাসক ও জনগণের মধ্যে যোগসূত্ররূপে ভূমিকা পালন করতে পেরেছেন। ইসলাম প্রচারক আলিম ও সুফী-দরবেশগণ তাঁদের বিভিন্নমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে মুসলিম শাসনের প্রতি জনগণের নৈতিক সমর্থনের শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তুলেছেন। সে ভিত্তিকে টিকিয়ে রাখতেও তাঁরা নিরন্তর কাজ করেছেন। ফলে দেশের বিপুল সংখ্যক ভিন্‌ধর্মীর ওপর দীর্ঘ সাড়ে পাঁচশ বছরের মুসলিম শাসন সম্ভব ও সহজ হয়েছে।

ইসলাম প্রচারকদের অবদানের আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক সাইয়েদ হাসান আশকারী উল্লেখ করেন যে, তাঁরা শাসক কিংবা আমীর-ওমরাহদের কাজ-কর্মের সাথে একাকার হন নি; কিন্তু শাসক ও উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের সাথে তাঁদের অনেকেরই এমন একটা সম্পর্ক ছিলো, যার ফলে তাঁরা শাসকদের মধ্যে সৎকর্মশীলতার গুণাবলী সৃষ্টি করতে পেরেছেন। ইসলাম প্রচারকদের প্রভাবে শাসকদের কার্যক্রম সাধারণ মানুষের কল্যাণে অনেক বেশী নিয়োজিত হতে পেরেছিলো। দীর্ঘস্থায়ী ব্রাহ্মণ্যবাদী নির্যাতন ও শোষণমূলক শাসন ব্যবস্থার যাঁতাকলে নিষ্পেষিত বাংগালীদেরকে ইসলাম প্রচারকগণ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে মুক্ত করেছেন। তাঁরা তাদেরকে স্বাধীন, উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবনের পথে পরিচালিত করেছেন। ইসলাম প্রচারকগণ শুধু মুক্তির বাণীবাহক ছিলেন না, তাঁরা বৈদিক শাস্ত্র-শাসনের পাষাণ ভারাক্রান্ত এ নিস্পন্দ জনপদে জীবনের গতিবেগ সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

---

১০. মওলানা আবদুল হক দেহলভী ঃ আখবার আল আখিয়ার, পৃঃ ৫২; ডক্টর এম. এ. রহীম ঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১২৮।

www.nagorikpathagar.org

৮. ইসলাম প্রচার ও বাংলার মুসলিম জনসংখ্যার প্রকৃতি

বাংলায় শাসকদের তরবারীর ছায়াতলে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ইসলামের ব্যাপক বিস্তারে প্রচারকদের ভূমিকাই এখানে মুখ্য ছিলো। এ সম্পর্কে ডক্টর আরনল্ড লিখেছেন ঃ 'ইসলামে জাতিভেদের বালাই নেই। তাই অগণিত হিন্দু স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণে আকৃষ্ট হয়েছিলো। ভারতীয় বহু লক্ষ মুসলমানের ধর্মান্তরগ্রহণে বল প্রয়োগের কোন কারণ ছিলো না। শান্তিপ্রিয় প্রচারকদের শিক্ষায় তারা সহজে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। আমরা বিশেষভাবে দেখেছি, ইসলামের সর্বাপেক্ষা স্থায়ী ও ফলপ্রসূ বিজয় হয়েছে সে সময়ে ও সে সব ক্ষেত্রে, যখন মুসলিম রাষ্ট্রশক্তি দুর্বল ছিলো ও যেখানে রাজশক্তির প্রভাব অনুভূত হয়নি। যেমন দক্ষিণ ভারতে ও পূর্ব বাংলায়। ধর্মান্তরের বিপুল সংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশেই মুসলিম প্রচারকগণ সবচে বেশী সফল হয়েছিলেন। বাংলাদেশে প্রচারক্ষেত্রে ইসলাম কোন শক্তিশালী অন্য ধর্মের মুকাবিলায় পড়েনি। উত্তর-পশ্চিম ভারতে সদ্য বৌদ্ধ ধর্মের উৎখাতকারী শক্তিশালী ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো ইসলামকে। কিন্তু বাংলাদেশে জাতিত্বের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হিন্দুরা মুসলমান ধর্ম প্রচারকগণকে দু'বাহু বাড়িয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এভাবে ইসলাম বিনা বাধায়, এমনকি সাদর আহবানে অভিনন্দিত হয়ে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো ভারতের সর্বাপেক্ষা উর্বর ও জনবহুল এ প্রদেশে। এখানকার ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ধারক ও বাহক উচ্চ বর্ণহিন্দুর উৎপীড়ন, অবজ্ঞা ও অমানুষিক ব্যবহারে উত্যক্ত সাধারণ হিন্দুরা ইসলাম ও তার অনুসারীদের মাঝে সাম্য-মৈত্রীর একটা মহৎ ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করেছিলেন; একটা মহৎ ঐশীবাদের সন্ধান এবং একটা জীবন্ত ও প্রাণবন্ত নয়া সমাজ-ব্যবস্থার সাক্ষাত লাভ করেছিলেন।'[১১]

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে হেনরী বেভারিজ দেখিয়েছেন যে, মুসলিম শাসনকেন্দ্র থেকে দূরের এলাকাগুলিতেই মুসলমানদের সংখ্যা বেশী ছিল। ১৮৭২ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম জনসংখ্যা জরিপ থেকে দেখা যায়, বাকেরগঞ্জ, ত্রিপুরা, রংপুর ও মোমেনশাহীর দুই তৃতীয়াংশ এবং দিনাজপুর, নদিয়া, যশোর ও ফরিদপুরের অর্ধেকের বেশী মুসলমান। ঢাকায় মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর তুলনায় সামান্য বেশি। মালদহ ও মুরশিদাবাদে মুসলমানের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৬ ভাগ ও ৪৫ ভাগ। অন্যদিকে রাজশাহীতে ৭৭ ভাগ এবং চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীতে ৮০ ভাগেরও বেশী মুসলমান। মুসলিম শাসকদের দ্বারা কয়েক'শ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা শহরে তখন মুসলমানের সংখ্যা ছিলো ৩৪,২৭৫ আর হিন্দুর সংখ্যা ৩৪,৪৩৩ জন। অন্যদিকে ঢাকার গ্রাম এলাকায় হিন্দু ছিলো আট লাখ আর মুসলমান ছিলো দশ লাখেরও বেশী।[১২]

১১. ডকটর আরনল্ড ঃ প্রিচিং অব ইসলাম, নবম অধ্যায়।
১২. হেনরী বেভারিজ ঃ ডিস্ট্রিক্ট অব বাকেরগঞ্জ, পৃঃ ২২১।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশে মুসলিম ধর্মান্তর রাজশক্তির জোরে হলে মুসলিম শাসকদের কেন্দ্রস্থল মুরশিদাবাদ, বরহমপুর, মালদহ ও শহর-ঢাকার জনসংখ্যার চিত্র এ থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়ার কথা ছিলো।

বাইরে থেকে মুসলমানদের বিপুল সংখ্যায় আগমন এবং মুসলমানদের দ্রুত জন্মহারও এ দেশে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপাদানরূপে কাজ করেছে। বহিরাগত মুসলমানদের বিরাট অংশ ছিলেন ইসলাম প্রচারক আলিম ও সুফী-দরবেশ। তাঁরা এসেছেন বিরাট সংখ্যায় এবং দলে দলে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রবেশ করে স্থায়ী বসতি স্থাপন ও ইসলাম প্রচার করে সেখানেই তাঁরা সমাহিত হয়েছেন। বাংলার সকল লোকালয়ে ইসলাম প্রচারকদের আগমন ঘটেছে। এছাড়া তুর্কী, পাঠান ও আফগানরা এসেছেন বিজয়ীর বেশে। বিজয়ী হয়ে সেনাবাহিনীসহ এ দেশে তাঁরা স্থায়ীভাবে বাস করেছেন। সওদাগর হিসাবে এসেও অনেকে বিয়ে-শাদী করে এখানে বংশ বিস্তার করেছেন এবং এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন। মোঙ্গল ও তাতারদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে কিংবা ভাগ্যান্বেষণে এসেও হাজার হাজার মুসলমান এদেশে আশ্রয় নিয়েছেন রুযী-রোযগারের তাকিদে। এভাবে বহিরাগত ও ধর্মান্তরিত মুসলমানরা শত শত বছর এক সাথে অন্তরঙ্গভাবে বাস করে এ দেশের জীবন-স্রোতে একাত্ম হয়ে গেছেন। তাঁরা এমনভাবে মিশে গেছেন যে, তুর্কী-আরবী-পাঠান-মোগল প্রভেদ করার সামান্য সুযোগও এখন আর নেই।

ইসলাম প্রচারের গতিবেগ দুর্বল হয়ে পড়ার পরও ধর্মান্তরের এ প্রক্রিয়া থেমে যায়নি। এমন কি ইংরেজ শাসনামলে মুসলমানদের ঘোর দুর্দিনেও এ দেশে ইসলাম প্রচার ও ধর্মান্তরের গতি একেবারে স্পন্দন হারায়নি। মুরি টি. টাস উল্লেখ করেন যে, উনিশ শতকের মধ্যভাগে জিহাদ ও ফরায়েজী আন্দোলনের ফলে প্রতি বছর ভারতে দশ হাজার থেকে ছয় লাখ লোক ধর্মান্তরিত হতো। এ সময় অধিকাংশ ধর্মান্তর সংঘটিত হয়েছে বাংলা ও মালাবার উপত্যকায়। ইসলামের আদর্শিক ধারণার মধ্যে নিহিত প্রচারের মৌল গুরুত্বের কারণে যে কোন ক্ষীয়মান যুগেও ইসলামের প্রচার কোনো না কোনোভাবে অব্যাহত থেকেছে।

মুসলিম সমাজে দ্রুত জন্মহার বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার একটি কারণ বলে উল্লেখ করা হয়। ১৮৭২ সালে বেশ কয়েকটি জেলায় মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য ছিলো, কিন্তু সারা বাংলায় তারা ছিলেন সংখ্যালঘু। সে সময় বাংলার মোট জনসংখ্যা ছিলো ৩ কোটি ৬৭ লাখ ৬৯ হাজার ১০১ জন। তার মধ্যে হিন্দু ১ কোটি ৮১ লাখ ৪৩৮ জন এবং মুসলমান ১ কোটি ৭৬ লাখ ৮ হাজার ৭৩০ জন। বাকীরা বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। ১৮৯১ সালে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান-সমানে দাঁড়ায়। ১৮৯১ সাল পর্যন্ত মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১৭ লাখ আর হিন্দুর দশ লাখ। ১৯০১ সালের আদম শুমারীতে দেখা যায় মুসলমানরা সারা বাংলায়

www.nagorikpathagar.org

সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত হয়েছেন। ১৯৪১ সালে বাংলার লোকসংখ্যা ছিলো ৬ কোটি ১৪ লাখ ৬০ হাজার ৬৮৮ জন। তার মধ্যে মুসলমান ৩ কোটি ৩৩ লাখ ৭২ হাজার ৬৮৮ জন। হিন্দু ২ কোটি ৫৮ লাখ ১ হাজার ৭২৪ জন।

মুসলিম প্রধান পূর্ব ও উত্তর বাংলার মাটির উর্বরা শক্তি বেশী। জীবতত্ত্বের নিয়মে মাটির উর্বরা শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি অনুযায়ী অধিবাসীদের জন্ম-হারে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহে বিধিনিষেধের কারণে সন্তান ধারণযোগ্যা স্বামীহীনা নারীর সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। উৎকট জাতিভেদ ও পণ-প্রথার কারণেও হিন্দু মেয়েদের দীর্ঘ সময় অবিবাহিতা থাকতে হয়। শিক্ষিত আধুনিক হিন্দুদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রচলন এবং ইংরেজ প্রসাদভোজী হিন্দু বাবুশ্রেণীর বিলাসী অভ্যাসের কারণে প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস প্রভৃতি নানা কারণেও হিন্দুদের জন্ম-হার কম ছিলো। মুসলিম সমাজ এসব দিক থেকে বাহুল্যাংশে মুক্ত। তাই হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি।[১৩]

১৩. ডক্টর অতুল সুর তাঁর 'দুই বাংলা কি এক হবে?' নামক বইতে (পৃঃ ২২১) উল্লেখ করেন যে, ১৮৮১ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত বাংলায় মুসলিম জন্মহার হিন্দু অপেক্ষা দ্বিগুণ ছিলো। হিন্দুদের বিধবা বিবাহ নিরোধ আন্দোলনকে তিনি এর প্রধান কারণ বলে উল্লেখ করেন।

www.nagorikpathagar.org

অষ্টম অধ্যায়

বাংলার সমাজ বদল ঃ মুসলিম শাসনামল

১. মুসলিম শাসনের রাজনৈতিক পটভূমি

বখতিয়ার খিলজী ১২০৩ সালের মার্চ মাসে নদিয়া বিজয় করেন। এ ঘটনা বাংলা ও বাংগালীর ইতিহাসে একটি সুচিহ্নিত নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

এ ঘটনার ত্রিশ বছর আগে শাহাবুদ্দীন ঘোরি ১১৭৩ সালে এ উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। এর অনেক আগেই ভারতে মুসলিম অভিযান শুরু হয়,–একেবারে সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, হযরত উমরের (রা.) খিলাফতকালেই ৬৩৬ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় নৌসীমায় মুসলমানদের প্রথম রণপোতের আগমন ঘটে। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ওফাতের ৩২ বছরের মধ্যে ৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে আফগানিস্তান মুসলমানদের অধীনে আসে। বসরার গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভাতিজা মুহাম্মদ বিন কাসিম আট শতকের শুরুতে ৭১১-৭১৩ খ্রীস্টাব্দে সিন্ধু ও মুলতান জয় করেন। ৯৯৫ থেকে ১০৩০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত গযনীর সবুক্তিগীন ও তাঁর পুত্র মাহমুদ ভারতে অভিযান চালান। সবুক্তিগীন রাজা জয়পালকে পরাজিত করে ট্রান্স ইণ্ডাস ভূখণ্ড দখল করেন। জয়পালের রাজত্বের বাকী অংশ দখল করেন মাহমুদ। এ প্রসঙ্গে এস. সি. রায় চৌধুরী মন্তব্য করেন যে, সুলতান মাহমুদ গজনভীর সতেরো বার উত্তর ভারত অভিযানের মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্বের কাছে ভারতের রাজনৈতিক ও সামরিক দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে যায়।[১]

এই পটভূমিতে বাংলার ইসলাম প্রচারকদের গড়ে তোলা সামাজিক সমর্থনের ভিত্তির ওপর বখতিয়ার খিলজীর নদিয়া বিজয় সম্পন্ন হয়। বখতিয়ারের এ বিজয় বাংলাকে দিল্লীর মুসলিম সালতানাতের সাথে সম্পৃক্ত করে। তবে দিল্লীর প্রতি বাংলার সে আনুগত্য ছিলো নামেমাত্র।

১২০৬ সালে বখতিয়ার খিলজীর ইনতেকালের পর থেকে ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত ১৩২ বছরে অন্তত ২৩ জন শাসনকর্তা বাংলাদেশ শাসন করেন। ১৩৩৮ সালে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ সোনারগাওয়ের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর নামমাত্র আনুগত্যের সে বন্ধনও ছিন্ন হয়। ১৩৩৮ সাল থেকে ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত দু'শ বছর স্বাধীন সুলতানী

১. এস. সি. রায় চৌধুরী ঃ সোশ্যাল, কালচারাল এন্ড ইকনোমিক হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া।

www.nagorikpathagar.org

শাসনামল হিসাবে চিহ্নিত। এর পরবর্তী ৩৭ বছর আফগানগণ বাংলার শাসন পরিচালনা করেন। ১৫৭৬ সালে সম্রাট আকবরের সময় বাংলায় দিল্লীর বিজয় সূচিত হয়। তবে সে বিজয় ছিলো নামেমাত্র। বাংলায় মুগলদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে, ইসলাম খাঁ চিশতির সুবাহদারীর সময়। ১৭৬৫ সালে ইংরেজরা বাংলার রাজস্ব শাসনের অধিকার লাভের পূর্ব পর্যন্ত সে কর্তৃত্বের ধারা অব্যাহত থাকে।

২. মুসলিম শাসকদের ইসলামী প্রেরণা

মদীনায় ইসলামী খিলাফত লুপ্ত হওয়ার প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছর পর বাংলাদেশে মুসলিম শাসন-যুগের সূচনা হয়। সেটি এমন এক সময়, যখন খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শ থেকে সরে এসে মুসলিম বিশ্বে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। খোলাফায়ে রাশেদার প্রবর্তিত আইন-ব্যবস্থা তখনো পর্যন্ত মোটামুটি অপরিবর্তিত ছিলো, তবে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা, তার প্রকৃতি ও তার উদ্দেশ্যের মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিলো। উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসকদেরকেই বাংলার মুসলমান শাসকগণ তাঁদের আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়। বাংলার মুসলিম শাসকদের কার্যক্রম মূল্যায়নে এ পটভূমি সামনে রাখা প্রয়োজন।

ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা বাংলার মুসলিম শাসকদের মূল লক্ষ্য ছিলো না, তবে তৌহিদী সমাজ ব্যবস্থার সুফল ও কল্যাণে এ দেশের মানুষের জীবনকে ভরে তোলার প্রেরণা তাঁদের শাসন প্রতিষ্ঠার পিছনে কাজ করেছিলো। তেরো ও চৌদ্দ শতকের মুসলিম বিজেতাগণ ইসলামের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য পোষণ করতেন। ইসলাম প্রচার ও ইসলামী আদর্শের কল্যাণস্পর্শে এ দেশের জনগণকে মুক্তির পথে নিয়ে যাওয়ার প্রেরণাও তাঁদের শাসননীতির বৈশিষ্ট্য ছিলো। দু'শ বছরের স্বাধীন সুলতানী আমলের শাসকদের মধ্যেও—কিছু কিছু দুর্বলতা বাদে—সে ধারাবাহিকতাই লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী পাঠান শাসনামলেও জনজীবনকে ইসলামের আলোকে পরিচ্ছন্ন করে গড়ে তোলার প্রয়াস দেখা যায়।

বাংলাদেশে মুসলিম সমাজ গড়ে তোলার ব্যাপারে মুসলিম বিজেতা ও মুসলিম শাসকদের কৃতিত্ব ইসলাম প্রচারকদের মতো ততোটা উজ্জ্বল ছিলো না। তবে অনেক ক্ষেত্রে শাসকদের ভূমিকা ইসলাম প্রচারকদের কাজের পরিপূরক ছিলো। ইসলাম প্রচারক আলিম, সুফী ও মুজাহিদদের কার্যক্রমের ফলে বাংলায় মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিজয় সম্পন্ন হয়েছে; এ দেশে মুসলিম বিজয় সংহত করতেও তা মূল্যবান ভূমিকা পালন করেছে। অন্য দিকে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর শাসকগণ ইসলাম প্রচারকদের কাজের অগ্রগতিতে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। ইসলাম প্রচার এবং জনগণকে শির্ক, পৌত্তলিকতা ও নানারূপ কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে রাজশক্তির

www.nagorikpathagar.org

সমর্থন ও সহযোগিতা সহায়ক হয়েছে। বাংলায় রাজশক্তি প্রতিষ্ঠার পর অসংখ্য আলিম ও সুফী-দরবেশ এ দেশে আসেন। বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তাঁরা ইসলাম প্রচারের ধারাকে জোরদার করে তোলেন। শাসকগণ প্রত্যক্ষভাবে ইসলাম প্রচারে অংশ না নিলেও প্রচার কাজে তাঁরা নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। ইসলামের প্রচারমূলক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে তাঁরা নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। এ সব কাজে বাংলার প্রথম যুগের মুসলিম শাসকগণ অগ্রণী ছিলেন।

ইসলামের প্রতি শাসকগণ নিজেরা অনুরক্ত ছিলেন বলে নিজেদের শাসন এলাকায় ইসলামের বিস্তারেও স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা আগ্রহী ছিলেন। বাংলাদেশে ইসলামের শক্তিশালী ভিত্তি তাঁদের শাসনের প্রতি জনসমর্থনের জন্যও অপরিহার্য ছিলো। শাসনকর্তাগণ অনেকে নিজেদের নামে খোতবা পড়ানোর ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁদের চালু করা মুদ্রা ইসলামের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল ছিলো। অনেক মুসলিম শাসক তাঁদের মুদ্রায় বাগদাদের শাসনকর্তার নাম উৎকীর্ণ করাতেন। এতে মনে হয়, বাংলার মুসলিম শাসকগণ ইসলামী উম্মাহর অখণ্ডত্বের ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। ইসলামের কেন্দ্রের সাথে তাঁরা সংযোগ রাখতেন।

বাংলাদেশে মুসলিম শাসনামলে খোলাফায়ে রাশেদীনের একটিমাত্র শাসনতান্ত্রিক ধারা কিছুটা কার্যকর ছিলো। সে ধারাটি হলো, কারো সত্তা আইনের ঊর্ধ্বে নয়। ফলে দেশে দীর্ঘকাল ন্যায়বিচার ও আইনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিলো। ইসলামী শাসনতন্ত্রের এই একটিমাত্র ধারার সুফল বাংলাদেশের মানুষ আঠারো শতক পর্যন্ত ভোগ করার সুযোগ পেয়েছে। আইনের চোখে একজন সামান্য বিধবা ও দেশের সর্বোচ্চ ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য করা হতো না। এ ছাড়া ইসলামী আদর্শের অন্য যে সব দিকের কিছুটা তখনো মুসলিম সমাজে অবশিষ্ট ছিলো তার ফলে হতাশাক্লিষ্ট নির্যাতিত মানবতা জাতীয় জীবনে উচ্চ আসন লাভ করেছিলো। জনগণের জীবন দীর্ঘকালীন শান্তি, শৃঙ্খলা ও প্রাচুর্যে ভরে উঠেছিলো।

৩. মুসলিম শাসনের প্রথম একশ বছর

বাংলার প্রথম মুসলিম শাসনকর্তা ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী তাঁর শাসনামলে আনুষ্ঠানিক মুসলিম সমাজ গঠনের প্রাথমিক প্রয়াসরূপে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ ও মাদ্রাসা কায়েম করেন। এ সব মাদ্রাসায় মুসলমানদেরকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হতো। রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়েও এখানে শিক্ষা দেয়া হতো। বখতিয়ার খিলজী সুফী ও দরবেশদের জন্য কয়েকটি খানকাহ তৈরি করেন। এ ছাড়া তিনি ব্যক্তিগতভাবে ইসলাম প্রচারে অংশ নিতেন বলেও প্রমাণ পাওয়া যায়।

গিয়াসউদ্দীন ইউয়াজ শাহ খিলজী (১২১৩-২৬) বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয়

www.nagorikpathagar.org

প্রেরণার উৎসরূপে বিবেচিত ছিলেন। তিনি আলিম ও সুফী-দরবেশগণকে নিয়মিত বৃত্তি প্রদান করে দেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচারে সাহায্য করতেন। এন. এন. ল উল্লেখ করেন যে, ইউয়াজ খিলজী লাখনৌতিতে একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।

দিল্লীর সুলতান ইলতুতমিসের পুত্র নাসিরউদ্দীন মাহমুদ (১২২৬-১২২৮) মাত্র দেড় বছর লাখনৌতির শাসক ছিলেন। তিনি ইসলামের একজন নিষ্ঠাবান সেবক ছিলেন। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি শহরের আলিম ও সৈয়দগণকে আর্থিক সাহায্য করতেন। নাসিরউদ্দীন মাহমুদ-এর পর আরো চারজন শাসনকর্তা রাজত্ব করেন। এরপর তুগরল তুগান খাঁ শাসন ক্ষমতা লাভ করেন।

তুগরল তুগান খাঁ (১২৩৬-৪৪) দেশের সর্বত্র ইসলামের শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করেন। তুগরল তুগান খাঁর শাসনামলে তাবাকাত-ই-নাসিরীর বিখ্যাত লেখক ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজ লাখনৌতিতে আসনে। তিন বছর (১২৪১-৪৪ খ্রীঃ) বাংলায় অবস্থান করে তিনি এখানকার ইতিহাস রচনা করেন। তাতে তুগরল তুগানের শাসনামলের বিবরণ পাওয়া যায়। ১২৪৪ থেকে ১২৭১ সাল পর্যন্ত আরো ক'জন শাসক বাংলার শাসন পরিচালনা করেন। এরপর মুগিসউদ্দীন তুগরল খান-এর শাসনকাল। তিনি সোনারগাঁও পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করেন। তাঁর সময়ে মুসলিম শাসনের প্রভাবসীমা পুব দিকে সমতট ও বংগের শেষ সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তিনি তাঁর বারো বছরের শাসনামলে ঢাকার প্রায় পঁচিশ মাইল দক্ষিণে সোনারগাঁওয়ের নিকটবর্তী নরকিলা নামক স্থানে কিল্লা-ই-তুগরল নামে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করেন। মুগিসউদ্দীন তুগরল খান বাংলার সবচে জনপ্রিয় শাসকদের অন্যতম ছিলেন। তিনি ছিলেন খুবই উদার ও মুক্তহস্ত। এ কারণে তাঁকে হিন্দু-মুসলমান সকলেই ভালোবাসতেন। বাংলায় ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি আলিম ও দরবেশগণকে একবার পাঁচ মণ স্বর্ণ দান করেছিলেন। তিনি নিজেকে স্বাধীন সুলতানরূপে ঘোষণা করে নিজ নামে মুদ্রা প্রবর্তন ও খুতবা পাঠ করান।

মুগিসউদ্দীন তুগরল খানের পর নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ ওরফে বুগরা খান নয় বছর বাংলাদেশ শাসন করেন। তিনি দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। বুগরা খানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া উপলক্ষে তাঁর পিতা তাঁকে নানা উপদেশ দেন। তা থেকে সে সময়ের শাসন ব্যবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ উপদেশগুলির মধ্যে রয়েছে ঃ

> 'প্রজাদের নিকট থেকে রাজস্ব আদায়ের সময় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা উচিত। অর্থাৎ এতো কম রাজস্ব আদায় করা উচিত হবে না যাতে তাদের পক্ষে বিরোধী বা বিদ্রোহী হওয়া সম্ভবপর হয়। আবার এতো বেশি আদায় করা উচিত নয় যার ফলে তারা নিষ্পেষিত ও অত্যাচারিত হয়। কর্মচারীদের এমন বেতন দেয়া উচিত যাতে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহে তাদের কষ্ট না হয়। আত্মস্বার্থ

www.nagorikpathagar.org

চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কোন হুকুম দেয়া উচিত নয় এবং স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অবিচারমূলক কাজ করাও অনুচিত। যারা পার্থিব বিষয়াদি ত্যাগ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, তুমি তাঁদের পরামর্শ নিয়ো।'

নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ-এর পর তাঁর পুত্র রুকনউদ্দীন কায়কাউস ১২৯১ খ্রীস্টাব্দে বাংলার শাসক হন। ১২৯৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি শাসন পরিচালনা করেন। বিখ্যাত ইসলাম প্রচারক উলুগ-ই-আযম জাফর খাঁ গাযী রুকনউদ্দীন কায়কাউসের সেনাপতি ছিলেন। তিনি পশ্চিম বংগের সাতগাঁও (ত্রিবেনী) জয় করেন। এভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার মাত্র একশ' বছরের মধ্যে উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব বাংলা মুসলিম শাসনাধীনে আসে। এ সময়ের মধ্যেই পূর্ব বাংলায় লক্ষণসেনের বংশধরদের ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসনেরও সম্পূর্ণ অবসান ঘটে। সাতগাওয়ে এ সময় দু'টি উল্লেখযোগ্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৪. গৌর গোবিন্দ ও শাহ জালাল

রুকনউদ্দীন কায়কাউসের পর শামসউদ্দীন ফিরূজ শাহ (১৩০১-১৩২২) মোমেনশাহী, সোনারগাও ও সুদূর সিলেট পর্যন্ত মুসলিম রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ সময় রাঢ়ের বৃহত্তর অংশ মুসলিম শাসনাধীনে আসে। শামসউদ্দিন ফিরূজ শাহ-এর শাসনামলে তাঁর অন্যতম সেনাপতি সিকান্দার শাহ ১৩০৩ খ্রীস্টাব্দে হযরত শাহ জালাল মুজার্‌রদ ইয়ামেনীর দরবেশ বাহিনীর সহায়তায় অত্যাচারী রাজা গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে লড়াই করে সিলেট জয় করেন। নদিয়া ও লাখনৌতির পতনের পর তৎকালীন উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সিলেটে আশ্রয় নিয়েছিলো এবং রাজা গৌর গোবিন্দ ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণহিন্দুদের প্রতিভূ হিসাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সে সময় সিলেটই ছিলো বাংলার ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির সবচে বড় ও সর্বশেষ নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল।

আবদুল মান্নান তালিব উল্লেখ করেন যে, সিলেটে মুসলিম বাহিনীকে শতাব্দীর বৃহত্তম বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। শামসউদ্দীন ফিরূজ শাহ-এর সেনাপতি সিকান্দার শাহ রাজা গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পর পর দু'বার পরাজিত হয়েছিলেন। এরপর হযরত শাহ জালাল ও তাঁর দরবেশ-বাহিনীর সহায়তায় তিনি বিজয় লাভ করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক এটিকে বাংলার মুসলমানদের জন্য শতাব্দীর বৃহত্তম বিজয় বলেও উল্লেখ করেছেন। শামসউদ্দীন ফিরূজ শাহ ইসলাম প্রচারকদের বিভিন্নমুখী সাহায্য লাভ করেছেন, ইসলাম প্রচারকদেরকেও তিনি নানাভাবে সাহায্য করেছেন। উভয়ের কাজ ছিলো পরস্পরের পরিপূরক। ফিরূজ শাহ-এর রাজ্য বিহার, লাখনৌতি (নদিয়া), সাতগাও ও সোনারগাও–এই চারভাগে বিভক্ত ছিলো। সমসাময়িক প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ শায়খ শরফউদ্দীন ইয়াহিয়া মানেরী উল্লেখ করেছেন যে, কামরূপও (আসাম) ফিরূজ শাহ-এর শাসনাধীন ছিলো।

www.nagorikpathagar.org

৫. স্বাধীন সুলতানী আমল

স্বাধীন সুলতানী আমলের প্রথম সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ-এর রাজত্বকালে (১৩৩৮-৪৯) ইসলাম প্রচারক শাহ বদরউদ্দীন আল্লামা ও তাঁর সাথিদের সহায়তায় চট্টগ্রাম মুসলিম শাসনাধীনে আসে। ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ পূর্ববংগে ইসলাম প্রচারের সুযোগ প্রসারিত করেন। তাঁর শাসনামলে ইবনে বতুতা এ দেশ সফর করেন। তিনি ফখরউদ্দীনের শাসন ব্যবস্থার প্রশংসা করে বিস্তারিত বিবরণ লেখেন। এ শাসনামলে ইসলাম প্রচারকদের কাছ থেকে নদীপথে কোন ভাড়া নেয়া হতো না। এ সময়কার মুদ্রা ছিলো সুন্দর ও উন্নতমানের। ফখরউদ্দীন ও তাঁর পুত্র ইখতিয়ারউদ্দীন গাযী শাহ-এর মুদ্রার এক পিঠে 'খলীফতের ডান হাত' উৎকীর্ণ দেখে মনে হয়, ইসলামী জাহানের কেন্দ্রের সাথে তাঁদের সম্পর্ক ছিলো।

শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ ১৩৪২ সালে লাখনৌতির শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি সাতগাও ও সোনারগাও অধিকার করেন। নেপাল আক্রমণ করে সেখান থেকে তিনি অনেক ধন-রত্ন আনেন এবং উড়িষ্যা আক্রমণ করে চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। পশ্চিমে ত্রিহুত, চম্পারণ, গোরক্ষপুর ও কাশী এবং পুবে কামরূপের কিছু অংশও তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। রিয়াজুস সালাতীনের বর্ণনা মতে ৭৫৭ হিজরী মুতাবিক ১৩৫৬ খ্রীস্টাব্দে শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ ও দিল্লীর সুলতান ফিরূজ শাহ তোগলকের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সে চুক্তি অনুযায়ী দিল্লী ও বাংলার সীমানা চিহ্নিত হয়। দিল্লী কর্তৃক বাংলার স্বাধীনতাও স্বীকৃত হয়।

শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ-এর আমল থেকেই 'বাঙ্গালা' ও 'বাঙ্গালী' শব্দ দু'টি বংগীয় অঞ্চলের সাথে সাথে বরিন্দ ও রাঢ় তথা উত্তর ও পশ্চিম বংগের জন্য প্রয়োগ শুরু হয়। সুলতান ইলিয়াস শাহ সমস্ত বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলকে 'বাঙ্গালাহ' নাম দিয়ে এবং 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ' ও 'শাহ-ই-বাঙ্গালী' উপাধি ধারণ করে নিজেকে এই বৃহত্তর বাংলার জাতীয় শাসকরূপে ঘোষণা করেন। এটি ছিলো এ ভূখণ্ডের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। সমগ্র বাংলার জন্য এই বাঙ্গালাহ নামের প্রয়োগ মুসলমানদের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অবদানরূপে স্বীকৃত।

ডক্টর এম. এ. রহীম লিখেছেন ঃ 'এর দ্বারা এদেশে রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও ভাষাগত ঐক্য স্থাপিত হয় এবং বাঙ্গালীদের একত্রীভূত করে একটি সংঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত করা হয়। কার্যত এ সময় থেকেই বাংলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাসের সূচনা হয়। এই একত্রীকরণের ফলে বাঙ্গালী সমাজ ও সংস্কৃতি এবং ভাষা ও সাহিত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতির বিশিষ্ট পরিচয়ের পথ সুগম হয়। সুলতান ইলিয়াস শাহ ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা বাংলার জাতীয় শাসকরূপে নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন এবং এ দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির এবং জ্ঞানী-গুণীদের প্রতি উদার পৃষ্ঠপোষকতা দানের নীতি অনুসরণ

www.nagorikpathagar.org

করেছেন।'[২]

এর আগে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির চোখে বাংলা বা বংগ ছিল অবজ্ঞাত ও ঘৃণিত। পাল ও সেন শাসকরা এ দেশ কিংবা দেশের এ নাম নিয়ে গৌরববোধ করতেন না। বাংলার বৃহত্তর অংশ তাঁদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো, কিন্তু হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজারা নিজেদেরকে গৌড়েশ্বর বা গৌড়রাজ বলতেই অহংকার বোধ করতেন। মুসলিম আমলে এসেই সে বাংলা ও বাংগালী রাজনৈতিক অভিজাতদের কাছে প্রথমবারের মতো সম্মান ও গৌরবের আসন লাভ করলো।

শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ-এর আমলে বাংলাদেশে শায়খ আখি সিরাজউদ্দীন, শায়খ আলাউল হক ও রেজা ইয়ামেনীর মতো তিনজন শ্রেষ্ঠ আলিম ও সুফী বিদ্যমান ছিলেন। ইলিয়াস শাহ আলিম ও সুফীগণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁদের ইসলাম প্রচারে সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন। যুগশ্রেষ্ঠ জ্ঞান-সাধক আলাউল হক ও রেযা ইয়ামেনীর সাথে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ দিল্লীর ফিরূজ শাহ তুঘলকের সাথে যুদ্ধরত থাকাকালে শায়খ রেজা ইয়ামেনী ইনতেকাল করেন। ইলিয়াস শাহ তখন সুরক্ষিত একডালা দুর্গ থেকে ছদ্মবেশে বেরিয়ে এসে ইয়ামেনীর জানাযায় শরীক হয়েছিলেন।

শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ-এর পুত্র সিকান্দার শাহ (১৩৫৮-১৩৯১) বাংলার একজন উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন। ইসলাম প্রচারেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সমসাময়িক প্রখ্যাত আলিম আলাউল হক ও শরফউদ্দীন ইয়াহিয়া মানেরীর সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। সিকান্দার শাহ ১৩৬৯ সালে পাণ্ডুয়ায় আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন। এটি উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম মসজিদ। আয়তনের দিক থেকে দিল্লী জামে মসজিদের পরই এর স্থান। দিনাজপুরের বিশিষ্ট ইসলাম প্রচারক মওলানা আতার মাযারেও তিনি মসজিদ নির্মাণ করেন। ইসলাম প্রচারক দরবেশ হুসামউদ্দীন মানিকপুরী তাঁর শাসনামলের প্রশংসা করেছেন। তাঁর দরবারে হিন্দু অমাত্যদের প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিলো। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্পর্কে তাঁকে শায়খ আলাউল হক সতর্ক করেছিলেন।

সিকান্দর শাহ-এর পুত্র গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ (১৩৯১-১৪১০) বাংলার সকল স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে সবচে আকর্ষণীয় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।[৩] সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, এই সুলতানের প্রায় সকল কার্যকলাপে একটি উন্নত, বৈচিত্রপ্রিয় রুচিবান বিদগ্ধ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন সে যুগের বিশিষ্ট আলিম। রিয়াজের বর্ণনা অনুযায়ী গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ ছিলেন সুশাসক এবং ইসলামী আইনের বিধি-নিষেধ মেনে চলার ব্যাপারে নিষ্ঠাবান। বিধবার পুত্রকে আঘাত

২. ডক্টর এম. এ. রহীম ঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫-৬।
৩. সুখময় মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর–স্বাধীন সুলতানদের আমল পৃঃ ৫৭।

www.nagorikpathagar.org

করার দায়ে কাজীর দরবারে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি খুলাফায়ে রাশেদার একটি আদর্শকেই সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন। শায়খ আলাউল হক-এর পুত্র সে যুগের প্রখ্যাত মনীষী নূর কুত্‌ব-উল-আলম ছিলেন তাঁর সমসাময়িক ও সহপাঠী। সুলতানী দরবারে নূর কুত্‌বসহ বহু আলিম উপস্থিত থাকতেন এবং শাসন কার্যে তাঁকে পরামর্শ দিতেন। নূর কুত্‌ব-এর এক ভাই আযম খান সুলতানের দরবারে উজির ছিলেন। তবে কুত্‌ব কোন চাকুরী গ্রহণে রাযী হননি। গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ বিহারের বিশিষ্ট আলিম মুজাফ্‌ফর শামস বলখীকেও অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। মওলানা বলখী সুলতানকে পরামর্শ দিয়ে চিঠিপত্র লিখতেন। তাঁর একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে, সুলতান প্রথম জীবনে সুখ ও আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত ছিলেন। পরে ইসলামী আদর্শের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত হয়ে সরলভাবে জীবন যাপন করতেন।

গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ মক্কা, মদীনা, শিরাজ ও জৌনপুরের শাসকদের কাছে দূত প্রেরণ করেন। এ ছাড়া ১৪০৫ সালে তিনি চীনেও দূত পাঠান। গিয়াসউদ্দীন-এর পূর্ববর্তী কোন কোন শাসনামল থেকেই বর্ণহিন্দুরা উচ্চ রাজপদে আসীন হয়ে বেশ প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলো। গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ-এর আমলেও বহু বর্ণ-হিন্দু বিভিন্ন উচ্চ পদে আসীন ছিলো। হিন্দুদের এই রাজনৈতিক প্রাধান্যের পরিণতি অত্যন্ত অশুভ ও মারাত্মক হবে বলে মওলানা মুজাফফর শামস বলখী গিয়াসউদ্দীন আযম শাহকে এক দীর্ঘ চিঠির মাধ্যমে সাবধান করে দিয়েছিলেন। মওলানা বলখী কোরআন, হাদীস ও ইতিহাস বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন যে, বিধর্মীদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করা এবং মুসলমানদের ওপর তাদেরকে কর্তৃত্ব করতে দেয়া উচিত নয়, তার প্রয়োজনও নেই। মওলানা বলখীর এই চিঠি সম্পর্কে অধ্যাপক সাইয়েদ হাসান আশকারী লিখেছেন ঃ 'বিহারের এই দরবেশের সাবধানবাণী সম্বলিত চিঠি লেখার অল্প কিছুদিন পর হিন্দু মন্ত্রী গনেশের হাতে ইলিয়াসশাহী রাজত্বের যে পরিণতি হয়, তা সামনে রাখলে দরবেশের সাবধানবাণীকে ঐশী বাণী বলে মনে হয়।[৪] গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ সে সাবধানবাণী অনুসারে কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।

মুজাফ্‌ফর শামস বলখীর চিঠি লেখার তেরো-চৌদ্দ বছরের মধ্যে সুলতানের দরবারের প্রভাবশালী অমাত্য দিনাজপুরের ভাতুরিয়ার জমিদার গনেশের নেতৃত্বে হিন্দু অমাত্যদের ষড়যন্ত্রে বাংলার ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহকে প্রাণ দিতে হয়।

৬. রাজা গনেশের অভ্যুত্থান ও নূর কুত্‌ব-এর প্রতিরোধ সংগ্রাম

গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ-এর মৃত্যুর পর ইলিয়াসশাহী বংশের সাইফউদ্দীন হামজা

৪. সাইয়েদ হাসান আশকারী ঃ ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল কংগ্রেস ১৯৫৬-এর ধারা বিবরণী, পৃঃ ২১৬, সুখময় মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, পৃঃ ৮২।

www.nagorikpathagar.org

শাহ, শিহাবউদ্দীন বায়েজিদ শাহ ও আলাউদ্দীন ফিরূজ শাহ ১৪১০ থেকে ১৪১৪ সাল পর্যন্ত মাত্র চার বছরের মধ্যে একের পর এক বাংলার শাসন-মঞ্চে আবির্ভূত হয়ে তেমনি দ্রুত অন্তর্হিত হন। সুখময় মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় ঃ 'কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোন ও কর্ণের পতনের পর যেমন নগণ্য শল্য সেনাপতি হয়েছিলেন, তেমনি ইলিয়াসশাহী বংশের শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ, সিকান্দার শাহ এবং গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ–এই তিনজন দিকপাল সুলতানের পরে দুর্বল সৈফুদ্দীন হমজা শাহ রাজা হন, শল্যের সেনাপতিত্বের মত সৈফুদ্দীনের রাজত্বও অল্পকাল স্থায়ী হয়েছিলো।'[৫] তিনি আরো লিখেছেন ঃ "সৈফুদ্দীন হমজা শাহর মৃত্যুর পর বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা কার্যত রাজা গনেশের হাতে এল। কিন্তু নামে রাজা হলেন অন্য ব্যক্তি। তার নাম শাহাবউদ্দীন বায়েজিদ শাহ।'[৬] 'অমিত শক্তিধর গনেশের সাহায্যের ফলেই' শিহাবউদ্দীন বায়েজিদ শাহ সাইফউদ্দীন হামজাহ শাহকে হত্যা করার 'অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিলেন'।[৭] শিহাবউদ্দীনকে শিখণ্ডি খাড়া করে গনেশ নিজে রাজ্যের কর্তৃত্ব হস্তগত করেন। কিছুদিন পর 'শিহাবুদ্দীন গনেশ কর্তৃক আক্রান্ত, পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন। সম্ভবত শিহাবুদ্দীন গনেশের বিরুদ্ধে যাবার চেষ্টা করাতেই গনেশ তাঁকে আক্রমণ ও বধ করেছিলেন।'[৮] সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ 'ইবন-ই-হজরের বিবরণ থেকেও জানা যায় যে, শিহাব সৈফুদ্দীনকে পরাজিত ও নিহত করে রাজা হয়েছিলেন এবং তাকে পরাস্ত ও নিহত করেছিলেন 'ফন্দু কাস' অর্থাৎ রাজা গনেশ। ইবন-ই-হজরের এই বিবরণ সম্পূর্ণ প্রামাণ্য।'[৯] তারপর গনেশ বাংলার সুলতানী মসনদে শিখণ্ডিরূপে দাঁড় করান শিহাবউদ্দীনের বালক পুত্র আলাউদ্দীন ফিরূজ শাহকে। সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ 'শিহাবুদ্দীনকে বধ করার পরে গনেশ একে রাজা হিসাবে খাড়া করে আগের মতো শাসন করতে থাকেন এবং কয়েক মাস বাদে যখন বোঝেন আর কাউকে শিখণ্ডি হিসাবে খাড়া না রাখলেও চলবে, তখন তিনি আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে অপসারিত করে নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করেন; সম্ভবত আলাউদ্দীন গনেশের হাতে প্রাণও হারান।'[১০] এরপর গনেশ বাংলার মসনদে আরোহণ করেন ১৪১৫ সালে।

রাজা গণেশের সিংহাসন দখলের মধ্য দিয়ে বর্ণহিন্দুদের দু'শতাধিক বছরের পুঞ্জিভূত আক্রোশ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। আকবর ও জাহাঙ্গীরের সভাসদ মোল্লা তাকিয়া লিখেছেন ঃ "যখন হিন্দু জমিদার কানস (গনেশ) বাংলা প্রদেশের ওপর আধিপত্য অর্জন করলেন, তিনি মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার সংকল্প করলেন এবং তাঁর রাজ্য

৫. সুখময় মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, পৃঃ ৯২।
৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৬।
৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৭।
৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৮।
৯. পূর্বোক্ত পৃঃ ৯৪।
১০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৫।

www.nagorikpathagar.org

থেকে ইসলামের মূলোচ্ছেদ করাই হয়ে দাঁড়ালো তাঁর লক্ষ্য।'[১১] রাজা গনেশের স্বল্পকালস্থায়ী শাসনামলকে কোন কোন হিন্দু ঐতিহাসিক 'হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা ও হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য স্থাপনের প্রচেষ্টা' বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত দু'শ বছরের মুসলিম শাসনের পর গনেশের নেতৃত্বে এটি ছিলো বর্ণহিন্দুদের প্রথম অভ্যুত্থান। গনেশের রাজ্য-শাসনের প্রকৃতি দেখে মনে হয়, বাংলার বুক থেকে ইসলামের চিহ্ন মুছে ফেলতে এবং বাংলার জনজীবনে ইসলামের কল্যাণ স্পর্শে মুক্তির যে বাতায়ন উন্মুক্ত হয়েছিলো তা পুনরায় রুদ্ধ করে দিতে তিনি পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে গনেশের নির্যাতন ও নিপীড়ন ছিলো অশ্রুতপূর্ব। ইসলাম প্রচারক আলিম ও দরবেশগণকে তিনি পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করেছেন। বিখ্যাত আদিনা মসজিদকে তিনি তাঁর কাচারী-বাড়ীতে পরিণত করেছিলেন।[১২] রাজা গনেশের শত অত্যাচার-নির্যাতন সত্ত্বেও ইসলাম প্রচারক আলিম ও সুফী-দরবেশগণ মাথা নত করেননি। দু'শ বছর পর মুসলিম শাসনের অস্তিত্ববিরোধী কার্যক্রমের মুকাবিলায় তৎকালীন আলিম সমাজই জনগণের প্রতিরোধ-সংগ্রামে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। রিয়াজ-উস-সালাতীন ও বুকাননের বরাত দিয়ে সুখময় মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ 'গনেশ সিংহাসনে বসবার সাথে সাথেই মুসলমান দরবেশদের সাথে তাঁর তীব্র বিরোধ বেধে ওঠে। গনেশ কঠোর হাতে দরবেশদের দমন করেন।'[১৩] কিন্তু দরবেশগণ কোন অবস্থাতেই গনেশের নীতির কাছে মাথা নত করেননি। এ প্রসঙ্গে রিয়াজ-উস-সালাতীনে একটি বিখ্যাত ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে বিশিষ্ট ভূমিকা পালনের কারণে গৌড়ের জনমান্য আলিম শায়খ বদরুল ইসলামের ওপর গনেশ বড়ই রুষ্ট ছিলেন। ক্ষমতা দখলের পরই তিনি বদরুল ইসলামের ওপর নির্যাতন শুরু করেন। শায়খ বদরুল ইসলাম একবার গনেশকে কুর্নিশ না করায় গনেশ ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। দরবেশ বদরুল ইসলাম স্পষ্ট জবাব দিলেন ঃ 'আমাদের পক্ষে পৌত্তলিকদের কুর্নিশ করা শোভনীয় নয়। বিশেষ করে তোমার মতো নিষ্ঠুর রক্তপিসাসু বিধর্মী, যে মুসলমানদের রক্তপাত করছে, তাকে সালাম দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।' শায়খের এ ধরনের অপ্রত্যাশিত সাহসী জবাব রাজাকে ক্রোধান্ধ করে তোলে। এরপর একদিন রাজা একটি নিচু ও সংকীর্ণ দরজা বিশিষ্ট ঘরে শায়খকে ডেকে পাঠালেন। শায়খ সেখানে পৌছেই বুঝতে পারেন যে, গনেশের সামনে মাথা নত করানোর জন্যই এ আয়োজন। তিনি ঘরের ভিতরে প্রথমে পা রেখে মাথা নত না করেই সেখানে প্রবেশ করেন। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য রাজা ক্রোধোন্মত্ত হয়ে শায়খ বদরুল ইসলামকে তাঁর ভাইদের সাথে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে নির্দেশ দেন এবং সাথে সাথেই তাঁকে সেখানে শহীদ করা হয়।[১৪]

১১. পূর্বোক্ত (উদ্ধৃত), পৃঃ ১১৩।
১২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৬।
১৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৮।
১৪. গোলাম হোসেন সলীম ঃ রিয়াজুস সালাতীন (বাংলা তরজমা), পৃঃ ১০৮ ও ১৪৬।

www.nagorikpathagar.org

এ ঘটনার বিবরণ উল্লেখ করে সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ 'সেদিনই পাণ্ডুয়ার অন্যান্য দরবেশ ও উলেমাকে তাঁর আদেশে জলে ডুবিয়ে বধ করা হয়।'[১৫]

বাংলার মুসলমানদের এ দুর্দিনে শায়খ আলাউল হক-এর পুত্র সমসাময়িক সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম নূর কুত্ব-উল-আলম ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ মতানৈক্য দূর করে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেন। জৌনপুরের সুলতান ইবরাহিম শর্কিকে চিঠি লিখে তিনি গনেশকে শাস্তি দিতে অনুরোধ জানান। সে চিঠি পেয়ে ইবরাহিম শর্কি নিজেই এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে গনেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। সে সময় বাংলার জনগণের সাধারণ স্বার্থ রক্ষার জন্য ইসলাম প্রচারক আলিম ও দরবেশগণ অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। নূর কুত্ব-উল-আলম তাঁর পিতা শায়খ আলাউল হক-এর ছাত্র জৌনপুরের বিখ্যাত দরবেশ আশরাফ সিমনানীর সাথে যোগাযোগ করেন। বাংলাদেশের বিখ্যাত দরবেশ হোসেন যোক্করপোশসহ বাংলার সমকালীন আলিমদের সাথেও তিনি চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন। এভাবেই তাঁরা বাংলাকে গনেশের কবলমুক্ত করার ঐক্যবদ্ধ কর্মপন্থা গ্রহণ করেন।

ইবরাহিম শর্কিকে বাংলায় অভিযান পরিচালনার জন্য উদ্বুদ্ধ করে শায়খ আশরাফ সিমনানীও অন্তত তিনটি চিঠি লিখেছিলেন। ইবরাহিম শর্কি ছিলেন আশরাফ সিমনানীর একজন ভক্ত। সে কারণে তাঁর চিঠি সুলতানকে প্রভাবিত করেছিলো। ভারতীয় শিক্ষাবিদ সাইয়েদ হাসান আশকারী আশরাফ সিমনানীর লেখা সে চিঠি তিনটি উদ্ধার করেছেন। তা থেকে ইবরাহিম শর্কিকে লেখা নূর কুত্ব-উল-আলমের চিঠির সারমর্মও জানা যায়।[১৬] সে চিঠিতে গনেশের ক্ষমতা দখলের ফলে সৃষ্ট মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে এবং সে অবস্থার মুকাবিলায় নূর কুত্ব-উল-আলম-এর ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

নূর কুত্ব ইবরাহিম শর্কিকে তাঁর চিঠিতে লিখেছেন ঃ 'প্রায় তিন'শ বছর বাদে ইসলামী ভূমি বাংলাদেশে ঈমান ধ্বংসকারী কাফিরদের কালোছায়া পড়ায় দেশ অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। মুসলমানদের ইজ্জত-সম্ভ্রম অবলুণ্ঠিত। দেশের প্রতিটি কোণে ইসলামের যে প্রদীপগুলি তার জ্যোতি বিকিরণ করে মানুষকে সত্য পথ প্রদর্শন করতো, কানস রায়ের (গনেশ) সৃষ্ট অবিশ্বাসের ঝড়ের ছোবলে পড়ে সে প্রদীপ নিভে গেছে।... ইসলামের পীঠস্থানের এই দুর্দিনে কিভাবে আপনি শান্ত ও সুখী মনে সিংহাসনে বসে আছেন? উঠুন, এবং দ্বীনের হেফাজতে এগিয়ে আসুন। এখানে দাউদাউ করে কুফরীর আগুন জ্বলছে আর আপনি আপনার তলওয়ার খাপে ভরে রেখেছেন। ... বাংলাদেশকে দুনিয়ার জান্নাত বলা হয়; কিন্তু তা আজ জাহান্নামের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।... প্রত্যেকের ওপর এমন অত্যাচার করা হচ্ছে, যা লিখে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

১৫. সুখময় মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, পৃঃ ১০৮।

১৬. Bengal past and present, Vol-LXVII (1948), p-32-33, সুখময় মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর পৃঃ ১০৯।

www.nagorikpathagar.org

আর এক ঘণ্টাও আপনি সিংহাসনে বসে বিশ্রাম করবেন না... ।'[১৭] আশরাফ সিমনানীও তাঁর ভক্ত ইবরাহিম শর্কিকে উদ্বুদ্ধ করে এবং বাংলায় তাঁর অভিযানের সাফল্য কামনা করে চিঠি লিখেন। সে চিঠিতে তিনি বলেন ঃ 'ধার্মিক রাজাদের পক্ষে মুসলমানদের দ্বীন ও ইমানের হেফাজতের জন্য সেনাবাহিনী পরিচালনার চাইতে আনন্দের কাজ আর কিছুই নাই।'[১৮] আশরাফ সিমনানী যোক্করপোশ ও নূর কুত্বকেও দু'টি চিঠি লিখেন। নূর কুত্বকে তিনি জানান ঃ 'সুলতানের ধ্বজা এবং তাঁর সেনাবাহিনী ইতিমধ্যেই আপনার দেশের দিকে রওনা হয়েছে। সুলতান তাঁর বাহিনীর সাহায্যে কাফিরদের তাড়াতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আশা করা যাচ্ছে যে, মুসলমানরা কানস রায় (গনেশ) ও তার লোকদের কবল থেকে মুক্তি পাবে।'[১৯]

ইবরাহিম শর্কির সেনাবাহিনী গৌড়ের অদূরে পৌঁছে যাওয়ার খবর শুনে রাজা গনেশ নূর কুত্ব-এর কাছে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাতে থাকেন। কিন্তু তাতে নিরাশ হন। অবশেষে তিনি প্রথমে নিজের ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব করেন। পরে সে প্রস্তাব পাল্টিয়ে তাঁর ছেলে যদু ওরফে জিতমলের ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব পেশ করেন। নূর কুত্ব জিতমলকে ইসলাম গ্রহণ করিয়ে তাঁর নাম দিলেন জালালউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ। এ সংবাদ প্রচার করা হয় সর্বত্র। তাঁর নামে খোতবা পড়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং বাংলায় আবার ইসলামী আইন-কানুন জারী হয়। যদু ওরফে জিতমলের ইসলাম গ্রহণের বিষয় নিয়ে ১৪২৮-২৯ সালে লেখা 'সঙ্গীত শিরোমণি' নামে ইবরাহিম শর্কির প্রশস্তিমূলক বইয়ের সূত্র ধরে ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন ঃ 'যদু জালালুদ্দীন যে চালাকি করে (বাপের সঙ্গে বিরোধ করে?) ধর্মান্তর গ্রহণ করে ইবরাহিম শাহ শর্কীর সাহায্যে রাজ্য লাভ করেছিলেন এ তো তারই ইঙ্গিত।' এই উক্তি উদ্ধৃত করে সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ 'ইব্রাহিম শর্কী সসৈন্যে বাংলায় উপস্থিত হলে রাজা গনেশের সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়। তাঁর সুচতুর পুত্র তখন সুযোগ বুঝে পিতার বিরোধী পক্ষে যোগ দেন এবং তাঁরা তাঁকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। সম্ভবত নূর কুত্ব আলমের দলই গনেশ-নন্দনকে নানারকম কৌশল করে নিজেদের দলে টেনেছিলেন।'[২০] তিনি এ কথাও উল্লেখ করেন যে, শর্কীর আগমনের পর গনেশ বিনা যুদ্ধে পলায়ন করেন। কিন্তু 'সঙ্গীত শিরোমণি'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ডক্টর আহমদ হাসান দানী প্রমাণ করেছেন যে, ইবরাহিম শর্কীর আগমনের আগেই যদু ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[২১]

জালালউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ যে সুযোগ সন্ধানী ছিলেন না, বরং পরম নিষ্ঠা সহকারেই নূর কুত্ব-উল-আলম-এর কাছে ইসলামে দীক্ষা নিয়েছিলেন তা পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ

১৭. সুখময় মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, পৃঃ ১০৯-১১০।
১৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১০।
১৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৩।
২০. সুখময় মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, পৃঃ ১১৭।
২১. Dr, A. H. Dani : Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal, p-122.

www.nagorikpathagar.org

থেকে উপলব্ধি করা যায়। সম্ভবত আগে থেকেই তিনি নূর কুত্‌ব-এর একজন ভক্ত ও অনুসারী ছিলেন। সে কারণে যদুর শাসনভার গ্রহণের প্রস্তাবে নূর কুত্‌ব শুধু সম্মতই হননি, বরং সীমান্ত থেকেই ইবরাহিম শর্কীকে ফিরে যেতে নিশ্চিন্তে অনুরোধ জানাতে পেরেছিলেন।

জালালউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ ওরফে যদু ইসলামের নীতিমালার ভিত্তিতে শাসন চালানোর চেষ্টা করেন। তাঁর শাসনামলে চীন-সম্রাটের একটি প্রতিনিধি দল তাঁর ভোজসভায় আমন্ত্রিত হন। সে ভোজে মেষ ও গরুর গোশতের কাবাব পরিবেশন করা হয়। মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিলো। মদের পরিবর্তে মেহমানদেরকে শরবত খাওয়ানো হয়। সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ "জলালুদ্দীন প্রকৃত নিষ্ঠাবান মুসলমানের মতো ভোজসভায় মদ্যপান নিষিদ্ধ করেছিলেন।... কিন্তু এইভাবে পিতার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে খাঁটি মুসলমানী রীতিতে রাজ্য শাসন করা জলালুদ্দীনের পক্ষে বেশী দিন সম্ভব হলো না। কিছুদিন পরেই আবার বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চে রাজা গনেশ আবির্ভূত হলেন। এই রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা তিনি হস্তগত করলেন।... হয়তো তিনি (জালালউদ্দিন) প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অচিরেই পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন।'[২২]

গনেশ বাংলার শাসন ক্ষমতা পুনর্দখল করার পর জালালউদ্দীনকে শুদ্ধি করে জাতে তোলার জন্য 'সুবর্ণধেনু-ব্রতে'র অনুষ্ঠান করেন। সোনার গরু তৈরী করে জালালকে সে গরুর মুখ দিয়ে প্রবেশ করিয়ে পিছন দিয়ে টেনে বের করা হয়। পরে সে সোনার গরু ভেঙ্গে ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করে তাদের মনস্তুষ্টি করা হয়। এভাবে জালালউদ্দীনের পাপস্খলনের আয়োজন করেও গনেশ কুলত্যাগী পুত্রের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেননি। তিনি জালালউদ্দীনকে বন্দী করে রাখেন।

গনেশ দ্বিতীয় দফা শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়ে মুসলমানদের ওপর আগের চেয়ে বেশী কঠোর ও নিষ্ঠুর নির্যাতন চালাতে থাকেন। নূর-কুত্‌ব-এর পরিবার-পরিজন, চাকর-বাকর এমনকি পালিত লোকজনও সে নিষ্ঠুরতার হাত থেকে রেহাই পায়নি। তাঁর দুই পুত্র শায়খ আনোয়ার ও শায়খ জাহিদকে সোনারগাঁওয়ে নির্বাসিত করা হয়। সেখানেই গনেশের নির্দেশে শায়খ আনোয়ারকে হত্যা করা হয়। শায়খ আনোয়ারের রক্তে যেদিন সোনারগাঁওয়ের মাটি রঞ্জিত হয়, ঠিক সেদিনই অত্যাচারী গনেশেরও মৃত্যু হয়। গনেশের এ মৃত্যু স্বাভাবিক ছিলো না। রিয়াজ-উস-সালাতীনের রচয়িতা লিখেছেন, 'কেউ কেউ বলেন, তাঁর (গনেশের) ছেলে, যিনি বন্দী ছিলেন, ভৃত্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে পিতাকে হত্যা করেছিলেন।' সমসাময়িক ঐতিহাসিক ইবন-ই-হজর এর লেখা 'ইন্‌বাউল গুম্‌র্' থেকেও জানা যায় যে, গনেশের পুত্র জালালউদ্দীনই গনেশকে আক্রমণ করে বধ করেন।[২৩] রাজা গনেশের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলায় সাড়ে

২২. সুখময় মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, পৃঃ ১২০।
২৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪০।

www.nagorikpathagar.org

পাঁচশ' বছরের মুসলিম শাসনের মাঝখানে মাত্র চার বছরের সংক্ষিপ্ত কিন্তু ঘটনাবহুল বর্ণহিন্দু শাসনের অবসান ঘটে।

গনেশের মৃত্যুর পর জালালউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ বাংলার শাসকরূপে দ্বিতীয় বার অধিষ্ঠিত হন ১৪১৮ সালে। তিনি অমাত্যবর্গ ও রাজ্যের অন্য সব শীর্ষ স্থানীয় লোকদের সমবেত করে ইসলামের প্রতি তাঁর দ্ব্যর্থহীন আনুগত্যের কথা দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন। তিনি লাখনৌতির শিক্ষিত ও গণ্যমান্য লোকদের উপস্থিতিতে কালেমা উচ্চারণ করেন। জালালউদ্দীনের ধর্মনিষ্ঠা সম্পর্কে সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ 'জালালুদ্দীনের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কারণ যা-ই হোক না কেন, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পরে এই ধর্মে তাঁর গভীর নিষ্ঠা জন্মেছিল। তাঁর পিতা সম্ভবত তাঁর শুদ্ধি করিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে কোনই ফল হয়নি। পিতার মৃত্যুর পরেই তিনি নিজের ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। ধর্মনিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী জাত মুসলমান সুলতানদেরও অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। তাঁর আগে প্রায় ২০০ বছর ধরে বাংলার মুসলমান সুলতানরা তাঁদের মুদ্রায় কল্‌মা খোদাই করতেন না। জলালুদ্দীন কিন্তু তাঁর মুদ্রায় কল্‌মা খোদাই করে বাংলাদেশে আবার এই প্রথা চালু করেন। তিনি আরাকান-রাজকে তাঁর হৃত সিংহাসনে পুনরধিষ্ঠিত করার পর থেকে ঐ রাজা ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের মুদ্রায় ফার্সী অক্ষরে মুসলমানী নাম লেখার প্রথা চালু হয়, এর পিছনেও সম্ভবত জলালুদ্দীনের নির্দেশ ছিল এবং তাঁর ধর্ম-প্রীতিই এর কারণ বলে মনে হয়।... তাঁর পূর্ববর্তী সুলতানরা সকলেই খলিফার আনুগত্য স্বীকার করতেন এবং কখনো কখনো তাঁদের মুদ্রায় বা শিলালিপিতে নিজেকে 'খলিফার সহায়ক' বলে অভিহিত করেছেন। জলালুদ্দীনও প্রথম দিকে তাই করেছেন। কিন্তু জলালুদ্দীন তাঁর শেষের দিককার মুদ্রা ও শিলালিপিতে 'খলিফত-আল্লাহ' উপাধি ধারণ করেছেন। অর্থাৎ নিজেকেই খলীফা বা ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে দাবী করেছেন।'[২৪]

জালালউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ তাঁর শাসনামলে বাংলায় ইসলামের বিকাশে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি ইসলামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং তাঁর পিতা যে সমস্ত মসজিদ ও ইসলামের অন্যান্য নিদের্শন ধ্বংস করেছিলেন, সেগুলি সংস্কার করেন। তিনি মক্কায়ও একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। চীন-সম্রাট য়ুংলু, পারস্যের হীরাতে অবস্থানকারী শাহরুখ, মিসরের সুলতান ও দামাস্কাসের খলিফার কাছে তিনি দূত প্রেরণ করেন। উত্তর বংগ, পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বংগের প্রায় সমুদয় অংশ, দক্ষিণ বাংলার বৃহদংশ ও দক্ষিণ বিহারের কিয়দংশ নিয়ে তাঁর রাজ্য গঠিত ছিলো। ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে আরাকান তাঁর সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়েছিলো। প্রায় দেড় যুগ বাংলার শাসন ক্ষমতায় কৃতিত্বের সাথে অধিষ্ঠিত থাকার পর ১৪৩৩ সালে জালালউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ ইন্তেকাল করেন।

২৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৯।

www.nagorikpathagar.org

জালালউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ-এর পর তাঁর পুত্র শামসউদ্দীন আহমদ শাহ (১৪৩৩-৩৬ খ্রীঃ) তাঁর শাসননীতিতে তাঁর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

৭. নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ ও খান জাহান আলী

শামসউদ্দীন আহমদ শাহ-এর পর বিখ্যাত সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ-এর (১৪৩৬-১৪৫৯) শাসনকাল। তাঁর সময় থেকে মাহমুদশাহী বংশের শাসন যুগের সূচনা হয়। তারিখ-ই-ফিরিশতায় লেখা হয়েছে যে, সিংহাসন লাভের আগে সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ গ্রামাঞ্চলে কৃষি কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দীর্ঘ প্রায় দুই যুগ অপ্রতিহতভাবে শাসন কাজ পরিচালনা করেন। রিয়াজ-উস-সালাতীনের বর্ণনা থেকে জানা যায়, 'নাসির শাহ সমস্ত কাজ ন্যায়পরায়ণতা ও উদারতার সাথে করতেন। যার ফলে যুবা-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সমস্ত লোক তৃপ্ত হলো... এই মহান সুলতান গৌড়ের দুর্গ ও প্রাসাদগুলো নির্মাণ করান।' গৌড়ের বিখ্যাত 'সেনানী দরওয়াজা' ও 'কোতওয়ালী দরওয়াজা'র নির্মাতাও ছিলেন নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ। এক দিকে চীন এবং অন্যদিকে আফ্রিকা মহাদেশের কোন কোন দেশের সাথেও তাঁর সম্পর্ক ছিলো বলে জানা যায়। নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহের শিলালিপি বালিয়াঘাটা (জঙ্গিপুর), গৌড়, সাতগাঁও, হযরত পাণ্ডুয়া, নসওয়ালাগলি (ঢাকা), ভাগলপুর, মুঙ্গের, ঘাঘরা (মোমেনশাহী) ও কেওয়ারজোরে (মোমেনশাহী) পাওয়া গেছে। সুতরাং পশ্চিম বংগ, পূর্ব বাংলা ও উত্তর বংগ নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো, তা সহজেই বুঝা যায়। এ ছাড়া ঢাকার নারিন্দা, ত্রিবেনী (সাতগাও) ও বাগেরহাটে তাঁর আমলের তিনটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। ঢাকার নারিন্দায় তাঁর শাসনামলে নির্মিত 'বিনাত বিবির মসজিদ' শহর-ঢাকার সবচে প্রাচীন মসজিদ হিসাবে পরিচিত।

নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ-এর সিপাহসালার মুজাহিদ ইসলাম প্রচারক খান জাহান আলী যশোর-খুলনা এলাকায় মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। তিনি তাঁর সাথিগণকে বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচারের জন্য পাঠাতেন। তাঁর অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা, জনসেবা ও অকৃত্রিম চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে দক্ষিণ বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকার লোক ইসলামগ্রহণ করেন। তাঁর সেবামূলক কাজের অসংখ্য স্মৃতি যশোর-খুলনার বিভিন্ন স্থানে আজো ছড়িয়ে আছে।

খান জাহান আলী একজন সুযোগ্য সিপাহসালাররূপে যশোর-খুলনা এলাকায় সামরিক বিজয় সাধন করেন; কিন্তু সামরিক জেনারেলের চাইতেও একজন মানবপ্রেমিক দরবেশরূপেই তিনি জনমনে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। তাঁর ইসলাম প্রচার, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, জনসেবা, চরিত্র মাধুর্য এ এলাকার জনগণের ওপর সীমাহীন প্রভাব বিস্তার করেছে। শাসক ও সিপাহসালারদের চাইতেও এ এলাকার জনগণের কাছে তিনি একজন যথার্থ মুসলমান, আল্লাহর একজন অত্যন্ত অনুগত

www.nagorikpathagar.org

বান্দাহ, একজন মানবপ্রেমিক এবং একজন সুফী দরবেশরূপেই বেশী পরিচিত।

খান জাহান আলী প্রথমে বর্তমান যশোর শহর থেকে প্রায় এগারো মাইল উত্তরবর্তী বারো বাজারে আগমন করেন। প্রাচীন নগরী বারো বাজার তখন উত্তর বংগের মহাস্থানের মতোই নিম্ন-বংগের বৌদ্ধ ও হিন্দু সভ্যতার পীঠস্থান ছিলো। খান জাহান আলীর মাধ্যমে এ এলাকার মানুষ ইসলামের মুক্তিপথের সন্ধান লাভ করেন। খান জাহান আলী এখানে বহু জনহিতকর কাজ করেন এবং একটি সুরম্য মসজিদ গড়ে তোলেন। বারোবাজারে ইসলাম প্রচারকদের আরো বহু নিদর্শন রয়েছে। বারোজন ইসলামপ্রচারকের কর্মকাণ্ডের স্মৃতি বহন করার কারণেই এ এলাকার নাম বারোবাজার হয়েছে। ইসলামপ্রচারের সাথে সংশ্লিষ্ট এমনি আরো বহু নাম এ এলাকার আশপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। বারোবাজার থেকে মাত্র এক মাইল পুবে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত গাযী-কালু-চম্পাবতির মাযার, তার আশপাশের বিভিন্ন নিদর্শন ও নানা জনশ্রুতি প্রমাণ করে যে, পুঁথির গাযী-কালু এই এলাকায় ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন। বারোবাজারের আশেপাশে মুরাদগড়, সাদিকপুর, হাসিল বাগ, এনায়েতপুর, রহমতপুর প্রভৃতি গ্রাম বিভিন্ন ইসলাম প্রচারকের স্মৃতি বহন করছে। খান জাহান আলী বারোবাজার থেকে যশোরের বিভিন্নস্থানে তাঁর সাথিগণকে প্রেরণ করেন। গরীব শাহ, বাহরাম শাহ, বুড়া খাঁ, ফতেহ খাঁ তাঁদের অন্যতম। যশোর শহরের পুরাতন কসবা এলাকায় গরীব শাহ-এর মাজার আজো এই ইসলাম প্রচারকের স্মৃতি বহন করছে।[২৫] খান জাহান আলীর অন্যতম প্রধান শাগরিদ পীর আলী নামে পরিচিত মোহাম্মদ তাহির বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। তাঁদের উত্তর-পুরুষরা এ অঞ্চলে পীরালী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হয়।

খান জাহান আলীর কর্মস্থল ছিলো যশোর ও খুলনার সমগ্র এলাকা। বাগেরহাটে শহর নির্মাণ করে তিনি এই শহরের নাম দিয়েছিলেন খলিফতাবাদ। এই নাম নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ-এর উপাধির সাথে যুক্ত বলে মনে হয়। নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ খলিফা উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ এর নাম এখন সাধারণ মানুষের কাছে বিস্মৃতপ্রায়; কিন্তু দক্ষিণ বাংলার ইসলাম প্রচারক দরবেশ-সিপাহসালার খান জাহান আলীর নাম আজো ঘরে ঘরে উচ্চারিত। বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ তাঁর এক মহান কীর্তিরূপে বিদ্যমান।

৮. রুকনউদ্দীন বারবাক শাহ ও ইসমাঈল গাযী মক্কী

নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ-এর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র রুকনউদ্দীন বারবাক শাহ-এর (১৪৫৫-৭৬) শাসনামল নানা দিক দিয়ে আরেকটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। বারবাক শাহ

২৫. বারোবাজার ও যশোর শহরের মধ্যবর্তী স্থানে ছাতিয়ানতলা পরবর্তী যুগের বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক ও মুক্তি সংগ্রামী মুন্সী মেহেরউল্লাহর এবং এনায়েতপুর শরিয়তে ইসলাম পত্রিকার সম্পাদক ইসলাম প্রচারক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী মওলানা আহমদ আলীর জন্মস্থান।

www.nagorikpathagar.org

সুবিচারক ও সুপণ্ডিত ছিলেন। ইসলামী শাস্ত্রসমূহে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। কাযীগণ কোন বিচার সম্পাদনে অক্ষম হলে বারবাক শাহ স্বয়ং সে দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর রাজ্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিলো। তিনি মুসলমান ও হিন্দু নির্বিশেষে কবি-সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। মক্কার কোরাইশ বংশীয় বিখ্যাত মুজাহিদ-দরবেশ ইসমাঈল গাযী মক্কী তাঁর সেনাপতিরূপে উড়িষ্যার মান্দারন ও কামরূপ জয় করেন। বারবাক শাহ-এর পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে রায়মুকুট উপাধিধারী বৃহস্পতি মিশ্র, শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যের লেখক মালাধর বসু ওরফে গুনরাজ খান, বাংলার বাল্মিকী নামে খ্যাত কৃত্তিবাস, আমীর জৈনুদ্দীন হারাভী, আমীর শাহাবউদ্দীন হাকিম কিরমানী, মনসুর সিরাজী, মালিক ইউসুফ বিন হামিদ, সৈয়দ জালাল, সৈয়দ মুহম্মদ রুকন, সৈয়দ হাসান প্রমুখ শামিল ছিলেন।

সুলতানের উদারতার সুযোগ নিয়ে বর্ণহিন্দুদের একটি দল এ সময় মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক চক্রান্ত শুরু করেছিলো। রাজনীতির ময়দানেও তারা অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছিলো। বারবাক শাহ-এর শাসনামলে অনন্ত সেন, কেদার রায়, ভান্দসী রায়, বিশ্বাস রায়, কুলধর, নারায়ণ দাস, জগদানন্দ রায়, সুনন্দ, কেদার খাঁ, গন্ধর্ব রায়, তরনীসুন্দর শ্রীবৎস, মুকুন্দ প্রমুখ বর্ণহিন্দু উচ্চ রাজকার্যে নিয়োজিত ছিলেন। গৌড়ের দরবারে এ হিন্দু প্রাধান্যের প্রভাব রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হয়েছিলো। ফলে নওমুসলিমগণ ইসলামী জীবন যাপন করার ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন বলেও জানা যায়। ইসলাম ও শির্ক তথা পৌত্তলিকতার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রেখা টেনে নেয়া তাদের জন্য দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। এ সময় থেকেই মুসলিম শাসকদের দরবারে হিন্দু অমাত্যদের প্রতিপত্তি অনেক বেশী বেড়ে যায়। বারবাক শাহ-এর দরবারের অমাত্যদের একটি তালিকা কৃত্তিবাসের বিবরণে পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন ঃ

রাজার ডানে আছে পাত্র জগতানন্দ
তাহার পাছে বস্যা আছে বাক্ষণ সুনন্দ ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্রমিত্রে বস্যা রাজা পরিহাসে মন ॥

রুকনউদ্দীন বারবাক শাহ-এর বিখ্যাত সেনাপতি ইসমাঈল গাযী মক্কী ছিলেন একজন বিশিষ্ট ইসলাম প্রচারক। ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে যেসব সাধক বিভিন্ন শাসনামলে মুসলিম সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে মুসলিম রাজ্য বিস্তারে সাহায্য করেছেন, ইসমাইল গাযী ছিলেন তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। এসব দরবেশ ব্যক্তিত্বের অংশগ্রহণের ফলে সেনাবাহিনীর মনোবল ও উদ্দীপনা বহুগুণে বেড়ে যেতো। এই সর্বত্যাগী মুজাহিদ সিহাপসালারদের নেতৃত্বে একের পর এক বিজয় সম্ভব হয়েছিলো। ইসমাঈল গাযী সে পর্যায়ের একজন শীর্ষস্থানীয় ইসলাম প্রচারক ছিলেন।

'রিসালাতুস শুহাদা' নামে ১৬৩৩ খ্রীস্টাব্দে ফার্সী ভাষায় লিখিত একটি গ্রন্থ থেকে

www.nagorikpathagar.org

জানা যায়, ইসমাঈল গাযী মক্কী ছিলেন মক্কার কোরাইশ বংশীয়। বিভিন্ন বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জনের পর তিনি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে একদল সঙ্গী-সাথিসহ রুকনউদ্দীন বারবাক শাহ-এর রাজত্বকালে লাখনৌতি নগরে আগমন করেন। বিভিন্নমুখী যোগ্যতার কারণে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সুলতানের প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠেন। ইসমাঈল গাযী ছুটিয়াপটিয়া নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করে এলাকাবাসীকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করেন। ফলে তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। উড়িষ্যার রাজা গজপতিকে পরাজিত করে তিনি মান্দারন দুর্গ জয় করেন। এরপর তিনি কামরূপের রাজা কামেশ্বরকে পরাজিত করেন। 'রিসালাতুস শুহাদা' থেকে আরো জানা যায়, ইসমাঈল গাযীর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে কামরূপের রাজা তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং স্বেচ্ছায় ইসলামগ্রহণ করেন। তাঁর বীরত্ব ও গুণাবলীতে মুগ্ধ হয়ে সুলতান বারবাক শাহ তাঁকে পুরস্কৃত করেন। তাঁর মানবিক গুণাবলী ও ইসলাম প্রচারে অসামান্য অবদান সুপণ্ডিত সুলতানকে তাঁর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট ও অনুরক্ত করে তোলে। ইসমাঈল গাযী সব সময়ই তাঁর সামরিক বিজয়কে সাধারণ মানুষের কাছে সত্য, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচারের কাজে লাগাতেন।

ইসমাঈল গাযীর নানামুখী বীরত্বব্যঞ্জক সাফল্যে এবং তাঁর হাতে বহু হিন্দুর ইসলাম গ্রহণের কারণে সুলতানের দরবারের হিন্দু অমাত্যগণ ভীষণ ক্ষিপ্ত ছিলেন। ফলে দরবেশের বিরুদ্ধে তাঁরা চক্রান্ত শুরু করেন। তাঁর কামরূপ বিজয়ের পরপরই ঘোড়াঘাটের হিন্দু সেনাধ্যক্ষ সুলতানের ঘনিষ্ঠ অমাত্য ভান্দসী রায় ইসমাঈল গাযীর অবস্থানের কাছে একটি দুর্গ তৈরি করেন। এরপর ভান্দসী রায় রটনা করেন যে, কামরূপের সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী রাজার সাথে জোট পাকিয়ে ইসমাঈল গাযী স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করছেন। এর পরই বাংলার ইসলাম প্রচারের ইতিহাসের অত্যন্ত কৃতি ও ত্যাগী ব্যক্তিত্ব, মুজাহিদ-দরবেশ ইসমাইল গাযী মক্কীকে ১৪৭৪ সালের ৪ঠা জানুয়ারী (৮৭৮ হিজরী) শহীদ করা হয়। রংপুর থেকে বগুড়ার পথে কুড়ি মাইল দক্ষিণে (বর্তমানে রংপুর-বগুড়া প্রধান সড়কের পাশে) কাঁটাদুয়ার গ্রামে এবং পশ্চিম বংগের হুগলী জেলার গড়মান্দারনে তাঁর দু'টি মাযার রয়েছে। তাঁর মস্তক ও ধড় পৃথকভাবে এ দু'টি স্থানে দাফন করা হয়। ভান্দসী রায়ের চক্রান্তের কথা বারবাক শাহ পরে বুঝতে পেরেছিলেন। এজন্য তিনি খুবই অনুতপ্ত হয়েছিলেন।

রুকনউদ্দীন বারবাক শাহ-এর শাসনামলে প্রখ্যাত দরবেশ ও ইসলাম প্রচারক শাহ জালাল দক্ষিণীকেও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এ ব্যাপারে সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ 'তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি দেখে গৌড়ের সুলতানের সন্দেহ হল এবং তিনি তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। সুলতানের আদেশে রাজকীয় সৈন্যবাহিনী গিয়ে শাহ জালাল দকীনী ও তাঁর অনুগামীদের মাথা কেটে নিয়ে ফেলল।'[২৬] এ ঘটনার সাথে ইসমাঈল গাযী মক্কীর ঘটনায় মিল আছে বলেই মনে হয়।

২৬. সুখময় মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, পৃঃ ১৫৯।

www.nagorikpathagar.org

বারবাক শাহ-এর গুণাবলীর প্রশংসা করে সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ 'তিনি (বারবাক শাহ) বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান তো বটেই, সর্বদেশের ও সর্বকালের নরপতিদের মধ্যে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে বললেও অত্যুক্তি হবে না।'[২৭]

শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহ

রুকনউদ্দীন বারবাক শাহ-এর পুত্র শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-৮০) আরেকজন বিখ্যাত শাসক ছিলেন। বুকানন তাঁকে 'a very learned prince' বলে উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক তাঁকে একাধারে উচ্চ শিক্ষিত, ধর্মপ্রাণ ও শাসন-দক্ষ বলে প্রশংসা করেছেন। তাবাকাত-ই-আকবরীর ভাষায় তিনি ছিলেন 'ধৈর্যশীল, প্রজাহিতৈষী ও ধর্মনিষ্ঠ বাদশাহ'। ফিরিশতা লিখেছেন ঃ "তিনি ছিলেন বিদ্যান, ধার্মিক ও কৌশলী নরপতি। তিনি ভালো কাজ করতে আদেশ দিতেন এবং মন্দ কাজ নিষিদ্ধ করতেন। তাঁর আমলে কেউ প্রকাশ্যে মদ পান করতে বা তাঁর আদেশ অমান্য করতে সাহসী হতো না। মাঝে মাঝে তিনি নেতৃস্থানীয় আলিমগণকে তাঁর সভায় ডেকে বলতেন, 'আপনারা ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি করতে গিয়ে কারও পক্ষ অবলম্বন করবেন না, তা করলে আপনাদের সাথে আমার সম্পর্কের অবনতি ঘটবে।' তিনি নিজে বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। কোন মামলায় কাজীগণ ব্যর্থ হলে, সেগুলির অধিকাংশেরই তিনি নিজে নিষ্পত্তি করতেন।"

ইউসুফ শাহ ও তাঁর কর্মচারীদের আদেশে তাঁর রাজত্বকালে দেশে বহু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কায়েম হয়। এগুলির মধ্যে মালদহের সাকোমোহন মসজিদ, গৌড়ের কদম রসূল মসজিদ, দরসবাড়ী জামে মসজিদ, তাঁতীপাড়া মসজিদ, গৌড়ের লোটন মসজিদ ও চামকাটি মসজিদ এবং পাণ্ডুয়ার বাইশ দরওয়াজা মসজিদ উল্লেখযোগ্য। গৌড়, জাহানাবাদ (রাজশাহী), সিলেট, ছোট পাণ্ডুয়া (হুগলী), হযরত পাণ্ডুয়া (মালদহ), ঢাকা ও চট্টগ্রামে তাঁর আমলের শিলালিপি পাওয়া গেছে। ইউসুফ শাহ-এর আমলে পশ্চিম বংগে মুসলিম অধিকার আরো বিস্তৃত হয়েছিলো।

ইউসুফ শাহ-এর পর জালালউদ্দীন ফতেহ শাহ (১৪৮২-৮৭) বাংলার সুলতান হন। তাঁর সম্পর্কে ডক্টর আবদুল করিম লিখেছেন ঃ 'গৌড়ের মাহদীপুরস্থ গণমন্ত মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপিতে দাবি করা হয়েছে যে, ফতেহ শাহ ছিলেন '.... জলে ও স্থলে সাহসী যোদ্ধা', 'কোরআন শরীফের রহস্য উদঘাটনকারী ' এবং 'ধর্মীয় ও শারীরিক বিদ্যায় পারদর্শী'। এই সূত্রে মনে হয় যে, ফতেহ শাহ রাজনীতি এবং সমরনীতি ছাড়াও ধর্মশাস্ত্রে এবং ভেষজ শাস্ত্রে জ্ঞানী ছিলেন।'[২৮]

জালালউদ্দীন ফতেহ শাহ-এর রাজত্বকালে বাংলাদেশে ইসলামী আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে শৈথিল্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সময় হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের অত্যাচার ও বিদ্বেষের নানা কাহিনী প্রচার করে হিন্দুদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার

২৭. পূর্বোক্ত পৃঃ ১৮২।
২৮. ডক্টর আবদুল করিম ঃ বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল), পৃঃ ৩৩৪-৩৩৫।

www.nagorikpathagar.org

একটি চেষ্টাও হিন্দু লেখকদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বর্ণহিন্দুদের মুসলিমবিরোধী আন্দোলনও এ সময় থেকেই দানা বাঁধতে শুরু করে। ফতেহ শাহ-এর শাসনের শেষ বছরে ১৪৮৬ সালে ঘোড়ষ শতকের হিন্দু ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের নেতা চৈতন্যদেবের জন্ম হয়। তার পর থেকেই বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ধারাও নানাভাবে ব্যাহত হতে থাকে।

৯. চার হাবশী সুলতান

জালালউদ্দীন ফতেহ শাহ-এর পর ১৪৮৬ থেকে ১৪৯৩ সাল পর্যন্ত চারজন হাবশী সুলতান বাংলায় রাজত্ব করেন। তাঁদের মধ্যে সাইফউদ্দীন ফিরূজ শাহ-এর তিন বছরের শাসনকাল ছিলো সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম। ঐতিহাসিকগণ তাঁর যোগ্যতা, মহত্ত্ব ও বদান্যতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। দানবীর হিসাবে তিনি ছিলেন বাংলার সকল শাসকদের মধ্যে অতুলনীয়। পূর্ববর্তী রাজা ও সুলতানগণ যেসব ধন-সম্পদ নিজেদের কোষাগারে পুঞ্জিভূত করেছিলেন, সাইফউদ্দীন ফিরূজ শাহ অল্প সময়ের মধ্যে তা গরীবদেরকে বিলিয়ে দেন। রিয়াজ-উস-সালাতীন-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, একবার তিনি একদিনেই গরীবদেরকে এক লাখ টাকা দান করেছিলেন। এ ধরনের দান-খয়রাত তাঁর অমাত্যগণ পছন্দ করতেন না। সচিবরা বলাবলি করতেন যে, এই হাবশী সুলতান বিনা কষ্টে টাকার মালিক হয়েছেন বলে তার কদর বুঝতে পারছেন না। তাঁরা একবার এক লাখ টাকা একটি ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে রাখেন, যাতে সুলতান তা নিজের চোখে দেখে লাখ টাকার পরিমাণ বুঝতে পারেন। এ টাকা দেখে সুলতান জানতে চাইলেন, 'এগুলি এভাবে পড়ে আছে কেন?' সচিবরা বললেন, 'এতো টাকাই আপনি গরীবদের দিতে বলেছেন।' সুলতান বললেন,'এত কম টাকায় কী করে কুলাবে? এর সাথে আরো এক লাখ টাকা যোগ করো।' সচিবরা এতে অপ্রস্তুত হয়ে সব টাকা ভিখারীদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। এ কাহিনী সম্পর্কে সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ 'গল্পটি সত্য হলে বলতে হবে দানের দিক দিয়ে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ বাংলার সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। গল্পটি যদি অক্ষরে অক্ষরে সত্য না-ও হয় তাহলেও ফিরোজ শাহ যে মহৎ ও দানবীর ছিলেন, তা এর থেকে বুঝা যায়। কারণ, সম্পূর্ণ বিনা কারণে কারও নামে এ রকম গল্প রটে না।'[২৯]

রিয়াজ-উস-সালাতীন-এ উল্লেখ আছে যে, সাইফউদ্দিন ফিরূজ শাহ গৌড়ে একটি মসজিদ, একটি মিনার ও একটি জলাধার তৈরি করান। ফিরূজ মিনার আজো তাঁর স্মৃতি বহন করছে।

২৯. সুশময় মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, সপ্তম অধ্যায়-পৃঃ ৯০।

www.nagorikpathagar.org

১০. আলাউদ্দীন হোসেন শাহ

হাবশী সুলতানদের পর ১৪৯৩ থেকে ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত হোসেনশাহী বংশের চার জন শাসক বাংলার সুলতান ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম ছিলেন। তিনি দেশময় শান্তি-শৃঙ্খলা কায়েম করেন। তাঁর রাজ্যের সীমা বাংলার প্রায় সমগ্র এলাকা এবং বিহারের এক বিরাট অংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিলো। ছাব্বিশ বছরের দীর্ঘ শাসনামলে হোসেন শাহ তাঁর রাজত্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বহু জায়গায় লঙ্গরখানা স্থাপন করেন, ক্রোশ অন্তর দীঘি এবং আযান অন্তর মসজিদ নির্মাণ করেন। অনেক সুন্দর মসজিদ ও প্রাসাদ ফটক তাঁর আমলে নির্মিত হয়। গৌড়ের দক্ষিণ উপকণ্ঠে ফিরূজপুরের ছোট সোনা মসজিদ, গৌড়ের গুমটি ফটক, বীরভূমের পুব সীমানায় বাদশাহী সড়ক তাঁর কীর্তির স্বাক্ষর বহন করছে। হোসেন শাহ-এর রাজত্বকালে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য নতুন মসজিদ নির্মাণ করা হয়। তার মধ্যে ৩১টি মসজিদে তাঁর শিলালিপি পাওয়া গেছে। ঢাকার মাচাইন ও ধামরাইতে তিনি দু'টি জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। গৌড়ে আঁখি সিরাজউদ্দীনের মাযারে দুটি দরজা ও একটি জলসত্র তিনি নির্মাণ করেন। বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে মওলানা হামিদউদ্দীন দানিশমান্দের মাযারের পাশে জলাশয় খনন করেন। শায়খ নূরকুত্ব উল আলম-এর মাযার সংলগ্ন দানসত্রগুলির খরচ চালানোর জন্য তিনি অনেক জমি দান করেন।

হোসেন শাহ-এর রাজত্বকালের ৫৮টি শিলালিপি এ যাবত পাওয়া গেছে। কয়েকটি ছাড়া সবগুলিতে তাঁর নাম আছে। আর কোন সুলতানের আমলের এত বেশী শিলালিপি পাওয়া যায়নি। রংপুরের কাঁটাদুয়ারে ইসমাঈল গাযী মক্কীর মাযারে প্রাপ্ত শিলালিপিতে হোসেন শাহকে 'মুসলিম পুরুষ ও মহিলাদের প্রতি দয়াশীল', জাহানাবাদের (রাজশাহী) শিলালিপিতে 'যাঁর উদ্যোগে ইসলাম বর্ধিত হচ্ছে' বিশেষণে তাঁকে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকরূপে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ-এর খ্যাতি সুবিদিত। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়। এ ছাড়া 'ধর্ম ও বিজ্ঞান শিক্ষা এবং কেবলমাত্র যে সব আদেশ সত্য সেগুলি সম্পর্কে নির্দেশ দেয়ার জন্য' তিনি ৯০৭ হিজরীতে একটি মাদ্রাসা কায়েম করেন। শিক্ষা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে তাঁর রাজত্বকালে আরো বহু মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি আলিম ও দরবেশগণকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। ১৫০৫ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে মুহাম্মদ বিন ইয়াজদান বখ্শ সুলতান হোসেন শাহ-এর নির্দেশে বুখারী শরীফ-এর তিন খণ্ড নকল সম্পূর্ণ করেন।

হোসেন শাহ-এর দরবারে মুসলিম আমীরদের সাথে বহু হিন্দু আমীর-ওমরাহ ছিলেন। হিন্দুদেরকে তিনি বহু উচ্চ পদে নিয়োগ করেন। তাঁর রাজত্বকালে

www.nagorikpathagar.org

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। হোসেন শাহ-এর রাজত্বকালেই পর্তুগীজরা প্রথম বাংলাদেশে আসে। ভাস্কো দা গামা তাঁর সময়ই ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে কালিকট বন্দরে অবতরণ করেন।

হোসেন শাহ-এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নাসিরউদ্দিন নসরত শাহ বাংলার হিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫১৯ থেকে ১৫৩২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এক যুগেরও অধিককাল তিনি যোগ্যতার সাথে রাজ্য শাসন করেন। তাঁর রাজ্যের আয়তন ছিলো বিশাল। নসরত শাহ-এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় আলাউদ্দীন ফিরূজ শাহ (১৫৩২-৩৩) বাংলার সুলতান হন।

এর পর তাঁর চাচা গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৫৩৩-৩৮) বাংলার শাসক ছিলেন। গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ-এর মৃত্যুর সাথে সাথে দু'শ বছরের স্বাধীন সুলতানী আমল শেষ হয়।

১১. সাইত্রিশ বছরের আফগান শাসন

গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ-এর পর শেরশাহ সুর ১৫৩৯ খ্রীস্টাব্দে বাংলায় আফগান শাসন কায়েম করেন। ১৫৪৫ খ্রীস্টাব্দে শেরশাহ-এর মৃত্যুর পর দিল্লীতে মুগল সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বাংলায় ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত আফগানদের শাসন অব্যাহত থাকে। আফগানদের এই ৩৭ বছরের শাসনামল বাংলার ইতিহাসে নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। সুলতানী আমলের শেষ ভাগে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণববাদী আন্দোলন মুসলিম সমাজে নানারূপ বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছিলো। আকিদাগত সে সব ত্রুটি সংশোধনের ক্ষেত্রে আফগান শাসকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বাংলার গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে শেরশাহ-এর নাম বাংলার সর্বকালের সকল শাসকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বাংলার তিনটি ইকলীম বা প্রদেশ— ইকলীম সোনারগাঁও, ইকলীম লাখনৌতি ও ইকলীম সাতগাঁওকে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ১৯টি সরকার ও ৬৮২টি পরগনায়[৩০] ভাগ করেন। আবুল ফযল-এর আইন-ই-আকবরীতে এই ১৯টি প্রশাসনিক বিভাগের বিবরণ পাওয়া যায়। ত্রিপুরা জিলার পশ্চিমাঞ্চল, ঢাকা ও মোমেনশাহী জিলার পূর্বাঞ্চল এবং সিলেট জিলার পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে এরূপ একটি প্রশাসনিক বিভাগের নাম ছিলো সরকার সোনারগাঁও।

আফগান শাসকদের মধ্যে সুলায়মান কররানীর (১৫৬৩-১৫৭২) শাসনকাল ছিলো সবচে গৌরবোজ্জ্বল। সুদক্ষ শাসক ও বিজেতা এই কররানী পাঠান শাসকের রাজ্যসীমা দক্ষিণে পুরী, পশ্চিমে শোন নদ ও পুবে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। এ সময় দিল্লী, অযোধ্যা, গোয়ালিয়র, এলাহাবাদ প্রভৃতি এলাকা মুগল অধিকারভুক্ত হয়। সে সব এলাকার অধিকাংশ শাসক বাংলাদেশে সুলায়মান কররানীর আশ্রয় পেয়েছিলেন।

৩০. পরগনা বা পারগনাহ্ ফারসী শব্দ, যা কয়েকটি গ্রামের সমষ্টিকে বুঝায়।

www.nagorikpathagar.org

বাদায়ুনী উল্লেখ করেন যে, সুলায়মান কররানী এ দেশে ইসলামী শরীয়তের বিধান কার্যকর করার জন্য যত্নবান হয়েছিলেন এবং 'বিশ্বাসহীনতার কেন্দ্রস্থল' কটক ও বেনারস জয় করেছিলেন। তিনি পুরী বা জগন্নাথকে দারুল ইসলামে পরিণত করেছিলেন।

সুলায়মানের দ্বিতীয় পুত্র দাউদ খান কররানী (১৫৭২-১৫৭৬) ছিলেন বাংলার শেষ আফগান শাসক। ১৫৭৬ সালে দিল্লীর মুগল বাদশাহ আকবরের সাথে যুদ্ধে তাঁর পতন হয়। বিখ্যাত বীর কালাপাহাড় সুলায়মান কররানী ও দাউদ খান কররানীর সেনাপতি ছিলেন। কালাপাহাড়ের নেতৃত্বেই সুলায়মানের শাসনামলে উড়িষ্যায় মুসলিম শাসন কায়েম হয়।

১২. বাংলায় মুগল শাসন ঃ ঈসা খাঁর প্রতিরোধ সংগ্রাম

১৫৭৬ সালে বাংলায় আফগান শাসনের অবসান ঘটে। এর পরও প্রায় তিন যুগ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুগল কর্তৃত্বের বাইরে স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দের আগে পর্যন্ত বাংলায় মুগলদের কর্তৃত্ব ছিলো একেবারেই সীমিত এলাকায়, উত্তর ও পশ্চিম বংগের কয়েকটি সেনা ছাউনীকে ঘিরে। বাকী এলাকায় আফগান নায়কগণ নিজেদের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে মসনদে আ'লা ঈসা খাঁ, ওসমান খাঁ লোহানী, মাসুম খান কাবুলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আইন-ই-আকবরী থেকে জানা যায়, ১৫৭৬ সালে দাউদ খান কররানী ও ঈসা খাঁ একযোগে পুব ও পশ্চিমে মুগল বাহিনীর ওপর হামলা চালান। দাউদ উড়িষ্যায় প্রতিরোধের ঝাণ্ডা তোলেন এবং উত্তর ও পশ্চিম বংগ দখল করেন। অন্যদিকে ঈসা খাঁ পূর্বাঞ্চলীয় নদীগুলিতে সম্রাটের নৌবহরে হামলা পরিচালনা করেন। ১৫৭৬ সালে আফগানদের শাসন অবসানের পর কররানীদের অনুগত সামন্ত ঈসা খাঁ সোনারগাও-এর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৫৮৪ সাল নাগাদ তিনি উত্তর-পুবে সিলেট, পশ্চিমে ঢাকা ও মোমেনশাহী, এমনকি যমুনার পুব দিকে সমগ্র এলাকার বিস্তীর্ণ জমিদারির মালিক হন। তিনি বাংলার বারো ভুইয়াদের মধ্যে একটি সামরিক মৈত্রীজোট গঠন করেন। সমসাময়িক ইংরেজ পর্যটক র‍্যালফফিচ ঈসা খাঁকে তৎকালীন 'পূর্ব বাংলার প্রধান রাজা এবং সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অন্য সকল বিদ্রোহী রাজার নেতা' বলে উল্লেখ করেছেন।

আকবরের ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ এবং তাঁর দীন-ই-ইলাহী নামক নতুন ধর্মমত প্রচারের বিরুদ্ধে জৌনপুরের কাযীর ফতওয়া এই প্রতিরোধ সংগ্রামে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে কাজ করে। এর ফলে বাংলার পাঠান নায়কগণ ধর্মদ্রোহী সম্রাটের বিরুদ্ধে আরো বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েন। সে ফতওয়া তাঁদের প্রতিরোধ সংগ্রামে

www.nagorikpathagar.org

জনসমর্থনের ভিত্তি রচনায়ও সহায়ক হয়। আকবরের জীবদ্দশায় এ এলাকায় মুগলদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি।

১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দে ঈসা খাঁর মৃত্যু হয়। এরপর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মুসা খাঁ মুগল শাসনের বিরুদ্ধে পিতার মতোই বারো ভুইয়াদের সামরিক মৈত্রীজোটের নেতা ছিলেন। তিনি তাঁর তিন ভাই আবদুল্লাহ খাঁ, দাউদ খাঁ ও মাহমুদ খাঁ এবং অন্যান্য জমিদারকে সাথে নিয়ে আরো প্রায় এক যুগ পর্যন্ত মুগলদের অভিযান প্রতিহত করতে সক্ষম হন। ১৬০৫ সালে আকবরের মৃত্যু হয়। এরপর সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালে ১৬০৮ সালে মুজাদ্দিদে আলফিসানীর অন্যতম অনুসারী সুবাহদার ইসলাম খাঁ চিশতী বাংলায় মুগল শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬১০ খ্রীস্টাব্দে তিনি আকবর নগর (রাজমহল) থেকে জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকা) রাজধানী স্থানান্তর করেন। মুসা খাঁ শীতলক্ষাকে প্রতিরক্ষা বেষ্টনী হিসাবে ব্যবহার করে নদ-নদী ও খালসমূহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রণতরী সমাবেশ করে ইসলাম খাঁর অভিযান মোকাবিলা করেন। শেষে ১৬১১ খ্রীস্টাব্দে অন্যান্য জমিদারকে সাথে নিয়ে তিনি ইসলাম খাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

১৩. মুগল সুবাহদার ও স্বাধীন নবাবদের শাসন

১৬০৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে বাংলায় মুগলদের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর শতাধিক বছরের সুবাহদারী শাসনামলে বাংলাদেশ দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসনভুক্ত ছিলো। এই আমলের শাসকদের মধ্যে সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজা (১৬৩৯-৬০), শায়েস্তা খান (১৬৬৪-৭৮ ও ১৬৮০-৮৮) এবং আওরঙ্গযীবের পৌত্র আযীম-উস-শানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের সকলের মধ্যে শায়েস্তা খান ইসলাম প্রচার, ইসলামের বিধি-বিধান অনুসরণ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কাজে অগ্রণী ছিলেন। তাঁর আমলে জিনিস-পত্রের সুলভ মূল্য ও সহজ লভ্যতা এবং টাকায় আট মণ চাউল বেচা-কেনার ঘটনা কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে।

আওরঙ্গযীবের শাসনামলে (১৬৫৮-১৭০৭) প্রথমে দীউয়ান ও পরে সুবাহদার নিযুক্ত হন মুরশিদকুলী খাঁ। আওরঙ্গযীবের মৃত্যুর পর বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনায় তাঁর উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতা, আমীর-উমরাহদের ষড়যন্ত্র, অভ্যন্তরীণ গোলযোগ প্রভৃতি নানা কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে মুরশিদকুলী খাঁ ১৭১৭ থেকে ১৭২৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় স্বাধীনভাবে বাংলাদেশ শাসন করেন। মুরশিদকুলী খাঁর আগে অন্যান্য মুগল সুবাহদারের শাসনামলে সুবাহদার, দীউয়ান, বখশী ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা উত্তর ভারত থেকে এ দেশে আসতেন। স্বল্প সময়ের মেয়াদ শেষে তাঁরা এখান থেকে ফিরে যেতেন উত্তর ভারতে। এজন্য বাংলাদেশের সাথে তাঁদের স্থায়ী যোগসূত্র সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ কম ছিলো। কিন্তু মুরশিদকুলী খাঁর সময় থেকে শাসকগণ এখানকার জাতীয় জীবনের সাথে একাত্ম হয়ে যান। এ সময় থেকে দেশের সম্পদ বাইরে স্থানান্তরের

www.nagorikpathagar.org

একশ বছরের পুরনো ধারাটিও বন্ধ হয়। মুরশিদকুলী খাঁ ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণ এ দেশকেই তাঁদের স্বদেশরূপে গ্রহণ করেন।

মুরশিদকুলী খাঁ ১৭২২ সালে শেরশাহের আমলের ১৯টি সরকার ও ৬৮২টি পরগণাকে ১৩টি চাকলা ও ১৬৬০টি পরগনায় পুনর্বিন্যাস করেন। সরকার সোনারগাও, সরকার বাজুহা, সরকার বাকলা ও সরকার ফতেহাবাদের সম্পূর্ণ এলাকা এবং সরকার মাহমুদাবাদ ও সরকার ঘোড়াঘাটের পুব দিকের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিলো চাকলা জাহাঙ্গীর নগর।

রিয়াজ-উস-সালাতীন প্রণেতার মতে, মুরশিদকুলী খাঁ শায়েস্তা খানের সাথে তুলনীয় একজন বিশিষ্ট শাসক ছিলেন। একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম শাসকরূপে তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ, প্রজাদের কল্যাণ সাধন, তাদের অভিযোগের প্রতিকার প্রভৃতি কাজে আন্তরিকভাবে যত্নবান ছিলেন।

মুরশিদকুলী খাঁ জাহাঙ্গীর নগর থেকে মুরশিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তর করেন। এ কারণে এ সময় থেকে পরবর্তীকালের সব ক'জন স্বাধীন শাসক মুরশিদাবাদের নবাব নামে ইতিহাসে পরিচিত হয়েছেন। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা এই নবাবদের রাজ্যভুক্ত ছিলো। মুরশিদকুলী খাঁর পর তাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন (১৭২৭-৩৯), সরফরাজ খান (১৭৩৯-৪০), আলীবর্দী খান (১৭৪০-৫৬) ও সিরাজউদ্দৌলাহ (১৭৫৬-৫৭) মুরশিদাবাদের নবাব ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

নবম অধ্যায়

মুসলিম অবদানের মূল্যায়ন

১. মুসলিম সমাজ গঠনের বৈশিষ্ট্য

ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে ১২০৩ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে বাংলায় মুসলিম শাসন কায়েম হয়। এর আগে দীর্ঘ সময় ধরে ইসলাম প্রচারক আলিম ও সুফী-দরবেশগণ সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে এ দেশে ইসলাম প্রচার করেন। এই ত্যাগী পুরুষগণের ব্যক্তিগত অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে এ দেশের মানুষের দীর্ঘকালীন মুক্তিসংগ্রাম শক্তিশালী হয় এবং তা সফল পরিণতি লাভ করে। ইসলাম প্রচারকগণ জনগণের চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস ও আচরণের পুনর্গঠন করেন। তাদের জীবন থেকে দাসত্বের উপসর্গসমূহ দূর করেন। তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের নব রূপায়নে যত্নশীল ভূমিকা পালন করেন। গুরুত্ব ও স্থায়িত্বের বিচারে তাঁদের প্রচার এবং সেবা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের অবদান ছিলো মুসলিম বিজেতা, সেনাপতি ও শাসনকর্তাদের চাইতে অনেক বেশী উজ্জ্বল, বলিষ্ঠ, সুদূরপ্রসারী এবং গভীর প্রভাব বিস্তারক।

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

ক. ইসলাম এদেশে কোন রাজশক্তির জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রচারকগণ ইসলামের প্রতি সামাজিক ও নৈতিক সমর্থনের ভিত্তি রচনা করেন। সে ভিত্তির ওপরই এখানে মুসলমানদের রাজনৈতিক বিজয় সূচীত হয়।

খ. প্রচারকগণ প্রধানত গ্রাম এলাকায়, জনগণের মুখের ভাষায় ইসলামের দাওয়াত প্রচার করেন।

গ. প্রচারকগণ অন্যের নযর-নিয়ায বা দান-দক্ষিণার ওপর নির্ভরশীল ছিলেন না। তাঁদের আস্তানাগুলি ছিলো একই সাথে ভুখা মানুষের জন্য লঙ্গরখানা, সমাজের লোকদের জ্ঞান-চর্চার কেন্দ্র এবং নির্যাতিত ও অসহায়দের আশ্রয়স্থল।

ঘ. ইসলাম প্রচারকগণ ছিলেন জালিমের বিরুদ্ধে মজলুম মানুষের পক্ষের শক্তি। সমাজের অত্যাচারীশ্রেণীর বিরুদ্ধে নির্যাতিত সাধারণ মানুষের পক্ষ হয়ে তাঁরা আপোসহীন লড়াই করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

ঙ. ধর্মান্তরের বিপুল সংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশেই ইসলাম প্রচারকগণ সবচে বেশী সফল হয়েছেন। বিশ্বের মোট মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা প্রায় দশ ভাগই বাস করেন বাংলাদেশে। দুনিয়ার আর কোন একটি মাত্র দেশে একই ভাষাভাষী এতো অধিক সংখ্যক মুসলমান বাস করেন না।

চ. শাসকদের তরবারী এদেশে ইসলাম প্রচারে কোন মুখ্য ভূমিকা পালন করেনি। প্রচারকদের কারামত বা অলৌকিক মাহাত্ম্যও এ দেশে ইসলামের সাফল্যের কারণ ছিলো না। ইসলামের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য, সাম্য, মৈত্রী ও গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং মানবিক মর্যাদার পথে ইসলামের উদাত্ত আহবানই এ দেশের মানুষের ব্যাপকভাবে ইসলাম গ্রহণের কারণ ছিলো।

ছ. মুসলিম রাজ্য বিস্তার, মুসলিম রাষ্ট্রের সংহতি বিধান এবং জনগণের ঈমান ও অধিকার সংরক্ষণে ইসলাম প্রচারক আলেম ও মুজাহিদদের ভূমিকা ছিলো অন্য সকলের ভূমিকার তুলনায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

জ. ইসলামের উন্নত শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে ইসলাম প্রচারক আলিমগণ দেশের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে এ দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব জাগরণ ও জোয়ার সৃষ্টি করেছেন। বিশেষ শ্রেণীর একাধিপত্য থেকে তাঁরাই শিক্ষাকে মুক্ত করেন। এ দেশে শিক্ষার সার্বজনীন অধিকারের ধারণা ইসলাম প্রচারকদেরই অবদান।

ঝ. সমাজে ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান বাস্তবায়ন, ইসলামী আদর্শের প্রতিফলন, শাসকগণ যাতে ইসলামী আইন ও কোরআন সুন্নাহবিরোধী কোন কাজ না করেন তার নিশ্চয়তা বিধান, সমাজে উন্নত নৈতিক জীবনের আদর্শ স্থাপন এবং আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য নির্মাণে তাঁরা ছিলেন বিশেষ যত্নবান।

ঞ. আলিমগণ তাঁদের দায়িত্ব পালনে যে কোন ভয়-ভীতি বা প্রভাবকে অতিক্রম করার মতো দৃঢ় মনোবল ও আত্মিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। মুসলিম শাসক ও সর্বস্তরের জনগণের কাছে তাঁরা তাঁদের উন্নত জীবন-পদ্ধতি এবং নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞার জন্য বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

ট. সদর, কাযী, মুহতাসিব প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকালে তাঁরা দৃঢ় মনোবল ও আত্মিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ফলে সমাজে ন্যায়-বিচার ও শান্তি নিশ্চিত হয়েছিলো।

বাংলায় ইসলাম প্রচার ও মুসলিম সমাজ গঠনে এ সকল উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি বেশ কিছু দুর্বলতাও চিহ্নিত করা যায়। তার মধ্যে সবচে উল্লেখ্য হলো বাংলায় মুসলমানদের প্রাথমিক সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় সচেতনতার অভাব। দ্বিতীয় দুর্বলতাটি ইসলাম প্রচারের শেষ যুগের একশ্রেণীর সুফীর আকীদার সাথে

www.nagorikpathagar.org

সম্পৃক্ত।

ইসলামের আগমনকালে পৌত্তলিক ধর্ম ও সংস্কৃতিই ছিলো বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়। তার আগেই পৌত্তলিকতাবাদী ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ছাড়া অন্য সব ধর্মের ও সংস্কৃতির পরিচয় এ দেশে কার্যত লোপ পেয়েছিলো। গোত্র, বর্ণ ও ভৌগোলিক অঞ্চলভেদে এ ধর্ম অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত ছিলো। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মীয় প্রথা-পদ্ধতির সমর্থনে দার্শনিক ব্যাখ্যা ও মতবাদ দাঁড় করিয়েছিলো। এটি ছিলো সমগ্র ভারতেরই অভিন্ন চেহারা। অসংখ্যভাগে বিভক্ত এ সব ধর্ম ও সংস্কৃতিকে মুসলমানরা এক কথায় হিন্দু ধর্ম নাম দিয়েছিলো। বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসনের মুখে হিন্দু সমাজে আত্মগোপন করেছিলো। বিশেষত বাংলায় বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের সংমিশ্রণে সৃষ্ট নাথ ও তান্ত্রিক ধর্ম যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলো। এ পটভূমিতেই ইসলামী আদর্শে মুগ্ধ হয়ে হিন্দু এবং হিন্দু সমাজে আত্মগোপনকারী নির্যাতিত বৌদ্ধ ও জৈনরা ইসলাম গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশে ব্যাপকভিত্তিক ইসলাম প্রচার সংগঠিত হয় মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কয়েকশ' বছর পর। নও-মুসলিমদের জীবন থেকে তাদের পুরুষানুক্রমে লালিত বদ্ধমূল কুসংস্কারগুলি সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার জন্য যে সচেতন প্রয়াস ও সর্বাত্মক সংগ্রাম প্রয়োজন, নানা কারণে এখানে তা পরিচালিত হতে পারেনি। ইসলাম প্রচারকদের চেষ্টা-প্রচেষ্টায় নও-মুসলিমদের জীবন থেকে পৌত্তলিকতার প্রত্যক্ষ উপাদান মূর্তি-প্রতিমা তথা মূর্তি পূজার বড় শির্ক দূর হয়েছিলো। কিন্তু তাদের অবচেতন মন থেকে শির্কের শিকড়গুলি সম্পূর্ণরূপে উপড়ে ফেলার জন্য যে যত্ন প্রয়োজন, তা এখানে সম্ভব হয়নি। ফলে নবগঠিত মুসলিম সমাজে হিন্দুদের দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের অনুকরণে মুহররমের তাজিয়া তৈরি ও দশম দিনে মঞ্জিল-মাটির ব্যবস্থা চালু হয়েছে; হিন্দু সমাজের গুরু-পূজার অনুকরণে মুসলিম সমাজে পীরপূজা, হিন্দু তীর্থস্থানের মতো পীরের দরগাহকে তীর্থস্থানে রূপান্তর, হিন্দু পুরোহিততন্ত্রের দেখাদেখি মুসলিম সমাজে মোল্লাশ্রেণীর উদ্ভব, হিন্দুদের সমুদ্র-বন্দনার অনুকরণে মুসলমানদের খোওয়াজ খিজিরের বন্দনা, হিন্দুদের মতোই কলেরা-বসন্তের প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য ওলা বিবি ও শীতলা দেবীর নামে শিরনী-মানতের ব্যবস্থা, দৈনন্দিন কায়-কারবারে হিন্দুদের মতো শুভ-অশুভের বাছ-বিচার প্রভৃতি কুসংস্কার মুসলিম সমাজের বিশ্বাস ও আচরণে আসন গেড়ে বসে।

মুসলিম সমাজে এ ধরনের অবক্ষয় বিশেষত সে সময়গুলিতেই দেখা গেছে, যখন ইসলাম প্রচারের ধারা দুর্বল হয়েছে। শির্ক, কুফরী, অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে কোন ইসলাম প্রচারক ইন্তিকাল করার পর তাঁর কবরকে ঘিরেও ইসলামী আকীদাবিরোধী নানা কর্মকাণ্ড জেঁকে বসেছে।

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর রসূল (স.) ইসলামবিরোধী রীতি-নীতি বাতিল এবং মুসলমানদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এমনকি

www.nagorikpathagar.org

ইহুদীদের পাগড়ির সাথে মুসলমানদের পাগড়ির স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি মুসলমানদেরকে পাগড়ির নিচে টুপী পরার নির্দেশ দিয়েছেন। বাংলায় মুসলিম সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে রসূল (স)-এর গৃহীত নীতির অনুরূপ সতর্ক নীতি ও পদ্ধতি এখানে অনুসরণ করা হয়নি। ফলে এখানকার মুসলিম সমাজে স্বকীয় সাংস্কৃতিক চেতনা পুষ্টি অর্জন করতে পারেনি। তাদের দৈনন্দিন আচার-আচরণ, বিয়ে-শাদী, উৎসব-আনন্দ এবং শোক ও বেদনা প্রকাশের অনুষ্ঠান– এমনকি ইবাদাত-বন্দেগীতেও পূর্বপুরুষদের মুশরেকী রীতি-নীতির প্রতি ঝোঁক থেকে যায়।

দ্বিতীয় দুর্বলতাটি দেখা দেয় এ দেশে ইসলাম প্রচারের জোয়ার স্তিমিত হওয়ার পর। পনেরো শতকের পর থেকে এখানে একদল সুফীর আবির্ভাব হয়, যাঁরা শরীয়তের বাইরের কোন পদ্ধতি গ্রহণে দ্বিধান্বিত ছিলেন না। পনেরো শতকের একশ্রেণীর সুফী তাঁদের চিন্তা ও কর্মধারায় ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রভাবিত মহাযানী বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ইরানের যরথুস্ট্রবাদী যোগ-সন্ন্যাসীদের চিন্তা ও সাধন-পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। পরবর্তীকালে এ শ্রেণীর সুফীরা চৈতন্যের বৈষ্ণব মতবাদের সংস্পর্শে আসেন। এই সুফীদের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করেই এস. সি. রায় চৌধুরী মন্তব্য করেছেন ঃ 'হিন্দুবাদের ওপর ইসলামবাদের প্রভাব যদি ভক্তি আন্দোলনের জন্ম দিয়ে থাকে, ইসলামবাদের ওপর হিন্দুবাদের প্রভাব তেমনি সুফী আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে।' তিনি তাঁর 'সোশ্যাল কালচারাল এন্ড ইকনোমিক হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, সুফীবাদের বিকাশে হিন্দুবাদের সাথে বৌদ্ধবাদ, যরথুস্ট্রবাদ, খ্রীস্টানবাদ ও নব্য প্লেটোবাদ 'মূল্যবান অবদান' রেখেছে।

ঐতিহাসিক তারা চাঁদ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ 'সুফীবাদের মূল উৎস কোরআন ও মুহাম্মদ (স.)-এর জীবন। খ্রীস্টবাদ ও নব্য প্লেটোবাদ ব্যাপক প্রভাবের মাধ্যমে একে গ্রাস করেছে। হিন্দুবাদ ও বৌদ্ধবাদ এতে বহু ভাবধারার যোগান দিয়েছে; আর এ কাজে প্রাচীন পারস্যের যরথুস্ট্রবাদ এবং অন্যান্য ধর্মও অংশ নিয়েছে।'[১]

এই শ্রেণীর সুফীরা মুসলিম সমাজের ইসলামী আমল ও আকীদার মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতির বহু উপাদান সংযোজন করেন। এই গোমরাহী দূর করার জন্য হকপন্থী একদল সংগ্রামী ইসলাম প্রচারকের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও আন্দোলন সব সময়ই অব্যাহত ছিলো। মুজাদ্দিদে আলফিসানী সেই সংগ্রামী ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম।

২. মুসলিম শাসনের বৈশিষ্ট্য

বাংলার মুসলিম শাসনামলকে কয়েকটি যুগে ভাগ করা যায়। প্রথম যুগ ১২০৩ সালে বখতিয়ার খিলজীর বিজয় থেকে ১৩৩৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। এ যুগে বাংলার

১. Tara Chand : Influence of Islam on Indian Culture, p-50.

www.nagorikpathagar.org

শাসকগণ দিল্লীর মুসলিম সালতানাতের প্রতি মৌখিক আনুগত্য পোষণ করতেন। দিল্লীর সুলতানদের কাছ থেকে ফরমান নিয়ে তাঁরা রাজ্য শাসন করতেন। তবে কার্যত তাঁরা ছিলেন প্রায় স্বাধীন। দ্বিতীয় যুগ শুরু হয় ১৩৩৮ সনে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ কর্তৃক বাংলায় স্বাধীন সুলতানী আমলের সূচনার মাধ্যমে। ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দু'শ বছর স্থায়ী এ যুগ স্বাধীন সুলতানী আমলরূপে চিহ্নিত। এ সময় দিল্লীর প্রতি মৌখিক আনুগত্যের বন্ধনও ছিন্ন হয়। এরপর ১৫৩৯ থেকে ১৫৭৬ সন পর্যন্ত পাঠান শাসনামল। ১৫৭৬ থেকে ১৭১৭ সন পর্যন্ত চলে মুগল সুবাহদারী শাসন। তার মধ্যে ১৫৭৬ থেকে ১৬১০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়টি স্থানীয় সামন্ত প্রভু বারো ভূঁইয়াদের নেতৃত্বে মুগলবিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামের একটি অধ্যায়। মুগল আমলের বাংলা ছিলো বিশাল মুগল সাম্রাজ্যের একটি সুবাহ বা প্রদেশ। ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে মুরশিদকুলী খাঁ বাংলায় স্বাধীন নিযামত প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত স্বাধীন নবাবী আমল। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীন নবাবী শাসনের অবসানের মধ্য দিয়ে এ দেশ পরাধীন যুগে প্রবেশ করে।

ইসলামী খিলাফত বিলুপ্ত হওয়ার প্রায় পাঁচশ' বছর পর এদেশে মুসলিম শাসন কায়েম হয়। সে সময় মুসলিম বিশ্বে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের শিকড় খুবই গভীরে প্রবেশ করেছিলো। ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা, তার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের মধ্যে ইতিমধ্যে পরিবর্তন ঘটেছিলো। এ পটভূমিতে খোলাফায়ে রাশেদা নয়, উমাইয়া ও আব্বাসীয় বাদশাহগণ ছিলেন বাংলার মুসলিম শাসনকর্তাদের আদর্শ। এ শাসকগণ ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই আল্লাহর ইবাদতে আন্তরিক ছিলেন। দেশের সার্বিক উন্নতি বিধানে তাঁরা আগ্রহী ছিলেন। ইসলামী প্রচারকেন্দ্র স্থাপন, মাদ্রাসা-মক্তব প্রতিষ্ঠা, আলিমগণকে পৃষ্ঠপোষকতা দান প্রভৃতি কাজে তাঁরা উৎসাহী ছিলেন। তাঁরা এ ব্যাপারেও সচেতন ছিলেন যে, ইসলামের বিকাশ এবং মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি এ দেশে মুসলিম শাসনের বিস্তার ও এর ভিত্তি সংহত করার জন্য জরুরী। সে কারণেও তাঁদের নীতি ইসলামের প্রচারমূলক কার্যাবলীর সহায়ক হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী আদর্শের পূর্ণ প্রতিফলন তাঁরা ঘটাননি।

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হলো রাষ্ট্রীয় নীতি ও কর্মকাণ্ডে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক লক্ষ্য। সকল কথা ও কাজে আল্লাহ-ভীতি ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রাণসত্তা। ইসলামী রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক মূলনীতিগুলি হলো ঃ

ক. জনগণের রায়ে খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হবেন;

খ. খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধান শুরা বা পরামর্শ-সভার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্ম পরিচালনা করবেন;

গ. সর্বসাধারণের স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ অবারিত থাকবে;

www.nagorikpathagar.org

ঘ. খলিফা ও তাঁর সরকার আল্লাহ্ ও জনগণের কাছে জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত থাকবেন;

ঙ. বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় তহবিল জনগণের আমানত। এ তহবিল হালাল উপায়ে সংগৃহীত ও হালাল পথে ব্যয়িত হবে;

চ. আইনের শাসন সব কিছুর উপরে প্রাধান্য লাভ করবে;

ছ. অধিকারের ব্যাপারে সকলে সমান সুযোগ ভোগ করবেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের এ সব নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি বাংলার মুসলিম শাসকদের ছিলো না। বাংলার মুসলিম শাসনামলের দুর্বলতাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

এক. রাষ্ট্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব কায়েম না করে শাসকগণ নিজেরাই সার্বভৌম ক্ষমতার প্রায়-মালিক হয়ে বসেছিলেন;

দুই. প্রশাসন যন্ত্রে তাকওয়ার গুণাবলী পূর্ণরূপে বিকশিত ছিলো না;

তিন. খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুসৃত বহু শাসনতান্ত্রিক ধারা এ সময় অবহেলিত হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে ঃ ক. জনগণের রায়ে নির্বাচন এবং দেশ শাসনের ব্যাপারে জনগণকে স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ দান; খ. সৎ কাজের আদেশ দান ও অন্যায় কাজ প্রতিরোধের কুরআনী মৌলনীতির ভিত্তিতে শাসকদের ভুলত্রুটির বিরুদ্ধে সাধারণ নাগরিকদের কথা বলার ইসলামী অধিকার;

চার. ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালের ধারণা একমাত্র আলমগীরের শাসনামলে ছাড়া অন্য কোন সময় এখানে কোন গুরুত্বই পায়নি। জনগণের ধন-মাল শাসকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে গণ্য হয়েছে।

এ সব দুর্বলতা নিয়ে জনগণের মাথা-ব্যথার কারণ ছিল না। কেননা, ইসলামী শাসনের স্বর্ণযুগের সাথে তাদের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বা পরিচয়ই ছিলো না। ফলে বাংলার মুসলিম শাসনামলে ইসলামী শাসনব্যবস্থার যেটুকু স্বাদ তারা পেয়েছে, ইসলামী শরীয়াতের যে সব কল্যাণ প্রভাব এ আমলে প্রতিফলিত হয়েছে, তা-ই নানা শৃংখলভার জর্জরিত জনজীবনকে মুক্তির আনন্দে ভরিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলো। বিশেষত, বিচার-ফয়সালা এবং সামাজিক সাম্য, ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামী আইনের সুফল এ দেশের মানুষ দীর্ঘদিন ভোগ করেছেন। শুধুমাত্র এই একটি আদর্শ বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে এ দেশের মানুষ শোষণ ও বঞ্চনা মুক্ত জীবন যাপন করার সুযোগ পেয়েছেন। আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমানাধিকার ভোগ করেছেন। শত শত বছর ধরে বর্ণবাদী সমাজের বিভেদ নীতির কষাঘাতে জর্জরিত হওয়ার পর আইনের চোখে সকলের সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি তখনকার সমাজের জন্য ছিলো একটি অসাধারণ ব্যাপার। মুসলিম বিচার-ব্যবস্থা সামান্য এক বিধবা নারীর আরযীর বলে বাংলার সুলতানকে কাযীর দরবারে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে

www.nagorikpathagar.org

ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে এ দেশে এক অশ্রুতপূর্ব দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছিলো। শাসকদের ধর্মনিষ্ঠা ও তাঁদের ব্যক্তিত্ব এবং ইসলামের সামাজিক ন্যায়-বিচারের আদর্শ বাংগালী জনজীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে।

মুসলিম শাসকগণ ইসলামের মর্যাদা রক্ষা, মুসলমানদের ঐক্য বজায় রাখা এবং তাদের ধর্মীয়, বুদ্ধিবৃত্তিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে দায়িত্বশীল ছিলেন। 'তারিখ-ই-মুবারকশাহী'তে মুসলিম সুলতানদের ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায় তা হলো ঃ

১. শুক্রবার জুমার এবং বছরে দুই ঈদের জামাতে খুতবা প্রদান করা;
২. ধর্মীয় বিধি-বিধানের সীমা নির্ধারণ করা;
৩. দান-খয়রাত করার উদ্দেশ্যে কর আদায় করা;
৪. দীনের হিফাজতের জন্য যুদ্ধ করা;
৫. বিবাদ-বিরোধের বিচার-ফয়সালা করা;
৬. রাজ্য রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ—বিদ্রোহী ও শান্তিভঙ্গকারীদের অপসারণ করা এবং ধর্মের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব প্রবর্তনকারী ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের বিরোধিতাকারীদের দমন করা—প্রভৃতি।

জিয়াউদ্দীন বারনী তাঁর 'তারীখ-ই-ফীরূযশাহী' গ্রন্থে মুসলিম শাসকদের কর্তব্য সম্পর্কে সুলতান ইলতুতমিশের মতামত উল্লেখ করেছেন। তা থেকেও সে যুগের মুসলিম শাসননীতি সম্পর্কে ধারণা করা যায়। সে কর্তব্যগুলি হলো ঃ

এক. ধর্মীয় পবিত্রতা সংরক্ষণ;

দুই. অনুমোদিত আচার-আচরণের প্রকাশ্য বিরোধিতার শাস্তি বিধান;

তিন. ধর্মীয় বিষয়াদিতে আলিম ও ধর্মপ্রাণ লোকদের নিয়োগ এবং

চার. সকলের প্রতি নিরপেক্ষ ও ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা প্রবর্তন ইত্যাদি।

বাগদাদের আব্বাসীয় বাদশাহ ও মিসরীয় সুলতানদের প্রতি বাংলার মুসলিম শাসকগণ আনুগত্য প্রদর্শন করতেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, সে সময়কার বাংলার মুসলিম সমাজ ইসলামী উম্মাহর অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিচিত হয়েছে। মুসলিম শাসকগণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে নেতৃত্ব দান করে মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগকে উৎসাহিত করেছেন। দেশের বিভিন্নস্থানে বিপুল সংখ্যক মসজিদ-মাদ্রাসা, জনহিতকর ও সেবামূলক নানা প্রতিষ্ঠান তাঁরা কায়েম করেছেন। ধর্মীয় আবেগ, ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও মুসলমানদের মাঝে ঐক্যবোধ সৃষ্টিতে তাঁরা অবদান রেখেছেন।

মুসলিম শাসনামলে বিধর্মীরা আইনের চোখে সমানাধিকার ভোগ করেছেন। তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। অন্য সম্প্রদায়ের স্বার্থ কোন প্রকারে ক্ষুণ্ন হওয়ার মতো কোন কাজে শাসনকগণ কখনো মুসলিম সমাজকে তাদের

www.nagorikpathagar.org

অভিভাবকত্ব বা পৃষ্ঠপোষকতা দান করেননি। সকল ধর্মের প্রজাদের প্রতিভা এবং তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নতির ব্যাপারে তাঁরা পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

৩. গণতান্ত্রিক সমাজাদর্শ প্রতিষ্ঠা

বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মুসলিম আগমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক ঘটনা। মুসলমানরা এ দেশে এক অসামান্য শক্তির প্রবাহ নিয়ে আসেন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে উন্নতি ও সমৃদ্ধির প্রেরণা জাগিয়ে তোলেন। বিজয়ী ও বহিরাগত মুসলমানরা ছিলেন উদ্যোগী, সাহসী এবং নতুন প্রাণচাঞ্চল্যে পূর্ণ। তাঁরা এ দেশের মানুষকে সংকীর্ণ স্বাতন্ত্র্যবাদের আড়ষ্টতা ও নির্বীর্যতার আবর্ত থেকে বের করে আনেন। তাদের জন্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ উন্মোচন করে দেন। মুসলমানদের ইতিবাচক সক্রিয় অবদানের ফলে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করে। এ যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতি ও অগ্রগতি পরবর্তী সকল যুগের জন্যই অত্যন্ত মূল্যবান অবদানরূপে স্বীকৃত হয়।

বাংলায় ইসলামের আগমন ও মুসলিম বিজয়ের ফলে এখানে সামাজিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শের বিকাশ ঘটে। ইসলামের আদর্শের সারল্য, সমাজ ব্যবস্থার সাম্য, জীবনযাত্রা প্রণালীর শালীনতা বাংলার জনজীবনকে প্রভাবিত করে। এর ফলে দেশের মানুষের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। মুসলিম প্রতিবেশীদের সংস্পর্শে এসে হিন্দুরা এক স্রষ্টার আরাধনা ও একটি বর্ণহীন গণতান্ত্রিক সমাজ সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। তাঁরা ইসলামের উচ্চতর আদর্শিক ভাবধারা এবং মুসলমানদের পরিচ্ছন্ন সমাজ-ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত ও আপ্লুত হন।

মুসলিম শাসনের ফলে এবং দেশের সাধারণ মানুষের সাথে মুসলমানদের একাত্মতার কারণে সমাজে ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য খর্ব হয়। সাধারণ মানুষ ব্রাহ্মণদের অধীনতা, কর্তৃত্ব ও দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসার উপায় খুঁজে পান। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, সাহিত্য, পেশা, তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুক্ত চর্চা উৎসাহিত হওয়ার ফলে তাদের মাঝে এক নতুন আশাবাদ ও কর্মস্পৃহা জেগে ওঠে। সেন ও বর্মনদের ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসনামলে উৎপাদনমূলক নানা কর্মকাণ্ডে জড়িত বিভিন্ন পেশা ও বৃত্তির মানুষদেরকে সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে ঠেলে দেয়া হয়েছিলো। তাদের সামাজিক মর্যাদা ও গৌরব এবং তাদের শ্রম ও দক্ষতার স্বীকৃতি হরণ করা হয়েছিলো। মুসলিম-শাসনে তাদের লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়। বিভিন্ন পেশার লোকেরা এ যুগে তাদের আত্মবিকাশ ও প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ লাভ করে।

শিক্ষানুরাগী মুসলিম শাসকগণ তাঁদের দরবারে বিদ্যান ও জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে

www.nagorikpathagar.org

আহবান জানাতেন। ফলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও হিন্দু সমাজের অন্যান্য প্রতিভাবান ব্যক্তিরা মুসলিম শাসক ও আমীর-ওমরাহদের সাহচর্য লাভের সুযোগ পান। ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থার বিচারে এই সাহচর্য ছিলো খুবই আপত্তিকর। কেননা, মুসলমান যত জ্ঞানী ও প্রতিভাবান এবং যত যোগ্যতা ও উন্নত নৈতিকতার অধিকারী হোক, ব্রাহ্মণদের কাছে মানুষ হিসাবে তার কোন মর্যাদা নেই। 'খাঁটি' ব্রাহ্মণদের চোখে মুসলমান মানেই মেচ্ছ, যবন, নীচু জাত। এই অস্পৃশ্য মুসলমানদের ছোঁয়াচ লাগার কারণে দরবারী বিদ্যান ব্রাহ্মণদের জাত নষ্ট হয়। শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী তাদেরকে সমাজচ্যুত করা হয়। মুসলিম প্রভাবে হিন্দুদের জাত নষ্ট হওয়ার এমন আরো অনেক কারণ সৃষ্টি হয়েছিলো। যদি কোন হিন্দু গরুর গোশত খেতেন, কিংবা মুসলমানের পাত্র থেকে পানি পান করতেন, তবেও তাকে জাতিচ্যুত করা হতো। সমাজে মুসলিম প্রভাব বৃদ্ধির সাথে সাথে এ ধরনের জাতিচ্যুত হিন্দুর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। মুসলমানদের উদারনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার প্রবল আকর্ষণ সমাজচ্যুত ব্রাহ্মণদের মধ্যেও নিজেদের স্বতন্ত্র সামাজিক সত্তা গড়ে তোলার প্রেরণা সৃষ্টি করে। এভাবে হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণদের মাঝে কয়েকটি সমাজচ্যুত দলের উদ্ভব ঘটে। এরা পীরালী ব্রাহ্মণ্য, শ্রীমন্তখানী ব্রাহ্মণ, শেরখানী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি নামে পরিচিত হয়।[২]

মুসলিম সংস্পর্শে ব্রাহ্মণ্য সমাজে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ার ফলে দু'ধরনের সংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠে। একটি ছিলো কঠোরভাবে রক্ষণশীল। অপরটি নীতিগতভাবে রক্ষণশীল হলেও সামাজিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কিছুটা উদার দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী। মুসলমানদের সাহচর্য লাভের ফলে জাতিচ্যুত লোকের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাওয়ার কারণে ব্রাহ্মণেরা তাদের সামাজিক রীতিনীতির কঠোরতা শিথিল করার প্রয়োজন অনুভব করে। মুসলিম প্রভাবদোষে দুষ্ট হিন্দুদের জাতে তোলার জন্য সে সময় শুদ্ধি প্রথার প্রচলন করা হয়। প্রতিবেশী মুসলিম সমাজের প্রতি যে ঘৃণা ব্রাহ্মণেরা পোষণ করতেন, তা হিন্দু সমাজে অমানবিক বিদ্বেষের এক স্থায়ী বিষবৃক্ষরূপেই থেকে যায়। তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্য সমাজ-সংহতির এই আন্দোলনের পাশাপাশি সাধারণ হিন্দু সমাজের চিন্তা-চেতনায় এক নীরব বিপ্লবের ক্ষেত্র রচিত হতে থাকে। ইসলামের সামাজিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শের যেটুকু প্রতিফলন তখনকার মুসলিম সমাজে ঘটেছিলো, তার আলোকেই এ দেশের ব্যাপক জনগণের মধ্যে এক নতুন অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী জনগণের যে বিরাট অংশ মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলো, তাদের মনোজগতে এ সময় বিরাট বিপ্লব দেখা দেয়। মুসলিম সংস্পর্শ ও সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে সৃষ্ট আলোড়ন ব্রাহ্মণদেরকেও তাদের আত্মপ্রসাদ, দুর্নীতি, অবৈধব্যবসা, জবরদস্তি দক্ষিণা আদায় ও ভোগ স্পৃহার জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য সমাজের কৌলিন্য রক্ষার জন্য এ সময় পণ্ডিত রঘুনন্দন, নুলো পঞ্চানন, দত্তখান, উদয়নাচার্য ভাদুড়ী, দেবীধর ঘটক প্রমুখ ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে

২. কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর পরিবার এই পীরালী ব্রাহ্মণ সমাজ থেকে উদ্ভূত।

www.nagorikpathagar.org

পরিচালিত ছোঁয়াচ বাঁচানোর আন্দোলনের পাশাপাশি দেশের সাধারণ মানুষের মুক্তি-চেতনাও সোচ্চার হতে থাকে এ সময়। জনগণের সে বিপ্লবী চেতনারই অনুরণন লক্ষ্য করা যায় সে যুগের প্রখ্যাত কবি চণ্ডিদাসের কণ্ঠে। ব্রাহ্মণ্য ভেদনীতির সরব প্রতিবাদ ফুটে ওঠে তাঁর কবিতায় ঃ

'চণ্ডিদাস কহে, শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'[৩]

এভাবেই সে সময় অসাম্য ও বিভেদনীতির বিরুদ্ধে খোদ হিন্দু সমাজের ভিতর থেকেই আওয়াজ উঠতে থাকে। চণ্ডিদাসের মতো সচেতন সাধারণ হিন্দুরা মানবীয় ভ্রাতৃত্বের আদর্শে নিজেদের সামাজিক জীবন পুনর্গঠনের দাবি জানাতে থাকেন। চণ্ডিদাস মুসলিম সমাজের প্রশংসা করে লিখেছেন ঃ 'সপ্ত মুসলমান একই পাত্র থেকে এবং একই জায়গায় বসে তাদের খাদ্য গ্রহণ করে।' এ উক্তি থেকে মনে হয়, চণ্ডিদাস মুসলিম সমাজের সরল জীবন-যাপন পদ্ধতি এবং সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। নিম্নবর্ণ বা অবর্ণ হিন্দুরা মুসলমানদের ধর্মীয় আদর্শের সরলতা, সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচারের বৈশিষ্ট্য দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। হিন্দুদের কোন কোন ধর্মগুরুর কাজকর্মেও মুসলিম প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মুসলিম প্রভাবের ফলে হিন্দু সমাজে অতলস্পর্শী আলোড়ন সৃষ্টি হয়। হিন্দু সমাজের সংহতি রক্ষার জন্য এ সময় হিন্দু ধর্মে সংস্কার সাধনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। সে উদ্দেশ্যে বেশ কিছু আন্দোলন গড়ে ওঠে। সে আন্দোলনগুলি মুসলিম সমাজাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত ছিলো। সে প্রভাবে নানক, কবীর, রামানন্দ, জয়দেব, শ্রীচৈতন্য, মীরাবাঈ, নামদেব (মহারাষ্ট্র), জ্ঞানেশ্বর (গুজরাট) প্রমুখ সাধকের আবির্ভাব ঘটে। গীতার ভক্তিবাদ ইসলামের তওহীদের স্পর্শে জনপ্রিয় হয়। দেশজ ভাষাগুলি এ সময় নবজীবন লাভ করে। শ্রীশংকরাচার্যের নৈর্ব্যক্তিক দর্শন পরিত্যক্ত হয়। তার স্থানে ভক্তিবাদ হিন্দুর দার্শনিক চিন্তার প্রধান বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।[৪]

নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মে ইসলামী ভাবধারার প্রভাব স্পষ্টত লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মুসলিম সমাজের প্রতি তাঁর আচরণ আক্রমণাত্মক ছিলো। ইসলামের প্রভাব থেকে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করাই ছিলো তাঁর আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। তবে তাঁর মতবাদে একেশ্বর বিষ্ণুর প্রতি প্রেমের যে প্রকাশ, তা গভীরভাবে ইসলামের প্রভাবসঞ্জাত ছিলো। হিন্দু সমাজ রক্ষার একান্ত প্রয়াসী চৈতন্য কৃষ্ণপ্রেমের এক সর্বপ্লাবী জোয়ার সৃষ্টি করতে না পারলে হিন্দুদের এক বিরাট অংশ সে সময় মুসলিম সমাজে বিলীন হয়ে যেতো। হিন্দু সমাজে ধর্ম ঠাকুর পূজা, সত্যপীর বা সত্য নারায়ণ পূজা কিংবা গৌড়ের সনাতন গোস্বামীর নেতৃত্বে দরবেশিয়া সাম্প্রদায়ের উদ্ভবের মধ্যেও মুসলিম প্রভাবের পরিচয় স্পষ্ট। দরবেশিয়া মতবাদের অনুসারীরা

৩. দীনেশচন্দ্র সেন ঃ গ্লিম্পসেস অফ বেঙ্গল লাইফ, পৃঃ ১৩৩, ১৪৭।
৪. ডক্টর হাসান জামান ঃ সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য, পৃঃ ৫০।

www.nagorikpathagar.org

তসবিহমালা (জপমালা) ধারণ করতো; মুসলমান ফকীরদের মতো আলখাল্লা পরতো এবং আল্লাহ, খোদা ও মুহাম্মদ নাম জপ করে গান গাইতো।[৫]

হিন্দু সমাজে মুসলিম প্রভাব সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন ঃ 'There are many evidences to prove that in the earlier days of Mohammedan conquest, the Hindus tried to assimilate the best elements of Islam in their religion.'[৬]

ইসলাম প্রচার ও মুসলিম সমাজ গঠিত হওয়ার ফলে এ দেশের মানুষের নৈতিক জীবনের ব্যাপক উন্নতি হয়। মুসলিম আগমনের প্রাক্কালে হিন্দু সমাজে চরম নৈতিক অবক্ষয় দেখা দিয়েছিলো। নিম্নবর্ণ হিন্দু এবং সাধারণভাবে বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণদের দ্বারা সামাজিকভাবে নির্যাতিত ছিলো। ব্রাহ্মণদের সামাজিক অনাচার ও দুর্নীতি তাদের সমাজ জীবনকে কলুষিত করেছিলো। কবি ধূয়ীর 'পবন দূত' ও সন্ধাকর নন্দীর 'রাম চরিত' থেকে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন রাজাদের আমলে মন্দিরের সেবার জন্য দেব-দাসী ও যুবতী ব্রাহ্মণী বিধবাদের নিয়োগ করা হতো। এ ব্যবস্থা উচ্চবর্ণ তথা ব্রাহ্মণ ও ক্ষমতাবান হিন্দুদের ভোগের একটি আয়োজন ছিলো। এমনি ধরনের অনাচারের ফলে হিন্দু সমাজের উঁচুকোঠায় নৈতিক ধস নেমেছিলো। সমাজের উঁচু তলার সে পচন গোটা সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিলো। বর্ণাশ্রমের সমাজ-বিভক্তি অনুযায়ী অবর্ণ হিন্দুদের সাথে ব্রাহ্মণদের বিবাহ শাস্ত্র-বিরোধী একটি নিষিদ্ধ কাজ ছিলো। তার ব্যতিক্রম হওয়ার উপায় ছিলো না। কিন্তু অবর্ণ হিন্দু বা কোন শূদ্রানীর সাথে ব্রাহ্মণের যৌনাচার সে কারণে বন্ধ ছিলো না। এ ক্ষেত্রে বরং লক্ষণীয় হলো, শুদ্র রমণীর সাথে যৌন কর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণে বাহ্মণদের জাত নষ্ট হতো না। এজন্য কিছু জরিমানা দিলেই তাদের কৌলিন্যের গৌরব অক্ষুণ্ন থাকতো।[৭]

তান্ত্রিকতাবাদ ও শক্তিবাদ সে কালের হিন্দু সমাজের অধঃপতনের জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী ছিলো। 'কালবিবেক গ্রন্থ' ও 'কালিকা পুরাণ'-এর বিবরণ থেকে জানা যায়, দুর্গাপূজা, হোলি প্রভৃতি পূজা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলিতে মেয়ে-পুরুষ উভয়ের মধ্যে যৌনাচার ও কদর্যতা চলতো। কাম-মহোৎসব নামে পরিচিত একটি ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবে হিন্দু নারী-পুরুষেরা দেবতাকে খুশী করে পুত্র-সন্তান ও সম্পদ লাভের জন্য এক ধরনের যৌন-নৃত্য করতো। কবি জয়দেবের যৌন আবেদনমূলক গ্রন্থ 'গীত গোবিন্দ' জনসমাবেশে আবৃত্ত করে উপভোগ করা একটি সাধারণ রেওয়াজ ছিলো। কবি বৃহস্পতি মিশ্রের বিবরণেও সেকালের মেয়েদেরকে বড় বেশী যৌনবিলাসিনী দেখানো হয়েছে।[৮] হিন্দুদের প্রভাবে বৌদ্ধ সমাজেও নানা প্রকার অনাচারের জন্ম হয়েছিলো।

৫. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ভূমিকা।
৬. ডি. সি. সেন ঃ ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ব্যালাড্স, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৩।
৭. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস, পৃঃ ২৫।
৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫।

www.nagorikpathagar.org

বাংলায় মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে ওঠার ফলে এবং ইসলামের উন্নত নৈতিকতামূলক ধর্মীয় ও সামাজিক প্রভাবে হিন্দু সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি হয়। মুসলিম সমাজ তাদের সামনে মার্জিত ও পবিত্র জীবনের আদর্শ তুলে ধরে। উন্নত নৈতিক বোধের অধিকারী আলিম ও অন্যান্য ইসলাম প্রচারকের বাস্তব জীবনের বিরাট প্রভাব পড়ে প্রতিবেশী সমাজের ওপর। ফলে সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে শুধু নয়, ব্রাহ্মণদের জীবনেও পরিবর্তনের হাওয়া লাগে।

এ প্রসঙ্গে ডক্টর হাসান জামান লিখেছেন ঃ 'ইসলামের প্রভাবে বাঙালী হিন্দুর আত্মিক উন্নতি হয়, চিন্তাধারা মানবতা দ্বারা সজীব ও সমৃদ্ধ হয় আর চিন্তাও গভীর এবং বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এর ফলে সামাজিক দিকে হিন্দুরা যথেষ্ট লাভবান হয়—সমাজে সাম্যবাদ ও গণতন্ত্রের প্রভাব পাকাপাকিভাবে শিকড় গজিয়ে বসে।'[৯]

এ কথার প্রতিধ্বনি করে এস. সি. রায় চৌধুরী লিখেছেন ঃ 'Islam influenced the Hindu society in two ways. Firstly, the missionery zeal of Islam which aimed at conversion of the maximum number of Hindus to Islam gave rise to conservatism. 2ndly, some of the democratic principles of Islam found their own way into Hindu society. The Vakti movement was to a large extent influenced by Islam and the Hindu reformers preached fundamental equality of all religions and unity of God.'[১০]

গোপাল হালদার এ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ 'ইসলামের বলিষ্ঠ ও সরল একেশ্বরবাদ এবং জাতিভেদহীন সাম্যদৃষ্টির কাছে ভারতীয় জীবনধারা ও সংস্কৃতির পরাজয় ঘটলো। এ পরাজয় রাষ্ট্রশক্তির কাছে নয়, ইসলামের উদার নীতি ও আত্মসচেতনতার কাছে। তাই যথেষ্ট ঘৃণা ও অবজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও ইসলামের প্রভাব ও সংমিশ্রণ এড়িয়ে যেতে পারলো না। হিন্দুদের প্রবল অসহযোগিতায় ইসলামের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো না। তারা ভারতীয় জনগণকে বিন্দুমাত্রও অবজ্ঞা করলো না বা বিজয়ী হয়ে দর্পভরে কারো প্রতি অত্যাচার করলো না। কারণ ইসলাম কোন জাতির ধর্ম নয়, প্রচারশীল ধর্ম। ইহা অন্যকে জয় করেই ক্ষান্ত হয় না, কোলে টেনে নেয়।'[১১]

৪. বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলার সামাজিক জীবনের ওপর মুসলমানদের প্রভাব ছিলো অসামান্য। মুসলমান সমাজে শিক্ষার বহুল প্রচলন হিন্দু জনগণের মধ্যে জ্ঞানার্জনের অধিকার-চেতনা জাগিয়ে তোলে। শিক্ষা একটি বিশেষ সামাজিকশ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার বলে যে ধারণা ব্রাহ্মণেরা সৃষ্টি করেছিলো, যে অধিকার থেকে

৯. ডক্টর হাসান জামান ঃ সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য, পৃঃ ২০৫।
১০. S. C. Roy Chowdhury : Social Cultural and Economic History of India, p-9.
১১. গোপাল হালদার ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ১১৬।

www.nagorikpathagar.org

এতোকাল প্রভূত্বকামী ব্রাহ্মণেরা বাংগালীদেরকে বঞ্চিত করেছিলো, সে সম্পর্কে মুসলিম আমলের বাংলায় জাগরণ সৃষ্টি হয়। মুসলমানগণ সকলের সামনে শিক্ষার সমান সুযোগের দ্বার উন্মোচন করেন। ফলে অন্ত্যজশ্রেণী বলে উপেক্ষিত হিন্দুরাও নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ হয়। বাংগালী সমাজের সর্বস্তরে এ সময় শিক্ষার আলো প্রবেশ করে। সমাজের অন্ধকার দূর করার ক্ষেত্রে এ যুগে বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়। মুসলমান রাজত্বকাল বাংলার সর্বাপেক্ষা গঠনমূলক যুগ হিসাবে চিহ্নিত। এ দেশে সার্বজনীন শিক্ষার ধারণা প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষার ব্যাপক অগ্রগতি এর প্রধান কারণ। মুসলমানগণ শুধু বাংলাদেশেই নয় সমগ্র উপমহাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্বজনীনতা, সার্বজনীনতা ও উদারতার আদর্শ তুলে ধরেন। মুসলিম শাসক, আমির-ওমরাহ, রাজকর্মচারী ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ শিক্ষার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তাঁরা সর্বতোভাবে শিক্ষার উন্নয়ন ও বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের ব্যাপক আগ্রহ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি হিন্দুদের মাঝে গভীর প্রভাব ফেলে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে ডঃ এম. এ. রহীম লিখেছেন ঃ 'মুসলমানদের পূর্বে বাংলাদেশে শিক্ষা প্রধানত ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং যে কোন প্রকারের জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণগণ তাদের শাস্ত্রজ্ঞানের চর্চায় একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখতেন।... মুসলমান শাসন প্রবর্তিত হওয়ার দরূন সুবিধাভোগী হিন্দুদের কবল থেকে ভাগ্যাহত ও বঞ্চিত হিন্দুরা মুক্তিলাভ করে এবং চিরকালের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। মুসলমান শাসনাধীনে অব্রাহ্মণদের পক্ষে শিক্ষা গ্রহণে ব্রাহ্মণদের অসন্তুষ্টি উৎপাদনের আর কোন ভয় ছিল না, কেননা এই শাসন ব্যবস্থা মুসলমান-অমুসলমান, উচ্চ-নীচ সর্বশ্রেণীর লোকের নিকট পার্থিব, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতির জন্য সমান সুযোগ এনে দেয়। এভাবে মুসলমান আমলে হিন্দু সমাজের অন্ত্যজশ্রেণীর মধ্যেও শিক্ষার প্রসার হয় এবং বঞ্চিত ও অবহেলিত লোকেরা বিদ্যার্জন করে জীবনে উন্নতি করার সমান সুযোগ পায়।'[১২]

জ্ঞানার্জনে মুসলমানদের গভীর অনুরাগ, ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নে ইসলাম প্রচারক আলিমদের উদ্যম এবং পণ্ডিত, কবি, বিদ্যান ব্যক্তি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি শাসকদের উদার পৃষ্ঠপোষকতার ফলে মুসলিম শাসনামলের বাংলাদেশে বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব জাগরণের সৃষ্টি হয়। এ যুগে বিরাট সংখ্যক আলিম ও ইসলাম প্রচারক বিভিন্ন স্থানে জ্ঞানার্জনের বহু বিখ্যাত কেন্দ্র গড়ে তোলেন। বাংলার মুসলিম বিজয়ের সময় থেকে গৌড় নামে পরিচিত লাখনৌতি এ দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ এলাকার শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে দরসবাড়ীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজশাহী জেলার মহিসুন বা মহিসন্তোষ ও বাঘা মুসলিম শাসনামলের উচ্চ শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিলো। বাংলার মুসলমানদের 'বুদ্ধিবৃত্তিক ও

১২. ডক্টর এম. এ. রহীম ঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২১৬-২২৭।

www.nagorikpathagar.org

সাংস্কৃতিক জীবনের গৌরব এবং এ দেশে বুদ্ধিবৃত্তিক কৃতিত্বের প্রতিষ্ঠাতা' শায়খ শরফউদ্দীন আবু তাওয়ামা মুসলিম শাসনের একেবারে গোড়ার দিকে তেরো শতকে সোনারগাওকে বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্ররূপে গড়ে তুলেছিলেন। সোনারগাও সে যুগে শুধুমাত্র বাংলার নয়, সমগ্র ভারতের জন্যই উন্নত শিক্ষার একটি কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিলো। ষোল শতক পর্যন্ত সোনারগাও-এর এ মর্যাদা অক্ষুণ্ন ছিলো।[১৩] এছাড়া সাতগাও বা ত্রিবেনী, বীরভূম-এর নগোর এবং মান্দারন মুসলিম শাসনযুগে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিলো। সে যুগের আরেক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র পাণ্ডুয়া ছিলো শায়খ জালালউদ্দীন তাবরিযী, আখি সিরাজউদ্দীন, শায়খ আলাউল হক ও নূর-কুত্ব-উল-আলম-এর মতো প্রখ্যাত মনীষীগণের কর্মকেন্দ্র। শিক্ষাকেন্দ্ররূপে রংপুরের নাম এ শহরের প্রতিষ্ঠাতা ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর সময় থেকেই জানা যায়। চট্টগ্রাম মুসলিম সাহিত্য-সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়েছে। শায়খ ও আলেমদের প্রভাবে এবং তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কল্যাণে বাংগালী মুসলমানগণ অত্যন্ত উন্নত আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের প্রতিনিধিত্ব করতেন। তেরো শতকের সুলতান রুকনউদ্দীন কায়কাউসের সময় ত্রিবেনীর মাদ্রাসায় উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি শিক্ষা সম্পর্কে সে যুগের মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার প্রতিনিধিত্ব করে ঃ 'তোমরা জ্ঞানার্জন করো, কেননা জ্ঞানার্জনই প্রকৃত আত্মনিবেদন, এর অনুসন্ধানই ভক্তি এবং এর চর্চাতেই পরম গৌরব।'

মুসলিম শাসনামলে এ দেশে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ডক্টর এম. এ. রহীম লিখেছেন ঃ 'মুসলমানামলের শিক্ষা ও জ্ঞান গরিমা নানাভাবে বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনকে উন্নত করে তোলে। ফলে দেশে এক অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ দেখা দেয়। বাঙ্গালী সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার প্রসার ঘটে। জ্ঞানালোকদীপ্ত মুসলিম শাসন ও শাসকদের উদার শিক্ষানীতির প্রভাবে যুগ-যুগব্যাপী বন্ধনদশা থেকে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের বুদ্ধিবৃত্তির মুক্তি সম্ভব হয়। এতদ্ব্যতিরেকে, মুসলমানগণ বহু নতুন নতুন শিক্ষাকেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, যার ফলে বাংলাদেশে শিক্ষার দ্রুত উন্নতির ও শিক্ষা বিস্তারের পথ সুগম হয়। তারাই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস প্রবর্তন করেন এবং লেখ্যবস্তুরূপে কাগজের প্রচলন করেন। পুস্তক নকল করে প্রচারের রীতি প্রবর্তন করার জন্য বাংলাদেশ মুসলমানদের নিকট ঋণী।'[১৪]

শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদানের প্রশংসা করে স্যার যদুনাথ সরকার লিখেছেন ঃ 'প্রথম যুগের হিন্দু লেখকরা যখন তাদের নিজেদের সাধারণ রীতি অনুসারে তাদের রচিত পুস্তকাদি গোপন রাখতে পছন্দ করতেন সেই যুগে পুস্তক নকল করার ও তা প্রচারের দ্বারা মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথা প্রচলন করেছেন, এজন্য আমরা

১৩. ডক্টর এম. এ. রহীম ঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পৃঃ ২০৭।
১৪. পূর্বোক্ত পৃঃ ২৩৪-২৩৫

www.nagorikpathagar.org

তাদের কাছে ঋণী।'[১৫]

মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন হয়। উইলিয়াম এডাম-এর ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের রিপোর্টে সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। বাংলার শিক্ষার তৎকালীন অবস্থার ওপর জরিপ চালিয়ে তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলা ও বিহারের পাঁচ থেকে পনেরো বছর বয়সের প্রতি ৩০০ জনের বেশী অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর জন্য তখন একটি গ্রাম্য বিদ্যালয় ছিল।[১৬] এডাম-এর এই রিপোর্ট প্রণয়নকালে বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিধ্বস্ত ছিলো। মুসলিম শাসনামলে তাদের সমৃদ্ধির যুগে শিক্ষার অবস্থা অনেক বেশী উন্নত ছিলো। প্রাথমিক মক্তব ও পাঠশালার সংখ্যাও ছিলো বেশী। মুসলমানদের সামর্থ বেশী ছিলো বলে তাদের মধ্যে উন্নত শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু ছিলো।[১৭]

মুসলিম শাসনামলে শিক্ষা খুবই সুলভ ছিলো। শিক্ষার পদ্ধতিও ছিলো যথেষ্ট উন্নত। মুসলিম শাসনামলের শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে এইচ. জে. রাওলিনসন লিখেছেনঃ 'মুগল ভারতের উন্নততর শিক্ষা-সংস্কৃতি যথেষ্ট পরিমাণে তাদের শিক্ষা-পদ্ধতিরই ফসল। শিক্ষা ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবে পরিগণিত হতো। ধনী পিতা-মাতার সন্তানকে চার বছর বয়সে কোরআনের একটি আয়াত উৎকীর্ণ করা পাথর বসানো শ্লেট দিয়ে একজন শিক্ষকের হাতে তুলে দেয়া হতো। আর গরীব পিতা-মাতার সন্তানকে মৌলবীদের দ্বারা পরিচালিত মক্তব বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠানো হতো; প্রতিটি মসজিদের সাথেও একটি মক্তব ছিলো।'[১৮]

আইন-ই-আকবরীর লেখক আবুল ফযল মুসলিম শাসনামলের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার উন্নত ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ 'প্রত্যেক সভ্য জাতিরই যুবকদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় রয়েছে, কিন্তু হিন্দুস্তান তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ।'

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলিতে মুসলিম শাসনামলে পাঠ্য বিষয়রূপে কোরআন, হাদীস, ধর্মতত্ত্ব, আইনশাস্ত্র ও অন্যান্য ইসলামী বিষয়ের পাশাপাশি যুক্তিবিদ্যা, অংকশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, কৃষি, জ্যামিতি, গার্হস্থ্যবিদ্যা, সরকারী আইন-কানুন, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, শাসন কৌশল, ইতিহাস ইত্যাদি পাঠ করানো হতো। ইউরোপীয় পর্যটক বার্নিয়ার ও মানুচী উল্লেখ করেন যে, সম্রাট আলমগীর মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসন কৌশল অধ্যয়নের ওপর বিশেষ জোর দিতেন।

মুসলিম শাসনামলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে বাংলার যথেষ্ট উন্নতি হয়। বার্নিয়ার উল্লেখ করেন যে, চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন ও রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে মুসলমানরা ইবনে সিনা ও

১৫. যদুনাথ সরকার ঃ ইণ্ডিয়া থ্রু দি এজেস, পৃঃ ৫২।
১৬. উইলিয়াম এডাম ঃ শিক্ষা রিপোর্ট (১৮৩৫-৩৮), কলিকাতা, পৃঃ ৬-৭)।
১৭. ডকটর এম. এ. রহীম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পৃঃ ২১৫।
১৮. এইচ. জে. রাওলিনসন (Rowlinson) ঃ ইণ্ডিয়া-এ শর্ট কালচারাল হিস্ট্রি (লণ্ডন, ১৯৩৭), পৃঃ ৩৭২।

www.nagorikpathagar.org

ইবনে রুশদ-এর পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। এ ছাড়া তারা গ্রীক ও ইরানী চিকিৎসা পদ্ধতি অধ্যয়ন ও অনুসরণ করতেন। উইলিয়াম এডাম এমনকি উনিশ শতকের প্রথমার্ধেও বাংলার মাদ্রাসাগুলিতে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন চালু থাকতে দেখেছেন। তিনি তাঁর ১৮৩৫ সালের শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, ইসলামী বিষয়াদি ছাড়াও প্রকৃতি বিষয়ক দর্শন ও সাধারণ দর্শন শাস্ত্রের গ্রন্থাদির সাথে ইউক্লিডের জ্যামিতি ও টলেমীর জ্যোতিষশাস্ত্র মাদ্রাসাগুলিতে পড়ানো হতো।[১৯] এ আলোচনা থেকে তখনকার মুসলিম শিক্ষার ব্যাপ্তি ও উদারতার কথা জানা যায়।

হিন্দুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে মুসলমানদের তৎকালীন মাদ্রাসাগুলির তুলনা করে উইলিয়াম এডাম লিখেছেন ঃ 'এদেশে মুসলমানদের অনুসৃত পাঠ্য-পদ্ধতি হিন্দু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রচলিত পাঠ্য বিষয়ের তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপক ও উদার ছিলো। এই পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে শিক্ষিত ব্যক্তিরা বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতেন।'[২০] মুসলিম শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার উন্নয়ন প্রসঙ্গে এন. এন. ল মন্তব্য করেন ঃ 'ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ভারত আক্রমণ কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ ছিলো না, শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রেও এটি একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে।'[২১]

৫. সাংস্কৃতিক জীবন গঠন

সমসাময়িক বাংগালী কবিদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তখনকার মুসলিম সমাজে ইসলামী বৈশিষ্ট্যগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট ছিলো। কোরআন-হাদীসের আলোকে মুসলমানদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হতো। ইসলামী বিধি-বিধান ও আচার-অনুষ্ঠান তাঁরা মেনে চলতেন। পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণে তাঁরা নিজেদের ইসলামী বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতেন। তৎকালীন মুসলমানদের অবস্থা তুলে ধরে মুকুন্দরাম লিখেছেন ঃ 'তারা প্রভাতে ঘুম থেকে ওঠে এবং লাল পাটি বিছিয়ে প্রত্যহ পাঁচবার নামাজ পড়ে। সুলায়মানী মালা গুণে তারা পীর-পয়গম্বরের (?) ধ্যান করে এবং তাদের দশ-বিশজন একত্রে বসে কিতাব-কোরান আলোচনা করে।... তারা অত্যন্ত জ্ঞানী এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। প্রাণ গেলেও তারা রোজা ত্যাগ করে না।'

'ফজর সময়ে উঠি, বিছায়্যা লোহিত পাটি
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
সোলেমানি মালা ধরে জপে পীর পয়গাম্বরে
পীরের মোকামে দেই সাঁজ।

১৯. উইলিয়াম এডাম ঃ শিক্ষা রিপোর্ট, (১৮৩৫-৩৮), কলিকাতা, পৃঃ ৬-৭।
২০. উইলিয়াম এডাম ঃ সেকেণ্ড রিপোর্ট, পৃঃ ২৬-২৭।
২১. এন. এন. ল ঃ প্রমোশন অব লার্নিং ডিউরিং মুহাম্মেডান রুল, লণ্ডন, ১৯১৬, পৃঃ XIV.

www.nagorikpathagar.org

দশবিশ বেরাদরে, বসিয়া বিচার করে,
অনুদিন কিতাব কোরান।
বড়ই দানিশমন্দ, কাহাকে না করে দ্বন্দ্ব
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।'[২২]

কবি বিপ্রদাস 'মনসা মঙ্গল'-এ লিখেছেন ঃ 'সৈয়দ, মোল্লা ও কাজীগণ সর্বদা কোরান ও ধর্মীয় গ্রন্থ (কিতাব) আলোচনা করে। প্রতিদিন দু'বার তারা ধর্মগ্রন্থের প্রতি সম্মান দেখায়।... সকল সৈয়দ, মোল্লা ও অন্যান্যরা আল্লাহর নাম জপ করে এবং সারাক্ষণ কোরান-কিতাবের উল্লেখ করে। তারা হিন্দুদের নিকট কলেমা পাঠ করে এবং তাদেরকে ইসলাম শিক্ষা দেয়। তারা প্রত্যহ ওজু ও নামাজ শিক্ষা দেয় ও মক্তবের কাজে নিয়োজিত থাকে।'[২৩]

মুসলমানগণ তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং আচার-ব্যবহারেও ইসলামী ঐতিহ্যের অনুসারী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে কবি মুকুন্দরাম-এর বর্ণনা উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন ঃ 'মুসলমানরা মাথায় কোন কেশ রাখে না, কিন্তু বুক পর্যন্ত দাড়ি রাখে। তারা সর্বদা নিজস্ব রীতি-পন্থা অনুসরণ করে। তারা মাথায় টুপী পরে। তাদের টুপীতে দশটি রেখা থাকে। তারা ইজার-পায়জামা পরে এবং তা তাদের কোমরের সাথে শক্ত করে বাঁধা থাকে। কোন মুসলমানকে খালি মাথায় দেখলে তার সাথে কোন কথা বলে না। কিন্তু যাবার সময় তারা তার দিকে মাটির ঢিল নিক্ষেপ করে।'[২৪]

সমসাময়িক কবি দ্বিজ বংশীবদন, ষষ্টিবর প্রমুখের বিবরণেও মুসলমানদের পোশাকরূপে পাজামা, লম্বা কোর্তা ও টুপীর কথা জানা যায়। পনেরো শতকের গোড়ার দিকে চীনা পর্যটক মাহুয়ান-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বাংগালী হিন্দু কবিদের বিবরণ যথার্থ ছিলো। মাহুয়ান লিখেছেন যে, লোকেরা তাদের মাথা মুণ্ডন করে এবং মাথায় সুতী পাগড়ী ব্যবহার করে। তারা বন্ধনীযুক্ত লম্বা ও ঢিলা পোশাক পরে এবং মাথায় শিরাবরণ ব্যবহার করে।[২৫]

সে যুগের মুসলমানগণ আচার-আচরণে অকপট ও সরল এবং উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। কপটতা, ফাঁকিবাজি, ওয়াদা খেলাফী বা চুক্তি ভঙ্গের অপরাধ থেকে তাঁরা মুক্ত ছিলেন। তাঁদের এসব গুণের প্রশংসা চীনা পরিব্রাজকদের বিবরণে এবং কোন কোন হিন্দু কবির বর্ণণায়ও পাওয়া যায়। সে যুগের মুসলমানদের সম্পর্কে মুকুন্দরাম লিখেছেন ঃ 'তারা জ্ঞানী ও বিদ্যান। কপটতা ও ফাঁকিবাজি তাদের কাছে অপরিচিত।' এ প্রসঙ্গে মাহুয়ান লিখেছেন ঃ 'তাদের আচার-ব্যবহারে তারা

২২. মুকুন্দরাম ঃ চণ্ডিকাব্য, পৃঃ ৩৪৪।
২৩. বিপ্রদাস ঃ মনসা মঙ্গল (সুকুমার সেন সম্পাদিত), এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃঃ ৬৭।
২৪. মুকুন্দরাম ঃ চন্ডিকাব্য, পৃঃ ৩৪৪।
২৫. Mahuan's Account ; N. K. Bhattasali : Coins and Chronology etc. p-170

www.nagorikpathagar.org

অকপট ও সরল।'[২৬] আরেকজন চীনা দূত সি-হুয়াং চৌ কুং তিয়েন লু লিখেছেন ঃ 'বাংলার অধিবাসীরা ভালো স্বভাবের লোক। তারা ধনী ও সৎ। তারা এরূপ সৎ ছিলেন যে, সর্বদা তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি মেনে চলতেন। চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর কখনো তারা এ সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করতেন না।' সে চুক্তিতে দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রার লেন-দেন হলেও এ নিয়ে পরে তারা কোন কথা তোলতেন না।[২৭]

এ দেশে মুসলিম আগমনের আগে হিন্দুরা পবিত্রকরণ বা শুদ্ধিকরণের জন্য গোবর-গোচনা ব্যবহার করতো। মুসলমানরা এসে বাহ্যিক পবিত্রতার জন্য পানি আর অন্তরের পবিত্রতার জন্য তওবার রীতি প্রবর্তন করেন।

মুসলমানদের সহজ-সরল জীবন-যাপন পদ্ধতি, তাদের সামাজিক সাম্য, ঐক্য ও ন্যায়বিচার, তাদের ধর্মীয় জীবনের পবিত্রতা, নৈতিক জীবনের শূচিতা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে উন্নত সংস্কৃতির ছাপ ও উন্নত রুচিবোধ এবং তাদের সততা, বিশ্বস্ততা ও ওয়াদা পালনে দৃঢ়তা প্রতিবেশী সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। বাংলার সাধারণ জনজীবনের মতোই এখানকার হিন্দু সমাজের উঁচুকোঠায় মুসলিম প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। হিন্দু রাজকর্মচারী ও ভূস্বামীরা তাঁদের আচার-অনুষ্ঠান ও শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকদের অনুসরণ করতেন। তাঁরা ফারসী অধ্যয়ন করতেন, মুসলমানদের মতো পোশাক-পরিচ্ছদ পরতেন এবং নিজেদের দরবারী জীবন মুসলিম দরবারগুলির অনুকরণে গড়ে তোলতেন। হিন্দু রাজন্য ও জমিদার-ভূস্বামীরা মুসলিম দরবারের ঐতিহ্যই শুধু অনুসরণ করেননি, তাঁরা অনেকে মুসলিম উপাধিও ধারণ করেছেন।[২৮]

৬. রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা

মুসলিম শাসনামল বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের গঠন-যুগ হিসাবে চিহ্নিত। মুসলিম বিজয় বাংলা ভাষাভাষী লোকদেরকে একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐক্যমঞ্চে সংঘবদ্ধ করে। এ সময়ই বাংলা ও বাংগালীর ইতিহাসের ভিত্তি রচিত হয়। এ সময় বাংলার সব ক'টি অঞ্চলের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের ভিত গড়ে ওঠে। মুসলিম শাসন বাংলার রাজনৈতিক জীবনে, শাসন পদ্ধতিতে ও আইন-কানুনের ক্ষেত্রে এবং ভাষা, শিক্ষা, শিল্প-কলা ও সংস্কৃতিতে ঐক্য এনে দেয়।

মুসলিম শাসনের আগে 'বাংলা' নামে কোন দেশ ছিলো না। 'বাংলা' নামটি এ দেশের জন্য অপরিচিত ছিলো। এ দেশের অধিবাসীদের জন্য 'বাংগালী' পরিচয় কিংবা

২৬. পূর্বোক্ত।

২৭. বিশ্বভারতী এ্যানালস, ১৯৪৫, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯৬-১৩৪, ডক্টর এম. এ. রহীম ঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পৃঃ ৩০৭।

২৮. গোপাল হালদার ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ২০০।

www.nagorikpathagar.org

তাদের ভাষার 'বাংলা' নামকরণ তখনো হয়নি। মুসলমান শাসকরাই বাংলার সবগুলি অঞ্চলকে একটি রাজনৈতিক ঐক্যে সংহত করেন এবং এই নব-সংগঠিত অঞ্চলের 'বাংলা' নাম ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত করেন।[২৯]

৭. বাংলা ভাষার উন্নয়ন

বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য সাধারণ ভাষারূপে বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও বাংলা সাহিত্যের বিকাশে মুসলমানদের অবদান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ দেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে 'বাংলা' ও 'বাংগালী' নাম দু'টি ইতিহাসে স্থান পেতো কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে সেন ও বর্মনদের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণদের ঘৃণা ও অবজ্ঞার শিকার হয়ে 'সদ্যজাত বাংলা ভাষা'র অবস্থা ছিলো জীবন্মৃত। মুসলমানগণ সে ভাষাকে গৌরবজনক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে মুসলিম অবদানের উল্লেখ প্রসঙ্গে ডকটর হাসান জামান লিখেছেন ঃ 'মুসলিম আমলের পূর্বে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কোনও নজির পাওয়া যায় না। অবশ্য বৌদ্ধ যাজকেরা বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে বাংলার লৌকিক ও কথ্য ভাষায় ধর্ম প্রচার ও ধর্মগ্রন্থ রচনা করতেন। খ্রীস্টীয় সপ্তম ও দশম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্যবাদের সংগে সংঘর্ষে বৌদ্ধদের সে ধর্ম-সাহিত্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। সাধারণ লোকের মুখের ভাষাকে ব্রাহ্মণেরা ইতর বা নীচুদরের ভাষা বলতেন। মুসলিম সম্পর্কের ফলে ইসলামের তওহীদ ও সাম্য-নীতির সংস্পর্শে বৌদ্ধ দোঁহার এ বাংলা ভাষা ও তুর্কী মুসলিমের সংযোগে এক নতুন ভাষার উৎপত্তি হলো, যা বাংলা ভাষার প্রথম, স্পষ্ট ও ঐতিহাসিক সাহিত্যিক রূপ।'[৩০] ডক্টর হাসান জামানের মতে ঃ 'উত্তর ভারতে মুসলমানের শ্রেষ্ঠ দান যেমন উর্দু ভাষা, তেমনি বাংলাদেশে মুসলমানের শ্রেষ্ঠ দান হলো বাংলা ভাষা।'[৩১]

মুসলিম শাসনের আগে ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসনের শিকার সদ্যজাত বাংলার যে দুরবস্থা হয়েছিলো, সে সম্পর্কে মোহাম্মদ আসাদুজ্জামানের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন ঃ 'যদি বাংলায় মুসলিম বিজয় ত্বরান্বিত না হতো এবং এ দেশে আর কয়েক শতকের জন্য হিন্দু শাসন অব্যাহত থাকতো, তবে বাংলা ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যেতো এবং অবহেলিত ও বিস্মৃত-প্রায় হয়ে অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত হতো।'[৩২]

শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ইসলামের গণমুখী বৈশিষ্ট্য ও গণতান্ত্রিক শক্তি বাংলার সমাজ জীবনে আলোড়ন তোলে এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে। হিন্দু

২৯. ডক্টর এম. এ. রহীম ঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পৃঃ ৪৭০।
৩০. ডকটর হাসান জামান ঃ সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য পৃঃ ২০১।
৩১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০২।
৩২. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকা।

www.nagorikpathagar.org

শাসনামলে শিক্ষা ও ধর্মের বাহনরূপে এবং রাজদরবারের ভাষারূপে সংস্কৃতের একচেটিয়া অধিকার ছিলো। এ ভাষা ছিলো সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণদের কুক্ষিগত। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা ছিলো অবহেলিত ও ঘৃণিত। বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণেরা নিষেধের বাণী উচ্চারণ করেছিলো ঃ 'যে মানব অষ্টাদশ পূরাণ ও রামায়ন বাংলায় শোনে, তার ঠাঁই হবে রৌরব নরকে।'[৩৩] জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত হয়েছে যে, ধর্মীয় শ্লোক বা মন্ত্র যদি নিম্নশ্রেণী বা অবর্ণ হিন্দুরা আয়ত্ত করে, তবে এর ক্রিয়াশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে![৩৪]

বাংলায় মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের একাধিপত্যের অবসান ঘটে। ফলে জনগণের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি শৃংখলমুক্ত হয়। মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে হিন্দুরা দেখতে পায় যে, মুসলমানদের কোরআন-হাদীস সকলের জন্যই উন্মুক্ত। এসব ধর্মগ্রন্থ পাঠ বা আয়ত্ত করার ব্যাপারে কারো জন্য কোন বিধিনিষেধ নেই। এ নবলব্ধ অভিজ্ঞতা হিন্দু সমাজে ব্যাপক ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ যুগে তারা তাদের ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করার সুযোগ পায়। মুসলিম শাসকদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতার ফলে রামায়ণ-মহাভারতসহ হিন্দুদের বহু ধর্মগ্রন্থ বাংলায় অনুদিত হয়ে জনগণের কাছে উন্মুক্ত হয়।

মুসলিম শাসকগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে রাষ্ট্র ও সমাজে এবং রাজদরবারে বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এ প্রসঙ্গে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন ঃ 'হিন্দু রাজাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকলে বাংলা ভাষা রাজ-দরবারে স্থান লাভ করার কোন সুযোগই পেতো না। এমনিভাবে মুসলমান শাসক ও আমির-ওমরাহর পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহের ফলে হিন্দু জমিদাররাও বাংগালী কবিদের প্রতি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানে অনুপ্রাণিত হন।'[৩৫] এ সময়ে হিন্দু সমাজের ধোপা, নাপিত, ঝাড়ুদার, গোয়ালা, মালী প্রভৃতি তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেরাও সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন অংগনে নিজেদের খ্যাতিমান করার সুযোগ পায়।[৩৬]

মুসলিম বিজয়ের আগে বাংলা ভাষা খুবই প্রাথমিক স্তরে ছিলো। এ ভাষার সুস্পষ্ট রূপ তখনো গড়ে ওঠেনি। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণই প্রধানত এ ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেন শাসনামলের ব্রাহ্মণ্যবাদী নির্যাতন, নিপীড়ন ও সন্ত্রাসের ভয়াবহ পরিস্থিতি এই সিদ্ধাচার্যদের অনেককেই দেশের বাইরে তিব্বত, নেপাল প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। মুসলিম শাসন আর কিছুকাল বিলম্বিত হলে বাংলা ভাষার অস্তিত্বই লুপ্ত হয়ে যেতো। মুসলিম শাসনামলের উদারনৈতিক পরিবেশ, সহানুভূতিশীল দৃষ্টি ও সযত্ন পরিচর্যার ফলেই বাংলা ভাষার ভ্রুণশিশু অপমৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়ে যথাসময়ে

৩৩. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঃ The Influence of Urdu-Hindi on Bengali Language and Literature : Journal of the Asiatic Society of pakistan, সপ্তম খণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ১।
৩৪. জয়ানন্দ ঃ চৈতন্য মঙ্গল, পৃঃ ১৩৯।
৩৫. দীনেশচন্দ্র সেন ঃ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পৃঃ ৭৩-৭৫।
৩৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭৪-২৭৫, ৩০৯-৩১০।

www.nagorikpathagar.org

নির্দিষ্ট আকার ধারণ করতে পেরেছে।

এ প্রসংগে ডক্টর এম. এ. রহীম মন্তব্য করেন ঃ 'এটা খুবই আশ্চর্যজনক ঘটনা যে, মুসলমান শাসক ও অভিজাত সম্প্রদায়, যাদের নিজেদেরই একটা সমৃদ্ধিশালী ভাষা ছিল, তারা তাদের প্রজা সাধারণের ভাষা বাংলাকে পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। এর উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় ইসলামের উদারতা ও গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং মুসলিম শাসকদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে। ইসলাম সকল মানুষের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা তুলে ধরেছে এবং মুসলমান শাসকবৃন্দ ধর্মের এই মহান আদর্শই সমুন্নত রেখেছিলেন।'[৩৭]

মুসলমান শাসকবর্গ বিজিত প্রদেশে স্থায়ী ও শক্তিশালী সরকার কায়েম করতে চেয়েছেন। এ কারণে তাঁরা এ বিপুল জনগণের ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেছেন। বাংলাই ছিলো একমাত্র ভাষা, যার মাধ্যমে তাঁরা স্থানীয় অধিবাসীদের মনোভাব জানতে পারতেন এবং তাদের সাথে চিন্তাধারার আদান-প্রদান করতে পারতেন। ইসলাম প্রচারকদের অনুসৃত নীতি ও আদর্শ মুসলিম শাসকদের এই গণমুখী ভাষানীতিকে সমর্থন ও উৎসাহ যুগিয়েছে। এ দেশে ইসলাম প্রচারের সূচনা থেকেই আলিম ও সুফী-দরবেশগণ জনগণের মুখের ভাষা আয়ত্ত করে সে ভাষাতেই ইসলাম প্রচার করেছেন। জনগণের মুখের ভাষাতেই তাঁদের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন এবং ঘনিষ্ঠতা অর্জন সম্ভব, এ ব্যাপারে ইসলাম প্রচারকগণ সচেতন ছিলেন। মুসলিম শাসন-নীতিতেও এ সচেতনতা প্রভাব বিস্তার করেছিলো।

৮. বাংলা সাহিত্যে ঐতিহ্যের নব-নির্মাণ

মুসলিম শাসনামলের বাংলা সাহিত্যে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহ্যের প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি হলো বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম ঐতিহ্য।[৩৮] প্রাচীন বাংলা ভাষার সূচনা হয়েছিলো বৌদ্ধ-ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে। কিন্তু এ দেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার আগে ব্রাহ্মণ্য-হিন্দু ধর্মের চাপে বৌদ্ধ-ঐতিহ্য অত্যন্ত দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু ছিলো। ব্রাহ্মণ্য অত্যাচারের মুখে বৌদ্ধরা মুসলিম শাসনকে দু'বাহু বাড়িয়ে স্বাগত জানিয়েছিলো। 'নিরঞ্জনে রুষ্মা' নামক কবিতায় তা প্রতিফলিত হয়েছে। মুসলিম ঐতিহ্যের সৃষ্টিলগ্নে হিন্দু-ঐতিহ্যও ছিলো তার প্রাথমিক অবস্থায়। এ ছাড়া হিন্দু ঐতিহ্য ছিলো একান্তভাবে পৌরাণিক দেবদেবী ও অতিপ্রাকৃতিক অন্যান্য বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। ভাগবত, পদ্ম-পুরাণ, গৌরসংহিতা, শ্রীমহৎ মহর্ষি, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, বেদব্যাসের ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রভৃতি হিন্দু-ধর্মগ্রন্থে কৃষ্ণের বিভিন্ন প্রণয়লীলার যে সব বিবরণ রয়েছে, তা বাংলা সাহিত্যের

৩৭. ডক্টর এম. এ. রহীম ঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পৃঃ ২৫০।
৩৮. ডক্টর সৈয়দ আলী আশরাফ ঃ মুসলিম ট্রাডিশনস ইন বেঙ্গলী লিটারেচার, পৃঃ-২।

www.nagorikpathagar.org

হিন্দু ঐতিহ্যকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিলো।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও পদ্ম পুরাণে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলা সম্পর্কিত এক নিবন্ধে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন ঃ 'ভাগবতের বর্ণনা অতিমাত্রায় যৌন আবেদনমূলক। কিন্তু তথাপি উহাতে রাধার নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ভাগবত হইতে আমরা যখন ব্রাহ্মবৈবর্ত ও পদ্ম পুরাণে আসিয়া পৌছি তখনই মাত্র আমরা রাধার প্রথম সাক্ষাত লাভ করি। এই দুইটি পুরাণে ভাগবতের যৌন ভাবের চরম বিকাশ দেখিতে পাই। ইহা উন্মত্ত প্রেমকাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেখানে রাধা আছে, আয়ানও (রায়ান) আছে এবং এক কথায় আছে প্রেম তথা যৌন উন্মাদনার উদ্দাম লীলা-খেলা— কাম দেবতা কন্দর্পের তাণ্ডব নৃত্য।'[৩৯]

অশ্লীল ও কদর্য কাহিনীতে ভরপুর হিন্দু পুরাণগুলিই ছিলো বাংলা সাহিত্যে হিন্দু ঐতিহ্যের উৎস। এ ব্যাপারে অনেক সময় কোন কোন সচেতন ব্রাহ্মণের পক্ষেও প্রতিক্রিয়াহীন থাকা সম্ভব হয়নি। আর্যমিশন ইন্সটিটিউট-এর প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত পঞ্চানন ভট্টাচার্য 'শ্রীমতভাগবত গীতা'র ৩১তম সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন ঃ '... এই গ্রন্থে (ভাগবত) শ্রীকৃষ্ণের হাস্য-পরিহাস ও ষোল সহস্র গোপিনীর সহিত তাহার প্রেমলীলার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান যুগের মানুষের মন আর কোন কিছু অন্ধভাবে বিশ্বাস করিতে রাযী নহে। সুতরাং যদি তাহারা এই সকল কাহিনীকে শুধুমাত্র শব্দ অর্থে গ্রহণ করে এবং এই সমস্ত শাস্ত্র-গ্রন্থকে অশ্লীল ও কদর্য বলিয়া ঘৃণা করে তাহা হইলে ইহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। ... যদি দুষ্কৃতিকারীগণকে তাহাদের পাপ কার্যের জন্য ধর্ম ও শাস্ত্রের কথা তুলিয়া ভর্ৎসনা করা হয়, সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা উত্তর দেয় "তোমরা শাস্ত্র ধর্ম্ম শিকায় তুলিয়া রাখ। ষোল হাজার গোপিনীর সহিত প্রণয়লীলা খেলিয়াও যদি শ্রীকৃষ্ণ নিষ্পাপ থাকিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার চাইতে অনেক কম পাপ করিয়াও কেন এই নশ্বর মানুষ পাপী হইবে।" যদি শব্দগত অর্থই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের একমাত্র অর্থ হয়, তাহা হইলে হিন্দু ধর্ম্মে কিছুই নাই। এই সমস্ত অশ্লীল ও তুচ্ছ বিষয় লইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে পারে কি করিয়া?'

হিন্দু পুরাণসমূহের বিভিন্ন কাহিনী পরীক্ষা করে শব্দগত অর্থের বাইরে অন্য কোন গুঢ় অর্থ বের করার সুযোগ আছে কিনা, তা পণ্ডিতেরা বলবেন, তবে সাধারণ মানুষের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। সে কারণে সে সব অশ্লীল লীলা-খেলাই হাজার বছর ধরে এ দেশের আর্যদের ধর্মীয় কাহিনীর উপজীব্য ছিলো। সে সব অশ্লীল পুরাণ অনুসরণ করেই এদেশের সাহিত্যের হিন্দু ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিলো। বাংলাদেশের সে যুগের সাহিত্যের হিন্দু ঐতিহ্যের যে রূপ, তার অন্যতম প্রধান উৎস ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ। উক্ত পুরাণ গ্রন্থ থেকে রাধিকার প্রেম-বিহারের একটি মাত্র বিবরণ এখানে তুলে ধরা হলো ঃ 'হে বৎস! আমার আজ্ঞানুসারে আমার নিয়োজিত কার্য করিতে উদযুক্ত হও। হে মুনে!

৩৯. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ 'পরিচয়', আশ্বিন, ১৩৪৩ বাংলা সন; মোহাম্মদ আকরম খাঁ ঃ মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পৃঃ ১১৪।

www.nagorikpathagar.org

জগদ্বিধাতা, ইশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাধা কৃষ্ণকে প্রণাম করতঃ নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। ব্রহ্মা প্রস্থান করিলে দেবী রাধিকা সহাস্য বদনে সকটাক্ষ নেত্রে হরির বদন মণ্ডল বারংবার দর্শন করতঃ লজ্জায় মুখ আচ্ছাদন করিলেন। ১২৫-১৩০। অত্যন্ত কামবাণে পীড়িতা হওয়াতে রাধিকার সর্বাঙ্গ পুলকিত হইল; তখন তিনি ভক্তিপূর্ব্বক হরিকে প্রণাম করতঃ তাঁহার শয়নাগারে গমন করিয়া কস্তুরী কুঙ্কুম মিশ্রিত চন্দন ও অগুরুর পঙ্ক কৃষ্ণের বক্ষে বিলেপন করিলেন এবং স্বয়ং ললাটে তিলক ধারণ করিলেন। তৎপরে সুধা ও মধুপূর্ণ রত্নপাত্র হরিকে প্রদান করিলেন; হরি তাহা সাদরে গ্রহণ করতঃ ভোগ করিতে লাগিলেন। রাধিকা কর্পূরাদি সুবাসিত তাম্বুল কৃষ্ণকে প্রদান করিলেন, হরি সাদরে তাহা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাধাও সম্মত হইয়া হরি প্রদত্ত সুধারস তাম্বুল হরির সমক্ষেই চর্ব্বন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ আনন্দে চর্ব্বিত তাম্বুল রাধাকে প্রদান করিলেন। রাধা তাহা পরম ভক্তির সহিত ভোজন করতঃ মুখকমল পান করিতে লাগিলেন। মধুসূদন রাধার চর্ব্বিত তাম্বুল যাঞ্চা করাতে রাধা তখন হাস্য করতঃ বলিলেন, সে বিষয়ে আমাকে ক্ষমা কর। তাহার পর মাধব রাধিকার সর্ব্বাঙ্গে চন্দন অগুরু কুস্তুরী কুঙ্কুম প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য লেপন করিলেন। কাম নিয়ত যাঁহার চরণ কমল চিন্তা করে, অদ্য তিনিই রাধিকার সন্তোষের নিমিত্ত সেই পদানত কামের বশীভূত হইলেন। হে নারদ! যাঁহার ভৃত্যের ভৃত্য-সমীপে কাম পরাজিত হয়, অদ্য সেই কাম ভগবান স্বেচ্ছাময় বলিয়া তাঁহাকে কৌতুকে পরাজয় করিতে লাগিল। তৎপরে কৃষ্ণ রাধিকার কর ধারণ করিয়া স্বীয় বক্ষে স্থাপন করতঃ চতুর্বিধ চুম্বন পূর্ব্বক তাঁহার বস্ত্র-শিথিল করিলেন। হে মুনে! রতি যুদ্ধে ক্ষুদ্র ঘন্টিকা সমস্ত বিচ্ছিন্ন হল, চুম্বনে ওষ্ঠরাগ, আলিঙ্গনে চিত্রিত পদাবলী, শৃঙ্গারে কবরী ও সিন্দুর তিলক এবং বিপরীত বিহারে অলক্তাঙ্কুর প্রভৃতি দূরীভূত হইল। ১৫১-১৫৩। রাধিকার সরসঙ্গম বশে সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল; তিনি মুর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন; তাঁহার দিবারাত্রি জ্ঞান থাকিল না; কামশাস্ত্র পারদর্শী কৃষ্ণ, অঙ্গ প্রত্যক্ষ দ্বারা রাধিকার প্রত্যঙ্গ আলিঙ্গন করতঃ অষ্টবিধ শৃঙ্গার করিলেন। পুনর্ব্বার সেই বক্রলোচনা রাধিকাকে আকর্ষণ করিয়া হস্ত ও নখ দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিলেন। তখন শৃঙ্গার সমরোদ্ভুত কঙ্কন কিঙ্কিনী মঞ্জীর প্রভৃতির মনোহর শব্দ হইতে লাগিল। তৎপরে কামশাস্ত্র বিশারদ কৃষ্ণ, নির্জ্জনে কৌতুকবশতঃ রাধিকাকে বসন, কবরী ও বেশভুষাদি হইতে বিমুক্তা করিলেন। রাধিকাও তাঁহাকে চূড়াবিহীন এবং বেশ বস্ত্রাদি বিমুক্ত করিলেন। তাঁহারা উভয়েই কার্য্যকুশল বলিয়া তাঁহাদিগের সেইরূপ ভাব কোনরূপ ক্ষতিকর হইল না।'[৪০]

পৌরাণিক দেবদেবীদের অতিমানবিক কাহিনী মাত্রই অতিশয় অশ্লীল ও কদর্য। এসব অতিপ্রাকৃত বিষয়-সম্পৃক্ত হিন্দু ঐতিহ্যের মুকাবিলায় মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণ মর্তের সাধারণ মানব-মানবীকে তাঁদের সাহিত্যের উপজীব্য করে তাদের মানবীয়

৪০. পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, পৃঃ ৪৫৯; মোহাম্মদ আকরম খাঁ ঃ মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পৃঃ ১১৪-১১৫।

www.nagorikpathagar.org

আবেগ-অনুভূতি, রোমাঞ্চ, শক্তিমত্তা ও বীর্যবত্তা, প্রেম-বিরহকে সাহিত্যে স্থান করে দেন। মুসলিম কবিগণ শিশুপ্রায় বাংলা সাহিত্যকে তাদের বিষয়বস্তুর ঐশ্বর্য ও মানবিক চিন্তাধারায় বিশিষ্ট করে তোলেন। হিন্দু ঐতিহ্যের অশ্লীল ও অতিমানবিক ধারার বিপরীতে তাঁরা বাংলা সাহিত্যে উন্নত নৈতিকতা ও মানবিকতা যুক্ত করেন। মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁদের প্রেম-কাহিনীসমূহে নায়ক-নায়িকার নৈতিকতা ও সতীত্ব সর্বপ্রযত্নে অক্ষুণ্ন রাখেন। মানবীয় গুণাবলী, জীবনের গৌরব ও শুদ্ধচিত্ততার প্রতীকরূপে প্রেমকে তাঁরা উপস্থাপন করেন।

গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ-এর সমসাময়িক প্রতিভাশালী মুসলিম কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'ইউসুফ জুলাইখা'তে ইসলামের ধর্মীয় কাহিনী যুক্ত করে বাংগালী কবিদের জন্য নতুন বিষয়বস্তুরূপে মানবীয় রম্য উপাখ্যানের ধারা প্রবর্তন করেন। কবি দৌলত উজীর বাহরাম খান তাঁর 'লায়লী মজনু' প্রেমকাব্যে নায়িকার জন্য নায়কের প্রেমকে উন্নত নৈতিকবোধে উন্নীত করেন। এ প্রসঙ্গে ডক্টর এম. এ. রহীম লিখেছেন ঃ 'যখন হিন্দু ঐতিহ্যের পবিত্র দেব-দেবীর অপবিত্র প্রেমকে পূজা করার মধ্যে জীবনের নৈতিক মূল্যবোধ অনুপস্থিত ছিল, তখন বাস্তবিক মুসলমান কবিদের নৈতিক ঐতিহ্যবাহী রম্য কাব্য ছিল বাংলা সাহিত্যের এক বিস্ময়কর ঘটনা।'[৪১]

মুসলিম কবি-সাহিত্যকগণ বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস বিষয়ক সাহিত্যেরও পথিকৃত ছিলেন। তাঁদের রচিত 'রসূল বিজয়', 'গাজী বিজয়' 'গোরক্ষ বিজয়' প্রভৃতি বিজয়-কাব্য বাংলা সাহিত্যে ঐতিহ্যধর্মী একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করে। এভাবে মুসলমান কবি-সাহিত্যিকগণ বিষয়বস্তু এবং ভাষা ও আঙ্গিকে একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী ঐতিহ্যের প্রবর্তন করেন। তাঁদের এ সব অবদান বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে অত্যন্ত মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণরূপে স্বীকৃত। বাংলা সাহিত্যের এ মুসলিম ঐতিহ্য বাংলা ভাষাকে নানা দিক থেকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তোলে।

চৌদ্দ শতকের শাহ মুহাম্মদ সগীর, পনেরো শতকের কবি মুজাম্মিল, ষোল শতকের ফয়জুল্লাহ প্রমুখ মুসলিম কবি সাহিত্যিক ইসলামী ভাবধারাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠনের ক্ষেত্রেও তাঁরা তাঁদের গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন। জনগণের মুখের ভাষায় লেখা ইসলামী শিক্ষার এসব প্রাথমিক গ্রন্থ সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য ও গ্রহণযোগ্য ছিলো।

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণ বস্তু-বিষয়ক ঐতিহ্যও স্থাপন করেন। অনুরূপভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো তাঁদের ভাষা-ভিত্তিক ঐতিহ্য। সমৃদ্ধ আরবী ও ফারসী ভাষা থেকে অসংখ্য শব্দ, প্রবাদ, ভাষারীতি, বাচ্যরীতি আমদানী করে বাংলা ভাষাকে তাঁরা সম্পদশালী করে তোলেন। এই ধারা এতোটা শক্তিশালী ও অপরিহার্য হয়ে ওঠে যে, গোড়া হিন্দু কবিরাও এই ঐতিহ্যের অনুসরণ করেছেন। সে ঐতিহ্যের প্রভাব

৪১. ডক্টর এম. এ. রহীম ঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৫৫।

www.nagorikpathagar.org

ভারতচন্দ্র কিংবা কবি কঙ্কনসহ অনেক হিন্দু কবির লেখায় স্পষ্ট। সাহিত্যের ভাষা, আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণ একটি নতুন ঐতিহ্যের ধারা প্রবর্তন করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সে ধারা সব দিক দিয়ে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তোলে। এ ঐতিহ্য বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

স্বাধীন সুলতানী আমলের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ 'এই পর্বে বাংলা সাহিত্যের লক্ষ্যণীয় বিকাশ ঘটে। কয়েকজন দিকপাল কবি এই পর্বেই আবির্ভূত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সুগঠিত ও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন করেন, তাঁদের অনেকেই বাংলার রাজা ও রাজ-কর্মচারীদের কাছে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। কাজেই বাংলার ইতিহাসের আলোচ্য এই পর্বটি সব দিক দিয়েই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই পর্বে যে সব সুলতান বাংলাদেশের শাসন করেছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই অসাধারণ ছিলেন।'[৪২]

৯. অর্থনৈতিক গৌরব প্রতিষ্ঠা

সেন-বর্মন শাসনামলে উৎপাদনের সাথে জড়িত শ্রমজীবী মেহনতি শ্রেণীটিকে সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে ঠেলে দেয়া হয়েছিলো। তাদের সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক গৌরব ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিলো। উৎপাদনের সাথে যার যত বেশী দূরত্ব, যিনি যত বেশী শ্রমবিমুখ এবং অন্যের শ্রমের উপর যত বেশী নির্ভরশীল, সমাজে তার মর্যাদা ছিলো তত বেশী। পরজীবী ব্রাহ্মণদের মর্যাদা ছিলো সমাজে সবার ওপরে। তারপর ছিলো শাসক ও যোদ্ধারূপে ক্ষত্রিয়দের স্থান। ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত লোকদের স্থান ছিলো তাদের পরে– তৃতীয় স্তরে। সবার নিচে ছিলো শ্রম ও উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত শিল্পী কারিগর, স্থপতি ও কৃষকদের স্থান।

মুসলিম শাসনামলে এই অবস্থা পাল্টাতে শুরু করে। নিম্নপদস্থ কর্মচারী, চিকিৎসক, শিক্ষক, ধর্মপ্রচারক, কবি, সঙ্গীত-শিল্পী প্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তিক পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে এ সময় একটি মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব হয়। এ যুগের বিশেষ বৈশিষ্ট্যরূপে শিল্পী, কারিগর ও অন্যান্য উৎপাদনকারী ব্যক্তিরা এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হন। মুসলিম শাসনামলে শিল্পী ও কারিগরদের দক্ষতা নানাভাবে উৎসাহিত হতে থাকে। ফলে তাদের আত্মবিকাশের পথ সুগম হয়। শিল্পী ও কারিগররা তাদের শ্রম ও দক্ষতার উপযুক্ত মূল্য পাওয়ার ফলে তারা সুন্দর ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন করতে সক্ষম ছিলেন।

মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। শীঘ্রই এদেশ পৃথিবীর একটি অতি সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে

৪২. সুখময় মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, স্বাধীন সুলতানদের আমল, গ্রন্থকারের নিবেদন, প্রথম সংস্করণ।

www.nagorikpathagar.org

পরিচিত হয়। সে যুগে একটি দেশের সমৃদ্ধি যে সব বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রকাশ পেতে পারতো, মুসলিম শাসনামলে তার সব ক'টি দিক দিয়েই বাংলাদেশ অগ্রসর ও সমৃদ্ধ ছিলো। সে জিনিসগুলির মধ্যে প্রধান হলো ঃ ক, কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য, খ. প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর সহজ-লভ্যতা, গ. ব্যাপক বৈদেশিক বাণিজ্য এবং ঘ. দেশে স্বর্ণ ও মূল্যবান ধাতুর প্রাচুর্য। সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও পরিব্রাজকগণ এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই মুসলিম শাসনামলে উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধির বিবরণ দিয়েছেন। সম্রাট হুমায়ুন বাংলায় প্রবেশ করে এ দেশকে উদ্যান ও স্বর্গরূপে দেখেছেন। তিনি এ দেশের নাম দিয়েছেন জান্নাতাবাদ। কারো কারো চোখে এ দেশটি ছিলো 'জান্নাতুল বালাদ' বা ভূস্বর্গ।

যুগের বিচারে মুসলিম শাসনামলের বাংলাদেশ ছিলো বিশ্বের সেরা শিল্পোন্নত দেশগুলির অন্যতম। সূতা, সূতীবস্ত্র ও রেশমী বস্ত্রে এ দেশের খ্যাতি ছিলো সকলের শীর্ষে। চিনি ছিলো এ দেশের অন্যতম প্রধান শিল্প। এ ছাড়া কার্পেট, কাগজ, ধাতব শিল্প, অলঙ্কার, কৃষি যন্ত্রপাতি, লবণ-শিল্প, জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উন্নত এক গৌরবময় শিল্প-সভ্যতার অধিকারী ছিলো। বাংলার সুদক্ষ কারিগরদের হাতে তৈরী মসলিন দুনিয়াজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলো। মুসলমানরাই সর্বপ্রথম এ দেশে কাগজের প্রচলন করেন। মুসলমানদের মধ্যে কারিগরদের একটি দল ছিলেন 'কাগচা' বা 'কাগজিয়া' নামে পরিচিত। তারা কাগজ তৈরি করতেন। চীনা পর্যটক মাহুয়ানও তাদের তৈরী কাগজের প্রশংসা করেছেন।

কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যে মুসলিম শাসনামলের বাংলাদেশ উদ্বৃত্ত ছিলো। সমুদ্র-চারণ ও বাণিজ্যিক কর্মোদ্যমের ক্ষেত্রে মুসলমানগণ এ দেশে এক নতুন যুগের সূচনা করেন। এই নব-সৃষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনার ফলে বাংলার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। বাংলার এ যুগের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি সম্পর্কে বহুসংখ্যক বিদেশী পর্যটক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। চীনা পর্যটক মাহুয়ান উল্লেখ করেন যে, মুসলমানদের মধ্যে ধনী ব্যক্তিরা বৃহৎ জাহাজ তৈরি করতেন এবং এ সব জাহাজে করে বিদেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুসলিম অভিজ্ঞতার দ্বারা হিন্দু বণিকরাও ধন্য হয়েছেন। মুসলিম নাবিকগণ পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্র পথ ও বাণিজ্য বন্দরগুলির সাথে পরিচিত ছিলেন। তাই বাংলার হিন্দু বণিকগণ বহিঃসমুদ্রে জাহাজ চালনার ব্যাপারে মুসলমানদের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। মুসলমানদেরকে তারা জাহাজের কাপ্তান ও নাবিকরূপে নিয়োগ করতেন। মুসলমানদের ব্যবহৃত মুয়াল্লিম শব্দটিই এ দেশের জাহাজ চালকদের মালুম পদবীতে পরিণত হয়েছে। জাহাজ চালনার সাথে যুক্ত এমনি আরো বহু শব্দ মুসলিম ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করছে।

মুসলিম শাসনামলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সাথে সাথে বাংলায় সমুদ্র বন্দর ও নদী বন্দরের উন্নতি হয়। চট্টগ্রাম বৈদেশিক বাণিজ্যের সমৃদ্ধ বন্দররূপে এ আমলে

www.nagorikpathagar.org

ব্যাপক প্রসিদ্ধি অর্জন করে। পর্তুগীজরা এই বন্দরকে 'পোর্টোগ্রাণ্ডী' বা বড় বন্দর বলে উল্লেখ করতো। সাতগাও ছিলো বৈদেশিক বাণিজ্যের আরেকটি বিখ্যাত বন্দর। তবে চট্টগ্রামের তুলনায় এ বন্দরটি ছোট ছিলো। তাই পর্তুগীজরা এ বন্দরকে 'পোর্টো পিকানো' বা ছোট বন্দর নামে অভিহিত করতো। ভেনিসীয় বণিক মাস্টার সীজার এই ছোট বন্দরেই এক সাথে ৩০ থেকে ৩৬টি জাহাজে চাউল, কাপড়, বিভিন্ন ধরনের লাক্ষা, প্রচুর পরিমাণে চিনি, শুকনো হরিতকি, মরিচ প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য বোঝাই করে রফতানী করতে দেখেছেন।

এরও অনেক আগে স্বাধীন সুলতানী শাসনামলের একেবারে গোড়ার দিকে ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ-এর শাসনামলে বাংলাদেশ সফর করেন বিশ্ববিখ্যাত ভূপর্যটক ইবনে বতুতা। তিনি সোনারগাওকে দেশের একটি প্রধান বন্দররূপে দেখেছেন। সে সময় গঙ্গা, মেঘনা ও শীতলক্ষা সোনারগাওয়ের কাছে একই মোহনায় অবস্থিত ছিলো। ইবনে বতুতা সোনারগাও বন্দরে চীনদেশীয় তলা চ্যাপ্টা জাহাজে পণ্য বোঝাই করে জাভা নিয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।[৪৩]

১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে ঈসা খাঁর আমলে বাংলাদেশ সফরকারী র‍্যালফ ফিচ সোনারগাঁও থেকে প্রচুর পরিমাণে সূতীবস্ত্র বিদেশে রফতানী হতে দেখেছেন। এ ছাড়া তিনি বাংলাদেশ থেকে সমগ্র ভারত, সিংহল, পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রা এবং আরো বহু স্থানে প্রচুর পরিমাণে চাউল রফতানি হওয়ার বিবরণ দিয়েছেন।[৪৪] কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের প্রাচুর্যের কারণে মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশে বিরাট রফতানী বাণিজ্য গড়ে উঠেছিলো। সূতী বস্ত্র, চাউল, চিনি, রেশম বস্ত্র, আদা, মরিচ, লাক্ষা, হরিতকি ইত্যাদি ছিলো এ দেশের প্রধান রফতানী পণ্য। সিজার ফ্রেডারিক, ভারথেমা, র‍্যালফ ফিচ, বার্নিয়ার প্রমুখের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, মুসলিম শামনামলের বাংলা ছিলো কৃষি, শিল্প, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং পণ্যের সুলভমূল্য ও সহজ-লভ্যতার দিক থেকে বিশ্ব মানচিত্রে একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ দেশ।

সূতীবস্ত্র ছিলো এ দেশের প্রধান রফতানী পণ্য। বাংলার রফতানী বাণিজ্যে চাউলের ছিলো দ্বিতীয় স্থান। চিনি শিল্পে বাংলার অত্যন্ত সমৃদ্ধ ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিলো। বহু দেশে চিনি রফতানী করা হতো। লাক্ষা ছিলো বাংলার একচেটিয়া রফতানী পণ্য। বারবোসা উল্লেখ করেন যে, বাংলার বন্দরগুলি থেকে বহু জাহাজ প্রচুর পরিমাণ সূতীবস্ত্র, চিনি, আদা, মরিচ ইত্যাদি নিয়ে মালয় দ্বীপপুঞ্জ, বার্মা, ভারতীয় উপকূল, সিংহল, আরব, পারস্য ও আবিসিনিয়ায় যাতায়াত করতো। র‍্যালফ ফিচ এ দেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে মাখন রফতানী হতো বলেও জানিয়েছেন। বার্ণিয়ার বাংলাদেশকে লবণ বা শোরা পণ্যের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে দেখেছেন। তিনি লিখেছেন যে, শোরা

৪৩. ইবনে বতুতা ঃ এন কে ভট্টশালীর Coins and Chronology নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত।

৪৪. Purchas—His pilgrims, পৃঃ ১৮৫; ডক্টর এম. এ. রহীম ঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পৃঃ ৪৫০।

www.nagorikpathagar.org

পণ্যে বোঝাই বিরাট বিরাট মালবাহী জাহাজ ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকরা ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলিতে ও ইউরোপে পাঠাতেন। আলমগীরের সময় ফরাসী পর্যটক বার্নিয়ার সতেরো শতকের ত্রিশের দশকে এ দেশ সফর করেন। সে সময় উৎকৃষ্ট মানের লাক্ষা, আফিম, মোম, গন্ধ গোকুল, লম্বা মরিচ, বিভিন্ন ধরনের অষুধ, ঘি প্রভৃতি পণ্য বিদেশে রপতানী করা হতো বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। বার্নিয়ার মন্তব্য করেন যে, পৃথিবীর আর কোথাও বাংলার মতো নানা ধরনের মূল্যবান পণ্যদ্রব্য বিদেশী বণিকদের আকৃষ্ট করতে পারে নাই।

মুসলিম শাসনামলের পুরো সময়কাল জুড়ে বিদেশের সাথে বাংলাদেশের সম্পূর্ণরূপে অনুকূল বাণিজ্য বজায় ছিলো। বাংলাদেশকে বিদেশ থেকে কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানী করতে হতো না। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য কিংবা বিলাস সামগ্রী, সবই এ দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হতো। ফলে বাণিজ্যিক লেন-দেনে বাংলাদেশের পণ্যের দাম বিদেশীরা স্বর্ণ, মুক্তা ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতুর মাধ্যমে পরিশোধ করতো। বাংলাদেশে একমাত্র উল্লেখযোগ্য আমদানী পণ্য ছিলো চীনা মাটির বাসন ও আফ্রিকার ক্রীতদাস।[৪৫]

আলেকজাণ্ডার ডোউ মন্তব্য করেন যে, বৃটিশ শাসনের আগেকার বাংলাদেশ ছিলো এমন একটি পাত্র, যেখানে সোনা-রূপা এসে অদৃশ্য হয়ে যেতো। তা ফিরে পাওয়ার আর কোন উপায় থাকতো না।[৪৬] অথচ মুসলিম শাসন কায়েম হওয়ার আগে সেন-বর্মন আমলে এ দেশে স্বর্ণ এমনকি রৌপ্য মুদ্রাও বিরল ছিলো। পাল ও সেন যুগে ছোট বড় সব ধরনের লেনদেনে কড়ি একমাত্র বিনিময় মাধ্যম ছিলো। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, হিন্দু যুগে বাংলার অর্থনৈতিক জীবন খুবই অনগ্রসর ছিলো। মুসলিম শাসনকালে শুধু ছোট ছোট লেনদেনেই কড়ির ব্যবহার হতো। এ সময় ব্যবসা-বাণিজ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রারই প্রাধান্য ছিলো।

মিনহাজউদ্দীন সিরাজ তাঁর তাবাকাত-ই-নাসিরীতে লিখেছেন ঃ 'মুসলিম বিজেতারা বাংলায় প্রবেশ করে এখানে কোন রকম স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা দেখেননি। ক্রয়-বিক্রয়ে কড়ি ব্যবহার করা হতো।' ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেন যে, মুসলিম শাসনের শুরু থেকেই এ দেশে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিলো, যা বাংলায় অর্থনৈতিক উন্নতির সাক্ষ্য দেয়।[৪৭] হিন্দু শাসনামলে মাত্র ১২৮০ কড়ি ছিলো এক টাকার সমান। কিন্তু মুসলিম আমলে এক টাকা ছিল ৮০০০ কড়ির সমান।[৪৮]

মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপুল সমৃদ্ধি অর্জন করে। তার ফলে জীবনযাত্রা খুবই সহজ ছিলো। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে এ দেশের সাধারণ মানুষ

৪৫. বিশ্বভারতী এ্যানালস, ১৯৪৫, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯৪-১৩৬।
৪৬. আলেকজাণ্ডার ডোউ ঃ Indoostan, P-CXII; বার্নিয়ার, পৃঃ ৪৩৮-৩৯।
৪৭. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, পৃঃ ১৯৫-৯৮।
৪৮. আলেকজাণ্ডার ডোউ ঃ Indoostan, p-CXII; বার্নিয়ার পৃঃ ৪৩৮-৩৯।

www.nagorikpathagar.org

সুখ-শান্তিতে বাস করতে পেরেছে। সে যুগের কবি-সাহিত্যিকদের বিবরণীতে জনগণের অত্যন্ত স্বচ্ছল জীবন-যাপনের চিত্র পাওয়া যায়। তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, তখনকার একজন সাধারণ শ্রমিক এমনকি দাস-দাসীরাও ভালো খেতে ও স্বচ্ছল জীবন-যাপন করতে পারতেন। সে যুগে কৃষকরা স্বচ্ছল ছিলেন। ভূমিহীনের সংখ্যা ছিলো খুবই কম। ভূমিহীনরা কারিগরি, হস্তশিল্প বা কৃষিশ্রমের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাদের আয় ছিলো প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট। সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা সম্পর্কে বার্নিয়ার উল্লেখ করেন যে, ভাত ও ঘিয়ের সাথে তিন-চার রকম তরি-তরকারি সাধারণ লোকের প্রধান খাদ্য ছিলো। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশ সফরকারী সিবাস্তিয়ান মানরিক লিখেছেন ঃ 'বাজারে কিংবা শহরে খাদ্যদ্রব্য, নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, শিল্পজাত পণ্য, সূতীবস্ত্র ইত্যাদির সরবরাহ ছিলো বিপুল পরিমাণ। একটি বাজারের এ সকল জিনিসপত্রের যেকোন একটি দ্রব্য দিয়ে কয়েকটি জাহাজ বোঝাই করা যেতো।' মানরিক আরো লিখেছেন, বাংলাদেশের শহরগুলিতে খাদ্যদ্রব্যের দাম খুব কম ছিলো, তাই দিনে কয়েক বার তাঁর খাওয়ার লোভ জাগতো।[৪৯]

মুসলিম শাসন বাংলায় যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনে তার ফলে এদেশ সম্পর্কে পর্তুগীজ, ইংরেজ ও ওলন্দাজদের মধ্যে একটি প্রবাদ চালু হয়েছিলো যে, 'বাংলায় প্রবেশের শত দরোজা খোলা আছে, কিন্তু ফিরার জন্য একটি দরোজাও নেই।'[৫০]

১০. ইতিহাসের গঠনমূলক অধ্যায়

বাংলার মুসলিম শাসনামলের সামগ্রিক মূল্যায়ন এখানে উদ্দেশ্য নয়। সেন-বর্মন পর্বে বাংগালী জনজীবনে সকল দিক থেকে বন্ধাত্ব ও সামাজিক জীবনে বন্দিত্বের অভিশাপ সৃষ্টি হয়েছিলো। সে অবস্থা থেকে তাদেরকে মুক্ত করতে মুসলিম আমলের অবদান সম্পর্কে উপরের আলোচনা সামান্য ইশারা মাত্র। উপরের তথ্যাবলী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম রাজত্বকাল ছিলো বাংলার ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গঠনমূলক যুগ। বাংগালীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি এ যুগে একটি উন্নত ও সংহত রূপ লাভ করতে পেরেছিলো।

এ যুগে হিন্দু ও মুসলমান সকলেই শান্তি ও সম্প্রীতির মধ্যে জীবন-যাপন করেছে। তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বিদ্যমান ছিলো। মুসলমান শাসকগণ সুযোগ-সুবিধা সকলের জন্যই অবারিত করেছেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা বণ্টন, অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান কিংবা জনগণের সাংস্কৃতিক প্রতিভার মর্যাদা দানে তাঁরা উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। এই সমগ্র সময়কালে অনেক হিন্দুকে মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রীর পদে এবং অন্যান্য উচ্চ পদমর্যাদায় আসীন করা হয়েছে। কায়স্থরা এই আমলেই প্রশাসনিক ও

৪৯. হ্যাকলুয়েত সোসাইটি, ভল্যুম LXI, পৃঃ ১৩৫; ডকটর এম. এ. রহীম ঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পৃঃ ৪৫৭।

৫০. বার্নিয়ার, পৃঃ ৪৩৮-৪৩৯।

www.nagorikpathagar.org

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাবশালী একটি শ্রেণীতে পরিণত হয়ে সম্মান, সম্পদ ও প্রভাবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলো। মুসলিম শাসনকালে মুসলমানদের সাথে হিন্দুরা তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমান সুযোগ ও সুবিধাভোগ করে। তাদের স্বতন্ত্র ধর্ম বিশ্বাসের কারণে তাদের প্রতি কোনরূপ উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়নি। এটি ছিলো বাংলার শাসনব্যবস্থায় মুসলমানদের এক নবসৃষ্ট ঐতিহ্য। এ প্রসঙ্গে ডকটর এম. এ. রহীম লিখেছেন ঃ '... হিন্দুরা মুসলমান শাসনাধীনে বিজিত জাতি হিসেবে তাদের প্রত্যাশা অপেক্ষা অধিক মর্যাদা ভোগ করতে পেরেছিল। বাংলাদেশে মুসলিম শাসন একমাত্র বিরল দৃষ্টান্ত, যেখানে শাসকগণ রাষ্ট্রের দায়িত্বপূর্ণ কার্য বিজিত লোকদের উপর ন্যস্ত করেছেন। রাজ সরকারে উজীর, সুলতানের ব্যক্তিগত সহকারী; সৈনাধ্যক্ষ ও অন্যান্য বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে হিন্দুরা অধিষ্ঠিত হয়। তুলনামূলক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এই প্রদেশে বা এই উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনাধীনে হিন্দুদের খুব সুসময়েও তারা এ ধরনের দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভ করতে সমর্থ হয় নাই।'[৫১]

মুসলিম শাসনামলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এই পর্বে বাংলাদেশ অধিকাংশ সময়ই পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেছে। ১২০৩ সনে ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী থেকে শুরু করে ১৩৩৮ সনে স্বাধীন সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত এই একশ পঁয়ত্রিশ বছর দিল্লীর অধীনতা ছিলো নামেমাত্র। এই আমলের শাসকগণ আনুগত্যের ঘোষণা প্রদান ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেছেন। ১৬১০ সালে বাংলায় মুগলদের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৭২৭ সালে মুর্শিদকুলী খাঁর স্বাধীন নবাবী আমল শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই সময়টি দিল্লীর কর্তৃত্বের যুগ। এ কালপর্বেও জনজীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধি অটুট ছিলো। ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক কায়কারবারে বাংলার সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো। ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ সন পর্যন্ত বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমল ছিলো সকল দিক দিয়ে বাংলার জনগণের জন্য সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় পর্ব।

এ যুগ সম্পর্কে শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ 'আলোচ্য পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এই পর্বে বাংলাদেশ একটানা দু'শো বছর ধরে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ভোগ করেছে। এই সুদীর্ঘ কাল ধরে বাংলাদেশের সম্পদ বাংলার ভিতরেই ছিল–বাইরে যায়নি। তাছাড়া এই পর্বের অধিকাংশ সময় বাংগালীরাই বাংলাদেশ শাসন করেছেন বলা যায়।'[৫২]

স্বাধীন সুলতানী আমল সম্পর্কে সুখময় মুখোপাধ্যায় আরো মন্তব্য করেন ঃ 'বাংলাদেশে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ পর্যায়ক্রমে একবার দিল্লীর অধীন হয়েছে, আবার স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু ১৩৩৮ খ্রীস্টাব্দে ফখরুদ্দীন

৫১. ডকটর এম. এ. রহীম ঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পৃঃ ৪৭৫।

৫২. শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর– স্বাধীন সুলতানদের আমল, গ্রন্থকারের নিবেদন, প্রথম সংস্করণ।

www.nagorikpathagar.org

মুবারক শাহের স্বাধীনতা ঘোষণা থেকে শুরু করে ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহের উচ্ছেদ পর্যন্ত পুরোপুরি দু'শো বছর বাংলাদেশ যে রকম অবিচ্ছিন্নভাবে স্বাধীনতা ভোগ করেছিল, তত দীর্ঘকাল ধরে আর কোন সময় তার স্বাধীনতা স্থায়ী হয়নি। এই দুশো বছর বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়। এই সময়ে বাংলার সুলতানরা নিজেদের যোগ্যতা শক্তি ও ঐশ্বর্যের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের অন্যতম হয়ে উঠেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা দেশের অভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনায় এবং রাজার নানা রকম কর্তব্য পালনেও অপরিসীম দক্ষতা দেখিয়ে গিয়েছেন। তার ফলে তাঁরা বাংলার জনসাধারণের এমনকি বিধর্মী হিন্দুদেরও আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন।'[৫৩]

৫৩. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর- স্বাধীন সুলতানদের আমল, প্রথম অধ্যায়, অবতরণিকা (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

www.nagorikpathagar.org

দশম অধ্যায়

মুসলিম শাসন ঃ পতনের কার্যকারণ

১. ছয়টি কারণ

সাড়ে পাঁচশ বছর মুসলিম শাসনের পর বাংলাদেশ ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রদানত হয়। প্রায় দু'শ বছরের জন্য এদেশের মানুষ বিজাতীয় ঔপনিবেশিক শাসনের শৃংখলে বন্দী হয়ে পড়ে। তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক জীবনে সীমাহীন দুর্ভোগ ও বিপর্যয় নেমে আসে। মুসলমানদের পতন, তাদের সমাজ ও সভ্যতার বিপর্যয় এবং এ দেশে ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা কোন আকস্মিক ঘটনা ছিলো না। দীর্ঘকাল ধরে এই পতনের পটভূমি রচিত হয়ে আসছিলো। বাংলার মুসলিম শাসন অবসানের সে বিস্তীর্ণ পটভূমি উপলব্ধির জন্য কয়েকটি প্রধান বিষয়ের দিকে নযর ফিরানো দরকার। সেগুলি হলো ঃ

এক. পনেরো শতকের শুরুতে মুসলিম রাজ-দরবারের ব্রাহ্মণ অমাত্য গনেশের রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার পটভূমিতে বর্ণহিন্দুদের সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি এবং শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব;

দুই. পনেরো শতকের শেষ ভাগে মুসলমানদের ধ্বংস ও বিপর্যয়ের প্রতীকরূপে আকবরের আবির্ভাব, বাংলায় তাঁর ইসলামবিরোধী অভিযানের প্রভাব;

তিন. আওরঙ্গযীব আলমগীরের উত্তরাধিকারী মুগল শাসকদের অযোগ্যতা ও আত্মকলহ এবং মুসলিম সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণীর নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবক্ষয়;

চার. নবাবী আমলে (১৭২৭-৫৭) বাংলার বর্ণহিন্দুদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে একটি নব্য হিন্দু অভিজাতশ্রেণীর উত্থান এবং তাদের ওপর নবাবদের নির্ভরশীলতার সুযোগে প্রশাসনিক কৌশলগত অবস্থানগুলিতে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা;

পাঁচ. ইংরেজদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি এবং ব্যবসায়িক কারণে হিন্দু অভিজাতদের সাথে ইংরেজদের সংযোগ ও ষড়যন্ত্রমূলক মৈত্রীজোট গঠন; এবং

ছয়. রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার কারণে জনগণের প্রতিরোধ শক্তির অভাব ও বুদ্ধিবৃত্তিক বন্ধ্যাত্ব এবং ইংরেজদের সামরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব।

www.nagorikpathagar.org

২. বর্ণহিন্দুদের সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি ও শ্রীচৈতন্য

স্বাধীন সুলতানী আমলের শেষের দিকে মুসলিম জন-জীবনে ইসলামী আদর্শ, ভাবধারা ও সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত রাখার ব্যাপারে শাসকদের মধ্যে সচেতনতার অভাব বৃদ্ধি পেয়েছিলো। রাষ্ট্র গঠন তথা রাষ্ট্রের বস্তুগত উন্নয়ন ও ভৌগোলিক প্রভাবসীমা বিস্তারে তখনকার শাসকরা যথেষ্ট সফল হয়েছিলেন। কিন্তু জনগণের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের যোগ্যতা তাঁরা হারিয়ে ফেলেছিলেন। পনেরো শতকের শুরুতে গনেশের নেতৃত্বে রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার পর বর্ণহিন্দুরা সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থানের পথ বেছে নিয়েছিলেন। সে ব্যাপারে শাসকগণ সজাগ ছিলেন না। ফলে গনেশের ব্যর্থ রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের একশ বছরের মধ্যে (মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট হয়ে) বর্ণহিন্দুদের সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছিলো।

স্বাধীন সুলতানী আমলে বাংলার শাসকগণ দিল্লীর কেন্দ্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন। পাল ও সেন আমলে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়কারী 'উচ্চ শ্রেণীর' হিন্দুরা এ সময় মুসলমান সুলতানদের দরবারে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভ করেন। এভাবেই তাঁরা শাসন ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে সাহসী হয়ে ওঠেন। তাঁদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় জাগরণের প্রয়াসও এ সময় থেকে শুরু হয়। গনেশের চার বছরের শাসনামলে হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকালে সারা বাংলায় মৃতপ্রায় সংস্কৃত ভাষার চর্চা পুনরায় শুরু হয়েছিলো। গনেশের রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার পর বর্ণহিন্দুদের সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি জোরদার হয়। এক শ্রেণীর মুসলিম সুলতান ও আমীর-ওমরাহর অসচেতনতা ও জনগণের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার সুযোগ নিয়ে তারা এ পথে খুবই সাফল্যের সাথে অগ্রসর হয়।

বিদ্যোতসাহী মুসলিম সুলতানগণ হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থাদি বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারে হিন্দু কবিদেরকে বিপুল উৎসাহ প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য, রামায়ন, মহাভারত প্রভৃতি হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থাবলী মুসলিম শাসকদের সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত থেকে ভাষান্তর ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়। সমসাময়িক দুনিয়ার সবচে সমৃদ্ধ ভাষারূপে পরিগণিত আরবীতে তখন তাফসীর, হাদীস, উসুল, তর্কশাস্ত্র, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, রাজনীতি, কাব্য, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিপুল গ্রন্থরাজী মওজুদ ছিলো। মুসলমানদের সুষ্ঠু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠনের একান্ত উপযোগী এ বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার জনগণের সামনে তুলে ধরার কোন ব্যবস্থাই এ সময় করা হয়নি। ফলে সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় জনগণের মুখের ভাষা বাংলা ভাষা যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করলেও তাদের তৈরী বাংলা সাহিত্য এমন একটি রূপ লাভ করলো, যেখানে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মৃত্যু অবধারিত ছিলো। সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট মঙ্গলকাব্যের প্লাবনে সাধারণ মুসলিম সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাসগুলি ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয়। রাষ্ট্র গঠনের পাশাপাশি জাতি গঠনের কাজে সম্যক

www.nagorikpathagar.org

সচেতনতার অভাবে এবং সাংস্কৃতিক অসচেতনতার কারণে স্বাধীন সুলতানী আমলের শেষভাগে মুসলিম সংস্কৃতির মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠেছিলো।[১]

হিন্দুদের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের এ পটভূমিতেই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে। ১৫০৬ সাল থেকে তিনি নদীয়ায় 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত' প্রচার শুরু করেন। হিন্দু সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরম ধর্মীয় বিদ্বেষ সৃষ্টি। তারা হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের অত্যাচারের নানা কাহিনী রটনা করতো। মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদেরকে এভাবে ক্ষেপিয়ে তোলার মাধ্যমে চৈতন্যের সংস্কার আন্দোলনের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র পূর্ব থেকেই তৈরী করে রাখা হয়েছিলো। সে প্রেক্ষাপটেই ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার শ্রীচৈতন্যের কার্যক্রমকে মুসলমানদের তিন'শ বছরের 'হিন্দু মন্দির ধ্বংসের বিরুদ্ধে' দুঃসাহসিক প্রতিশোধগ্রহণ বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ 'তিনশত বছরের মধ্যে বাংগালী ধর্ম রক্ষার্থে মুসলমানদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় নাই– মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংসের অসংখ্য লাঞ্ছনা ও অকথ্য অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছে। চৈতন্যের নেতৃত্বে অসম্ভব সম্ভব হইল।'[২]

চৈতন্যদেব তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য নিজেই প্রকাশ করেছেন এভাবে ঃ

'পাষণ্ডী সংহারিতে মোর, এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারী ভক্তি করিমু প্রচার।।'[৩]

এই 'পাষণ্ডী' বলতে তিনি মুসলমানদেরকেই বুঝিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ লিখেছেন ঃ '... চৈতন্যের সময় মুছলমান সমাজ ব্যতীত বেদ অমান্যকারী ও অহিন্দু অন্য কোন সমাজ দেশে ছিল না। সুতরাং যুক্তির হিসাবে স্বীকার করিতে হইবে যে, মোছলেম জাতির সংহার সাধনের জন্যই তিনি অবতার হিসাবে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ... চৈতন্যের নিজের উক্তি হইতেও জানা যাইতেছে যে, সমসাময়িক মুছলমান সমাজ সম্বন্ধে তিনি চিরদনিই বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। মুছলমান সম্বন্ধে তাঁহার ও অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মুখে যবন ও ম্লেচ্ছ বিশেষণ সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যাইত। ... কলিকালের যবন, অর্থাৎ মুছলমান সমাজ যে মহা দুরাচার, ইহা চৈতন্যের উক্তি। ... প্রকৃত কথা এই যে, বৌদ্ধ সমাজ ও বৌদ্ধ ধর্ম্মকে তাহাদের মাতৃভূমি হইতে সমূলে উৎখাত করার পর তাঁহাদের নেক নজর পড়িয়াছিল মুছলমান সমাজের উপর। তাই যুগপৎভাবে তাহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন "যবন রাজদিগকে" রাজনৈতিক কৌটিল্যের মাধ্যমে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিতে। পক্ষান্তরে ধর্ম্মের নামে একটা মোহজাল বিস্তার করিয়া মুছলমান সমাজকে আত্মবিস্মৃত ও সম্মোহিত করিয়া রাখিতে। ... ইহাই ছিল তৎকালের অবতার ও তাঁহার ভক্ত ও

১. এ ব্যাপারে মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
২. ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ পৃঃ ২৬১।
৩. চৈতন্য চরিতামৃত, আদি লীলা, পৃঃ ১২০।

www.nagorikpathagar.org

সহকারীদের চরম ও পরম উদ্দেশ্য।'[৪]

চৈতন্যদেব মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে হিংসার বাণী প্রচার করেন তা তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে ধর্মীয় উন্মত্ততার জন্ম দেয়। বাংলায় সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতির সূচনা হয় সম্ভবত এখান থেকেই।

চৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলার হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় জাগরণ সৃষ্টি হয়। তাদের সাহিত্য ক্ষেত্রেও এ সময় যুগান্তকারী বিপ্লবের সূচনা হয়েছিলো। অসংখ্য হিন্দু লেখক চৈতন্যের জীবন ও দর্শন নিয়ে সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হন। বৈষ্ণব চিন্তা ও ভাবধারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমগ্র অঙ্গনকে প্লাবিত করে। এই হিন্দু নব-জাগরণের মুখে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে একটা হীনমন্যতাবোধের জন্ম হয়েছিলো। এই হীনমন্যতাবোধের কারণেই বৈষ্ণব কবি-সাহিত্যিকদের বিরাট মিছিলে একশ্রেণীর মুসলমান কবিও গা ভাসিয়েছিলেন। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের ভাষায় এরা 'বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি' নামে আখ্যায়িত হন।

শুধু সাধারণ মুসলমান কিংবা এক শ্রেণীর কবি-সাহিত্যিক নয়, সমসাময়িক মুসলিম শাসক হোসেন শাহও হিন্দু জাগরণের মুখে প্রথম দিকে হীনমন্যতার মাঝে সমর্পিত হয়েছিলেন। মুসলিম সমাজে সে সময় সত্য পীরের পূজার নামে কিছু কিছু হিন্দু ধর্মীয় আচার-আচরণের অনুপ্রবেশ ঘটানোর ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিলো। কিন্তু মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর ভাষায় ঃ 'সেই চরম দুর্যোগের দিনেও হয়তো ২/৪ জন মর্দ্দে মোমেন মুছলমান বাঁছিয়াছিলেন, যাঁহারা মুক্ত কণ্ঠে এই অনাচারের প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।... বরং ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, আলোচ্য সময় চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া বাংলার মুছলমানকে বিভ্রান্ত করার জন্য–সম্ভবতঃ ছোলতান হোছেনের সহায়তায়–এতদিন যে সব ষড়যন্ত্র পূর্ণ উদ্যমে চলিয়া আসিতেছিল, তাহার বিরুদ্ধে মোছলেম বঙ্গের অন্তরদেশে একটা প্রচণ্ড রকমের প্রতিক্রিয়ার সূচনা হইয়া যায় এই সময় হইতে।'[৫]

এই প্রতিক্রিয়া চলাকালেই হোসেন শাহ-এর রাজ্যের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত সনাতন গোঁসাইয়ের গোপন ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে পড়ে। চৈতন্য-ভক্ত হোসেন শাহ ভক্তির আতিশয্যে চৈতন্যের দুই শাগরেদ–রূপ গোঁসাই ও সনাতন গোঁসাইকে তাঁর রাজ্যের শাসন পরিচালনার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা হোসেন শাহ-এর সর্বনাশ করার গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে এবং দেশে চরম অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। দেরীতে হলেও সুলতানের কাছে তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায়। ফলে তিনি দৃঢ়তার সাথে এদের অপকর্মের তদন্ত শুরু করেন। এ সময় রূপ গোঁসাই তার ছোট ভাই সনাতন গোসাঁইয়ের পলায়নের বন্দোবস্ত হওয়ার আগেই রাজভাণ্ডারের বহু ধন-দৌলত চুরি করে চৈতন্য-প্রভুর সাথে দেশত্যাগ করেন। এদিকে সনাতন গোঁসাই নিজের ধন-

৪. মোহাম্মদ আকরম খাঁ ঃ মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পৃঃ ১০০-১০২।
৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৪।

www.nagorikpathagar.org

দৌলত পাচার করার ব্যবস্থায় ব্যস্ত থাকেন। তাকে বন্দী করে কারাগারে পাঠানো হয়। সনাতন গোঁসাই কারারক্ষীকে নগদ সাত হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে বৃন্দাবনে গিয়ে প্রভু শ্রীচেতন্যদেবের সাথে মিলিত হন। এই রূপ-সনাতনের কাহিনীর আভাস চৈতন্য চরিতামৃতেও পাওয়া যায়।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ লিখেছেন ঃ 'ছোলতান হোছেনের প্রাথমিক দোষ দুর্বলতার সুযোগ লইয়া, গৌড় রাজ্যের সাধু-সন্ন্যাসীরূপী বৈষ্ণব জনতা বাংলাদেশ হইতে ইছলাম ধর্ম্ম ও মোছলেম শাসনকে সমূলে উৎখাত করিয়া ফেলিবার জন্য যে গভীর ও ব্যাপক ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ছোলতানের ও স্থানীয় মোছলেম নেতাদের যথাসময়ে সতর্ক হওয়ার ফলে তাহার অবসান ঘটিয়া যায়।... যাহা হউক, চৈতন্যদেব এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিফল মনোরথ হইয়াই বিদেশযাত্রা করিয়াছিলেন এবং তাহার পরে এমন আশ্চর্যরূপে উধাও হইয়া গিয়াছিলেন যে, ভক্তরাও তাঁহার শেষ জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে কোন সংবাদই দিতে পারেন নাই। কেহ বলিতেছেন অন্তর্ধান, কেহ বলিতেছেন সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মৃত্যুবরণ, ইত্যাদি!'৬

চৈতন্যদেবের বিশেষত্ব হলো, তাঁর আন্দোলন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলো। চৈতন্যদেব নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মাঝে ইসলামের বিপুল প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি তাদের ব্যাপক ধর্মান্তর প্রতিহত করে তাদেরকে হিন্দু ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের প্রচারক চৈতন্যের এ কৌশল সম্পর্কে আবদুল মান্নান তালিব লিখেছেন ঃ 'যুগ ধর্মের তাগিদে তিনি সংকীর্তন ও নগর কীর্তনের প্রচলন করেন। বৈষ্ণবেরা সংকীর্তনের ভাবাবেগে আপ্লুত হলে ঢাক-ঢোল, খোল-করতাল ও মৃদঙ্গ বাজিয়ে এবং পতাকা উড়িয়ে নগর কীর্তনে বের হতো এবং আনন্দে উদ্বেল হয়ে নৃত্যগীত করতে করতে শোভাযাত্রা সহকারে এমনভাবে রাজপথসমূহ প্রদক্ষিণ করতো যে, সারা শহর মুখরিত হয়ে উঠতো। এভাবে তারা সারা শহরবাসীকে কীর্তনের প্রভাবাধীনে আনার চেষ্টা করতো। ... রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলাই হচ্ছে তাদের ঈশ্বরপ্রেমের প্রতীক।... চৈতন্য দেব স্বকীয়া প্রেমের তুলনায় পরকীয়া প্রেমকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ এর ঝাঁঝ অনেক বেশী। বৃন্দাবনের গোপীগণের কিশোর কৃষ্ণের সাথে রাধার লাস্য ও মাধুর্যপূর্ণ লীলাকে কেন্দ্র করে ভগবত ভক্তি ও ঈশ্বর-প্রেমের বিকাশ–এ ছিল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য। এ প্রেমের উচ্ছ্বাসে শ্রীচৈতন্য কখনো কখনো উন্মাদ ও সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়তেন এবং প্রেমরস আস্বাদনের প্রকৃষ্ট উপায়স্বরূপ তিনি হরিনাম সংকীর্তনের প্রচলন করেন।'৭

৬. মোহাম্মদ আকরম খাঁ ঃ মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পৃঃ ১১০।
৭. আবদুল মান্নান তালিব ঃ বাংলাদেশে ইসলাম, পৃঃ ২২৭-২২৯।

www.nagorikpathagar.org

চৈতন্যদেব প্রেম ও ভক্তির ধর্ম প্রচারের নামে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষের বিষ-বাষ্প ছড়িয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আব্দুল মান্নান তালিব কৃষ্ণদাস কবিরাজের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করে লিখেছেন ঃ 'চৈতন্য-পরবর্তীকালে লিখিত বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে ইসলামের বিরুদ্ধে এ ধরনের আরো বহু বিদ্বেষমূলক উক্তি ও আলোচনা দেখা যাবে। চৈতন্যের জীবদ্দশায় তিনি নিজেই ছিলেন এর উদগাতা। সমসাময়িক মুসলমান সমাজ ও ইসলাম সম্পর্কে তিনি চিরদিনই বিদ্বেষভাব পোষণ করে এসেছেন।... শ্রীচৈতন্যের হিংসানীতির বৃহত্তর শিকার হয়েছেন নবদ্বীপের কাজী এবং এতে শ্রীচৈতন্য নিজে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সম্ভবত উপমহাদেশের ইতিহাসে সাম্প্রদায়িক দাংগার সূচনা এখান থেকেই হয়।'[৮]

শ্রীচৈতন্যের ধর্মাদর্শে সঞ্চারিত আদি রস সম্পর্কে ডকটর রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে, গীতগোবিন্দের দ্বাদশ সর্গে রাধা-কৃষ্ণের কামকেলীর যে বর্ণনা আছে, বর্তমানকালের কোন গ্রন্থে তা থাকলে উক্ত গ্রন্থকার দুর্নীতির দায়ে আদালতে দন্ডিত হতেন। আর চন্ডিদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সম্বন্ধে বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ ডকটর বিমলবিহারী মজুমদার লিখেছেন যে, আদি রসের ছড়াছড়ি থাকায় কাব্যটি প্রায় পর্নোগ্রাফির পর্যায়ে পড়েছে। শ্রীচৈতন্য পুরাতন বৈষ্ণব ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা চালান। এর ফলে বাংলাদেশের ধর্ম-রাজ্যে বীভৎসতার সৃষ্টি হয়। হিন্দুর সাথে সাথে মুসলমানেরও তার ফলে যথেষ্ট সর্বনাশ হয়েছিলো। এ সম্পর্কে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও আবদুল মান্নান তালিব বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হিংসা ও সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি এবং রজকিনী প্রেমের আদিরস সঞ্চার করে শ্রীচৈতন্য নিম্নবর্ণ হিন্দুদের একটি বড় অংশকে ইসলামের প্রভাবসীমা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। সে দিক থেকে শ্রীচৈতন্য তাঁর লক্ষ্যে সফল হয়েছিলেন বলা যায়। অন্য কোনভাবে হয়তো সাধারণ অবর্ণ হিন্দু জনতার ইসলাম গ্রহণের জোয়ার রোধ করা যেতো না। এ প্রসঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মন্তব্য করেছেন ঃ 'শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব না হলে জাতিভেদের জন্যই কিছু উঁচু বর্ণের হিন্দু ব্যতীত সকলেই মুসলমান হয়ে যেতো।'[৯]

৩. অধঃপতন ও ধ্বংসের প্রতীকরূপে আকবর

আকবরের শাসনকালে বাংলায় মুগল শাসনের সূচনা হওয়ার কারণে তাঁর বিভ্রান্ত চিন্তাও বাংলায় পৌঁছেছিলো। এ ছাড়া বিভিন্ন অন্ধ বিশ্বাস ও নানা কুসংস্কার ধর্মের ছদ্মাবরণে মুসলমানদের জাতীয় জীবনে তখন ডাল-পালা বিস্তার করেছিলো।

আকবর ছিলেন তীক্ষ্ণ ধী-শক্তির অধিকারী; কিন্তু তাঁর জ্ঞান-ভাণ্ডার ছিলো শূন্য। অপরিমেয় মুর্খতা ও বিপুল ক্ষমতার দুই বিপরীতমুখী অবস্থা আকবরের জন্য চরম

৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩০।
৯. কাজী আমিনুল ইসলাম (উদ্ধৃত) ঃ বাংলার রূপরেখা (কলিকাতা), পৃঃ ২৭।

www.nagorikpathagar.org

গোমরাহির কারণ হয়েছিলো। একদিকে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ বিরাট হিন্দু সম্প্রদায়ের বাদশাহ, অন্যদিকে মুসলমানদের সামরিক মেরুদণ্ড বলে স্বীকৃত তুর্কী ও পাঠানরা ছিলো তাঁর ঘোরবিরোধী। এ অবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের মনোরঞ্জন করতে তিনি দীন-ই-ইলাহী নামে তথাকথিত এক নতুন ধর্মমতের প্রচার শুরু করেন। তাঁর এই নতুন ধর্মে ইসলাম ছাড়া বাকী সব ধর্মের অনুষ্ঠানগুলিই নির্বিচারে গ্রহণ করা হয়।

সম্রাট নিজে কপালে চন্দন তিলক আঁকলেন। গলায় পরলেন রুদ্রাক্ষের মালা। সকাল-সাঁঝে শুরু হলো সূর্য-বন্দনা। হিন্দুরা মূর্তিপূজার অবাধ অধিকার লাভ করলো। মুসলমানরা তাদের অনেক ধর্মীয় সুযোগ ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হলো। বাদশাহের হারেমে নিয়মিত অগ্নিপূজা ও মূর্তিপূজা চালু হলো। বাদশাহ নিজে হিন্দু ললনাকে বিয়ে করলেন। দরবারে হিন্দুরা বাদশাহকে ভগবানের আসনে বসালো। 'দিল্লীশ্বরো-জগদিশ্বরো' বলে পরম উৎসাহে তারা ধ্বনি দিতে থাকলো। আগে সরকারী মুদ্রায় কালেমা উৎকীর্ণ করার রেওয়াজ ছিলো। আকবর তার স্থলে 'আল্লাহু আকবর—জাল্লা জালালাহু' এমনভাবে প্রতিস্থাপন করলেন, যাতে 'জালালুদ্দীন আকবর' বলেই মনে হতে পারে।[১০] ভারতবর্ষে ইসলামের এ দুর্দিনে ইসলাম-বিদ্বেষী 'মুলহিদ' সম্প্রদায়ের লোকেরা ইরান থেকে বিতাড়িত হয়ে এসে ভারতে আশ্রয় লাভ করে এবং ধর্মীয় ব্যাপারে আকবরের গোপন উপদেষ্টারূপে ভূমিকা পালন করে।[১১]

আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে সালাম দেয়ার রীতি রহিত করা হয়। তার পরিবর্তে নতজানু হয়ে বাদশাহকে সিজদা করতে মুসলমানদেরকে বাধ্য করা হয়। এ সময় দাড়ি রাখা, আজান দেয়া ও গরু জবাই করা নিষিদ্ধ ছিলো। মুসলমানদেরকে বহু অইসলামী আইন ও ফরমান মেনে চলতে বাধ্য করা হয়। বহু মসজিদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; কিংবা সেগুলি মন্দির ও নাট্যশালায় পরিণত হয়। জাহাঙ্গীরের আমলের বিজাপুরের মসজিদগুলি সম্পর্কে ঐতিহাসিক ফিরিশিতা জানাচ্ছেন ঃ হিন্দুরা মসজিদে প্রবেশ করে সেখানে মূর্তি পূজা করতো এবং বাদ্যযন্ত্র সহকারে দেবদেবীর বন্দনা-গীত গাইতো। সে সময়কার আলিমদের একটা বড় অংশ ছিলেন আপোষকামী ও নতজানু। আকবরের ঘনিষ্ঠ ও একনিষ্ঠ হিন্দু সহচর মানসিংহ ও টোডরমল দীন-ই-ইলাহী ধর্ম গ্রহণে সম্মত হননি। অথচ শায়খ আবদুন নবী ও মওলানা মখদুমুল মুলক-এর মতো ধর্মীয় নেতাগণসহ দরবারের অধিকাংশ মুসলমান সভাসদ নবধর্ম-প্রবর্তকরূপে আকবরের বায়াত-নামায় দস্তখত করেন।

আকবরের বিভ্রান্ত ধর্মমত ও তার পটভূমি সম্পর্কে সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ 'হিজরী ষণ্ডম শতকে তাতারী ফিতনা হিন্দুকুশ পর্বতের ওদিকের সমগ্র ভূখণ্ডকে নেস্তনাবুদ করে দেয়, কিন্তু হিন্দুস্তান তার

১০. শামসউদ্দীন আহমদ ঃ সিগনিফিক্যান্স অব দি লিজেন্ডস অন মুসলিম কয়েনস (প্রবন্ধ), ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ফেলিসিটেশান ভল্যুম, সম্পাদনা ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃঃ ১৪-১৫।

১১. মোহাম্মদ আকরম খাঁ ঃ মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পৃঃ ১৩১-১৩২।

www.nagorikpathagar.org

অশুভ ছোবল থেকে রেহাই পায়। ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কারণে এখানকার সুধী ও নেতৃসমাজের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। দুনিয়ার বাহ্যিক চাকচিক্যে মুগ্ধ ব্যক্তিরা হামেশাই এই ভ্রান্ত ধারণার সম্মুখীন হয়েছে। খোরাসান ও ইরাকের যাবতীয় দুষ্কৃতি এখানে লালিত হতে থাকে। এখানেও চলে বাদশাহের খোদায়ী কর্তৃত্ব। আমির-ওমরাহ ও বিত্তশালীদের বিলাসিতা, অন্যায়ভাবে অর্থোপার্জন ও অন্যায় পথে ব্যয় এবং জুলুম নির্যাতনের রাজত্ব অবাধে চলতে থাকে। খোদা সম্পর্কে গাফলতি ও দীনের সহজ সরল পথ থেকে দূরে অবস্থান করার নীতি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ধীরে ধীরে বাদশাহ আকবরের শাসনামলে পৌঁছে গোমরাহি তার শেষ সীমান্তে উপনীত হয়।

'আকবরের দরবারে এ ধারণা অত্যন্ত প্রবল ও ব্যাপক ছিল যে, ইসলাম মুর্খ ও অশিক্ষিত বুদ্ধুদের মাঝে জন্মলাভ করেছিল, তা কোন সুসভ্য ও সংস্কৃতিবান জাতির উপযোগী নয়। নবুয়্যাত, ওহি, হাশর-নশর, বেহেশত ও দোজখ প্রভৃতি ইসলামের মূল আকিদা-বিশ্বাসসমূহ বিদ্রুপের বস্তুতে পরিণত হয়। কোরআনের খোদার কালাম হবার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা হয়। ওহির অবতরণ বুদ্ধিবিরোধী গণ্য হয়। মৃত্যুর পর শাস্তি ও পুরস্কার অনিশ্চিত বলে বিবেচিত হয়। তবে জন্মান্তরবাদ সকল দিক দিয়েই সম্ভবপর ও সত্য বলে গৃহীত হয়। নবীর মিরাজকে প্রকাশ্যে অসম্ভব গণ্য করা হয়। নবী করীমের (স.) ব্যক্তিত্বের সমালোচনা করা হয়। বিশেষ করে তাঁর সহধর্মিনীদের সংখ্যা ও তাঁর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত জেহাদসমূহের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আপত্তি করা হয়। এমনকি 'আহমদ' ও 'মুহাম্মদ' শব্দও বিরক্তিকর ঠেকে এবং যাদের নামের সাথে এ শব্দদ্বয় যুক্ত ছিল, তাদের নাম পরিবর্তন করা হয়। স্বার্থবাদী আলেমগণ নিজেদের বইপত্রের ভূমিকায় না'ত লেখা বন্ধ করে। অনেক জালেম গোস্তাখীর চরম সীমানায় উপনীত হয়ে দাজ্জালের চিহ্নসমূহ মহান নেতা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে আবিষ্কার করে...। শাহী দেওয়ান খানায় নামাজ পড়ার মতো বুকের পাটা কারুর ছিল না। আবুল ফযল নামাজ, রোজা, হজ্জ ও অন্যান্য ইসলামী ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে কঠোর আপত্তি উথাপন করেন এবং এগুলিকে পরিহাস করেন। কবিকুল এ সব ঐতিহ্যের নিন্দাবাদে কাব্য রচনা করে। এ সব কাব্য-কবিতা সাধারণ মানুষের কাছেও পৌঁছায়।

'বাহাই মতবাদের ভিত্তিও আসলে আকবরের জামানায় স্থাপিত হয়। এ সময়েই এ মত পেশ করা হয় যে, মুহাম্মদ (স.) এর পর এক হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং এ দীনের মেয়াদও ছিল এক হাজার বছর। তাই বর্তমানে এ দ্বীন বাতিল হয়ে গেছে এবং এর স্থলে এখন নতুন দ্বীনের প্রয়োজন। মুদ্রার মাধ্যমে এ মতবাদের প্রচার শুরু হয়। কেননা, সে যুগে এটিই ছিল প্রচারণার সবচাইতে শক্তিশালী মাধ্যম। অতঃপর একটি নয়া দ্বীন ও একটি নয়া শরীয়তের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মকে মিলিয়ে একটি মিশ্রিত নতুন ধর্ম তৈরী করা, যাতে করে সরকারের শাসন শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। দরবারের তোষামোদকারী হিন্দুরা নিজেদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে ভবিষ্যৎবাণী শুনাতে থাকে যে, অমুক যুগে

www.nagorikpathagar.org

একজন গোরক্ষক মহাত্মা বাদশাহ জন্মলাভ করবেন। অনুরূপভাবে অর্থপূজারী আলেমগণও আকবরকে মেহদী, যুগস্রষ্টা, মুজতাহিদ, ইমাম প্রভৃতি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। জনৈক 'তাজুল আরেফিন' সাহেব এতদূর অগ্রসর হন যে, তিনি আকবরকে আদর্শ মানব ও যুগনেতা হবার কারণে তাঁকে খোদার প্রতিবিম্ব বলে প্রচার করেন। সাধারণ মানুষকে বুঝাবার জন্য বলা হয় যে, সত্য ও সততা (বিশ্বজনীন সত্য) দুনিয়ার সকল ধর্মের মধ্যেই আছে। কোনো একটি মাত্র ধর্ম সত্যের ইজারাদার নয়। কাজেই সকল ধর্মে যে সব সত্য আছে সেগুলির সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি প্রণয়ন করা উচিত। জনগণকে ব্যাপকভাবে সেদিকে আহবান করতে হবে, যাতে করে সকল ধর্মের মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটে। এই পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতির নাম 'দ্বীনে ইলাহী'। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আকবর খলিফাতুল্লাহ' এই নতুন ধর্মের কলেমা নির্ধারিত হয়। যারা নতুন ধর্মে প্রবেশ করতো তাদেরকে তাদের পিতা-প্রপিতাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত দ্বীন ইসলাম থেকে তওবা করে 'দ্বীনে ইলাহী আকবর শাহী'-এর মধ্যে প্রবেশ করতে হতো। আর দ্বীনে ইলাহীতে প্রবেশ করার পর তাদেরকে 'চেলা' আখ্যা দেয়া হতো। সালামের পদ্ধতি পরিবর্তন করে নিয়ম করা হয় যে, সালামকারী আল্লাহু আকবর ও জবাবদাতা 'জাল্লেজালালুহু' বলবে। (বাদশাহর নাম জালালুদ্দিন ও আকবর তার উপাধি)। চেলাদেরকে বাদশাহর চিত্র দেয়া হতো, তারা সেটি পাগড়ির গায়ে লাগিয়ে রাখতো। রাজপূজা এ ধর্মের একটি অংশ ছিল। প্রত্যেক দিন সকালে বাদশাহর দর্শন লাভ করা হতো। বাদশাহকে দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করার পর তাঁকে সিজদা করা হতো। আলেম ও সুফিগণ তাঁদের কামনা-বাসনা পূরণের এই কেবলা ও কাবাকে বেধড়ক সিজদা করতো এবং এই সুস্পষ্ট শের্ককে 'সম্মানের সিজদা' ও 'মৃত্তিকা চুম্বন'-এর ন্যায় শব্দের আবরণে ঢেকে রাখতো।

'এই নতুন ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করার সময় বলা হয়েছিলো যে, পক্ষপাতহীনভাবে সকল ধর্মের ভালো কথাগুলি এতে গ্রহণ করা হবে, কিন্তু আসলে ইসলাম ছাড়া প্রত্যেক ধর্মের এতে স্থান হয় এবং একমাত্র ইসলাম ও ইসলামী আইন-কানুনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হয়। অগ্নি উপাসকদের নিকট থেকে অগ্নিপূজাকে গ্রহণ করা হয়। আকবরী মহলে চিরস্থায়ী আগুন জ্বালানো হয় এবং বাতি জ্বালানোর সময় সম্মানের সংগে দাঁড়াবার রীতি প্রচলন করা হয়। ঈসায়ীদের নিকট থেকে 'ঘণ্টা বাজানো', তিন প্রভুর প্রতিকৃতির পূজা এবং এই ধরনের কতিপয় জিনিস গ্রহণ করা হয়। সব চাইতে বেশী মেহেরবাণী করা হয় হিন্দু ধর্মের ওপর। কেননা, এটি ছিল দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম এবং রাজশাসনের ভিত্তি শক্তিশালী করার জন্য একে তোয়াজ করার প্রয়োজন ছিল। কাজেই গরুর গোশত হারাম ঘোষণা করা হয়। হিন্দুদের উৎসবসমূহ যেমন ঃ দেওয়ালী, দশোহরা, রাখী, পুণম, শিবরাত্রি প্রভৃতিকে পূর্ণ হিন্দুরীতি অনুযায়ী পালন করার ব্যবস্থা করা হয়। রাজমহলে প্রতিদিন 'হাওয়ান' অনুষ্ঠিত হতে থাকে। প্রতিদিন চারবার সূর্যোপাসনা করা হতো। সূর্যের এক হাজার নাম জপ করা হতো। সূর্যের নাম

www.nagorikpathagar.org

উচ্চারিত হলে সঙ্গে সঙ্গেই বলা হতো 'তার শক্তি মহান'। কপালে তিলক লাগানো হতো। কোমর ও কাঁধে পৈতা বাঁধা হতো। গরুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। জন্মান্তরবাদকে স্বীকার করে নেয়া হয় এবং ব্রাহ্মণদের নিকট থেকে তাদের বহু আকিদা-বিশ্বাস সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করা হয়। ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মের সাথে এ ব্যবহার করা হয়। আর ইসলামের ব্যাপারে বাদশাহ ও তাঁর দরবারীদের প্রতিটি কাজই প্রমাণ করছিল যে, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের মন বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের পক্ষ থেকে দরবারের মেজাজ অনুযায়ী দার্শনিক ও সুফিদের ভাষায় ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে যে কথা পেশ করা হতো, তাকে আসমানী ওহি মনে করা হতো এবং তার মুকাবিলায় ইসলামী শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করা হতো। মুসলমান আলেমগণ যদি ইসলামের পক্ষ থেকে কোন কথা বলতেন অথবা কোন গোমরাহির বিরোধিতা করতেন, তাহলে তাদেরকে 'ফকিহ' আখ্যা দান করা হতো। তাদের বিশেষ পরিভাষায় এর অর্থ ছিল নির্বোধ ব্যক্তি এবং যে ব্যক্তির কথায় কর্ণপাত করার প্রয়োজন হয় না।...

'প্রকাশ্য ও ব্যাপকভাবে ইসলামী নির্দেশাবলী পরিবর্তন করা হয়। সুদ, জুয়া ও শরাবকে হালাল করা হয়। নওরোজ উৎসবে রাজসভায় শরাব ব্যবহার অপরিহার্য ছিল। এমনকি কাজী ও মুফতী পর্যন্ত শরাব পান করে ফেলতো। দাড়ি চেঁছে ফেলার ফ্যাশান প্রবর্তন করা হয় এবং এর বৈধতার পক্ষে প্রমাণ পেশ করা হয়। চাচাত ও মামাত বোনদের সংগে বিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পুরুষদের জন্য ১৬ বছর ও মেয়েদের জন্য ১৪ বছর বিয়ের বয়স নির্ধারিত হয়। একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। রেশম ও স্বর্ণের ব্যবহার বৈধ গণ্য করা হয়। সিংহ ও বাঘের গোশত হালাল ঘোষণা করা হয় এবং ইসলামের প্রতি জিদের বশবর্তী হয়ে শুকরকে শুধু পাকই নয় বরং একটি অতি পবিত্র প্রাণী বলে ঘোষণা করা হয়। এমনকি সকালে বিছানা ছেড়ে সর্বপ্রথম শুকর দর্শনকে বড়ই মোবারক মনে করা হতো। মৃতদেহকে কবরস্থ করার পরিবর্তে পুড়িয়ে ফেলা বা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়াকে ভালো গণ্য করা হয়। আর যদি কেউ একান্তই কবরস্থ করতে চাইতো, তাহলে পদদ্বয় কেবলার দিকে স্থাপন করার জন্য তাকে পরামর্শ দেয়া হতো। আকবর নিজেও ইসলামের প্রতি জিদের বশবর্তী হয়ে পদদ্বয় কেবলার দিকে রেখে শয়ন করতেন। সরকারের শিক্ষানীতিও পূর্ণ ইসলামবিরোধী ছিলো। আরবী ভাষা শিক্ষা এবং ফিকাহ ও হাদীস অধ্যয়নকে অপছন্দ করা হতো। যারা এ সব বিদ্যা অর্জন করতো তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা হতো।... ভাষার মধ্যে হিন্দু-রীতি সৃষ্টি করার দিকে বিশেষ আগ্রহ ছিল। আরবী শব্দাবলীকে ভাষার চৌহদ্দি থেকে বহিষ্কৃত করারও প্রস্তাব ছিল। এ অবস্থায় দ্বীনি মাদ্রাসাগুলি ছাত্রশূন্য হয়ে যেতে থাকে এবং অধিকাংশ আলেম দেশত্যাগ করতে শুরু করে।'[১২]

আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময় ইসলামের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অভিযান চলে। সে ধর্মদ্রোহিতার ঢেউ বাংলায়ও আছড়ে পড়েছিলো। বিভিন্ন অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের

১২. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী ঃ ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন (তরজমা– আবদুল মান্নান তালিব), পৃঃ ৫৫-৫৯।

www.nagorikpathagar.org

সাথে প্লেটোবাদ, বৈরাগ্যবাদ, বেদান্তবাদ, মহা নির্বাণবাদ প্রভৃতি ইসলামবিরোধী ভাবধারা ইসলামী আকিদা-বিশ্বাসের সাথে মিশে গিয়েছিলো। একশ্রেণীর সুফীর মাধ্যমে সারা দেশে এ সময় এক মিশ্র তাসাউফ জন্মলাভ করেছিলো।

আকবরের ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ লিখেছেন '... প্রায় সহস্র বৎসর যাবত যে সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তি প্রকাশ্যে অথবা গোপনে ইছলাম ও মুছলমানদের সমাজ জীবনের ধ্বংস সাধনে লিপ্ত ছিল, সম্রাট আকবরের নিকট তাহা সমর্থন ও উৎসাহ পাইল। তিনি এই সমস্ত বিরুদ্ধবাদের ব্যাখ্যাদাতাদের প্রচুর সম্মান ও সমাদরের সহিত তাঁহার দরবারে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। মুছলমানদের তামুদ্দুনিক ও রাজনৈতিক জীবনের সকল সম্পদ ও শক্তি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার জন্য ভারতে যে হিন্দু মানসিকতা নীরবে অথচ অব্যাহতভাবে শক্তি সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছিল–ইতিহাসের লিখিত ও সর্ব্বসম্মত রায় অনুসারে–সেই হিন্দু মানসিকতা জীবনধারায় প্রাধান্য দেওয়ার জন্য কোনরূপ চেষ্টারই তিনি ত্রুটি করেন নাই–। বলা বাহুল্য, একদিকে মুছলমান চিন্তানায়কগণ যে তীব্র ভাষায় আকবরের শাসননীতির নিন্দা করিয়াছেন এবং অপরদিকে মোছলেমবিরোধী ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিকগণ যে তাঁহাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও মহান সম্রাটরূপে প্রশংসাবাদ দিয়াছেন, ইহাই তাহার যথার্থ কারণ।... মুছলমানদের নিকট আকবর হইতেছেন তাহাদের অধঃপতন ও ধ্বংসের শ্রেষ্ঠতম প্রতীক এবং মোছলেম ভারতের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ। অন্যদিকে মুছলমানদের এই অধঃপতিত অবস্থার মধ্যেই শুরু হয় অপর পক্ষের অগ্রযাত্রা, আকবরের সক্রিয় সমর্থন ও সাহায্য ব্যতীত তাহা কখনো সম্ভব হইত না।'[১৩]

ভারতীয় মুসলমানদের এ মহা সংকট মুকাবিলায় এগিয়ে আসেন মুজাদ্দিদে আলফিসানী (জন্ম পূর্ব পাঞ্জাব, ২৬শে মে, শুক্রবার, ১৫৬৪; মৃত্যু ৩০শে নভেম্বর বুধবার, ১৬২৪ খ্রীঃ)। মিথ্যা ও বাতিলের প্রবল ঢেউয়ের মুকাবিলায় পর্বত-প্রমাণ প্রতিরোধের দেয়ালরূপে তিনি অবতীর্ণ হন; দীন-ই-ইলাহী নামক জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং মুসলমানদেরকে ইসলামের সঠিক শিক্ষায় পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তাঁর একদল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীকে উপমহাদেশের নানা জায়গায় প্রচার অভিযানে প্রেরণ করেন। জনগণের মধ্যে যেসব জাহিলী রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান ঢুকে পড়েছিল তিনি সেগুলির কঠোর বিরোধিতা করেন। সকলের সামনে ইসলামের নির্ভেজাল ও বিশুদ্ধ তাসাউফের ধারণাও তিনি পেশ করেন। গোমরাহিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত দিল্লী সম্রাটের চিন্তা ও চেতনায় পরিবর্তন আনার উদ্দেশ্যে তিনি দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন। আকবরের মৃত্যুর পর তিনি বহু রাজন্যকে এই মর্মে বায়াত করেন যে, ইসলামী শরীয়তবিরোধী কোন কাজে তাঁরা আর কখনো শরিক হবেন না।

১৩. মোহাম্মদ আকরম খাঁ ঃ মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ১ম সংস্করণ, নবেম্বর ১৯৬৫, পৃঃ ১২৭-১২৮।

www.nagorikpathagar.org

মুজাদ্দিদে আলফিসানীর আন্দোলনের প্রভাব সুদূর বাংলাসহ ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। জাহাঙ্গীর তাঁকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করলে সামরিক বাহিনীতে বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দেয়। জনগণের মাঝে মুজাদ্দিদের আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব এবং জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে জাহাঙ্গীর তাঁকে বিনাশর্তে মুক্তি দেন এবং তাঁর কয়েকটি দাবি মেনে নেন। মুজাদ্দিদের দাবিগুলির মধ্যে ছিলো ঃ বাদশাহকে সিজদা করার রীতি রহিতকরণ; ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ওপর আরোপিত বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার, ইসলামী শিক্ষার জন্য মুসলিম প্রধান শহর ও গ্রামগুলিতে মক্তব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা; বিদাত ও ইসলামবিরোধী অনাচার দূর করার ব্যবস্থাগ্রহণ; প্রত্যেক শহরে কাজী ও মুফতী (ধর্মীয় ব্যবস্থাপক) এবং মুহতাসিব (অধর্ম ও দুর্নীতি দমনকারী) নিয়োগ। সম্রাট জাহাঙ্গীর রাজদরবারের কাছেই একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করেন এবং সেখানে মুসলিম সভাসদগণকে সাথে নিয়ে নিয়মিত সালাত আদায় করতেন।

এভাবে মুজাদ্দিদে আলফিসানীর আন্দোলনের ফলে ভারতবর্ষে ইসলামবিরোধী ও মানবতাবিরোধী এক সর্বগ্রাসী সয়লাব অনেকাংশে প্রতিহত হয়। আকবর-এর মৃত্যুর পর মুগল দরবারের বহু রাজন্য ইসলামী শরীয়তবিরোধী কোন কাজে আর কখনো অংশগ্রহণ না করার ওয়াদা করে মুজাদ্দিদের হাতে বায়াত হন। ঢাকার প্রথম মুগল সুবাহদার ইসলাম খাঁ চিশতি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ১৫৭৬ সালে বাংলা মুগল শাসনাধীন হলেও ইসলাম খানের সুবাহদারীর (১৬০৮-১৬১৩) আগে বাংলায় মুগল শাসন দৃঢ়ভিত্তি অর্জন করতে পারেনি। আকবরের ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ এবং তার বিরুদ্ধে জৌনপুরের কাজীর ধর্মদ্রোহিতার ফতওয়া বাংলার পাঠান মুসলিম বারো ভুইয়াদের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে যথেষ্ট শক্তি যুগিয়েছে।

মুজাদ্দিদে আলফিসানীর আন্দোলনের প্রভাব আওরঙ্গযীব আলমগীরের শাসন ব্যবস্থায় গভীরভাবে লক্ষ্য করা যায়। আওরঙ্গযীব সব ধরনের বিদাতের মূলোৎপাটনের ব্যবস্থা করেন। মুসলমানদের মধ্যে 'আসসালামু আলাইকুম' বলার রেওয়াজ পুনরায় চালু করেন। দরবারে সিজদা ও ভূমি চুম্বনের রীতি বন্ধ করেন। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেন। তিনি ইসলামী তাহজিব, তমদ্দুন ও আইন-কানুন প্রবর্তন করেন। বাদশাহী সম্পত্তিকে সরকারী তহবিলভুক্ত করে তিনি বাদশাহদের মর্যাদাকে খোদার আসন থেকে মানুষের মর্যাদায় নামিয়ে আনেন। 'ইহতিসাব বিভাগ' প্রতিষ্ঠা করে তিনি জনগণের মধ্যে সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চালু করেন। রাজ্যের সমস্ত মসজিদে সরকারী ব্যয়ে ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খতিব নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। আওরঙ্গযীব তাঁর শাহী দরবারে বিলাসিতা ও গান-বাজনা বন্ধ করেন। সামাজিক সমস্যার ইসলামী সমাধানের জন্য তিনি সহজবোধ্য আকারে 'ফতওয়ায়ে আলমগীরী' নামে বিশ্ববিখ্যাত ফিকাহ গ্রন্থ রচনা করান। সর্বোপরি তিনি খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শ অনুযায়ী প্রজাদের 'হক' বা অধিকার প্রতিষ্ঠার আইনগত ব্যবস্থা করেন। আওরঙ্গযীবের শাসনামলেই বাংলাদেশসহ

www.nagorikpathagar.org

ভারতবর্ষের মুসলমানগণ ইসলামী শাসনের সাথে পরিচিত হওয়ার এবং ইসলামী শাসনের অন্তত কিছুটা সুফল ভোগ করার সুযোগ পায়।[১৪]

৪. সমাজ-সভ্যতার বিপর্যয় ও শাহ ওয়ালিউল্লাহ্

মুগল সম্রাট আওরঙ্গযীব আলমগীরের মৃত্যুর পর তাঁর অযোগ্য উত্তরাধিকারীগণ শৌর্য-বীর্য হারিয়ে ভীরুতা ও কাপুরুষতার কারণে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। নাদির শাহের হামলায় তাঁদের শেষ শক্তিটুকুও তখন লুপ্তপ্রায়। মুগল সম্রাটগণ মারাঠাদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিলেন। তৈমুরের এককালের বংশধরগণ আত্মরক্ষার যে শক্তিশালী দুর্গ গড়ে তুলেছিলেন, অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের হাতে পড়ে সে সর্ব দুর্গ স্বার্থশিকারী আর ভাগ্যান্বেষীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছিলো। দিল্লীর সিংহাসনের ওপর আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে লোভী স্বার্থ শিকারীদের একের পর এক ষড়যন্ত্র চলছিলো। দিল্লীর নামমাত্র সম্রাট তখন কার্যত উযীর, উমরাহ ও পারিষদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিলেন। সেই আমীর-উমরাহগণও পরস্পর আত্মকলহ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জড়িত ছিলেন। দিল্লীর লালকেল্লার বাইরে প্রত্যেক প্রদেশের সুবাহদার তখন তাঁর নিজ স্বাধীনতা ঘোষণার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। কেন্দ্র ও সুবাহর মধ্যে চলছিলো এক হতাশাজনক ও পীড়াদায়ক রাজনৈতিক দাবা খেলা। দিল্লী সম্রাট কখনো কোন আমীরের প্রতিপত্তির কাছে নতি স্বীকার করছিলেন; আবার কখনো কারো তোষামোদে গলে গিয়ে তাকে সুবাহদারী মঞ্জুর করছিলেন। বিশাল মুগল সাম্রাজ্য তখন কার্যত খণ্ড-বিখণ্ড। কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন শাসকগণ আত্মকলহে লিপ্ত। এক কথায় সাম্রাজ্যের রাজনীতি এ সময় হয়ে পড়েছিলো পুরোপুরি গণবিচ্ছিন্ন এবং সম্পূর্ণরূপে নীতি বিবর্জিত। শাসক সমাজ, আমীর-উমরাহ ও রাজানুকুল্য লাভকারী মুসলিম ধনিকশ্রেণীর মধ্যে চরম বিলাসিতা, নিষ্ক্রিয়তা ও নিবীর্যতা বাসা বেঁধেছিলো। মদ্যপান, সংস্কৃতির নামে বাইজী চর্চা, অবৈধ নারী সম্ভোগ প্রভৃতি উপসর্গগুলি সমাজের উচ্চশ্রেণীকে নৈতিকভাবে পঙ্গু করে ফেলেছিলো।

আঠারো শতকের মুসলিম সমাজে–দিল্লী থেকে মুরশিদাবাদ, ঢাকা, সোনারগাও কিংবা চট্টগ্রাম, সর্বত্র–একই অবস্থা বিরাজ করছিলো। সমকালীন সাধারণ মুসলিম সমাজের নৈতিক, তামুদ্দুনিক ও সামাজিক অবক্ষয় চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলো। আকীদা-বিশ্বাস, আচার-আচরণ, নৈতিক বৃত্তি ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সৃষ্টি হয়েছিল সার্বিক বিপর্যয়। আঠারো শতকের মুসলিম সমাজে শিরক, বিদআত, কুরআন-সুন্নাহর আদর্শের পরিবর্তে হিন্দু-মিথ-প্রভাবিত সুফীতত্ত্ব, দীন ও শরীয়তের পরিপন্থী ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রাধান্য লাভ করেছিলো। ইসলাম যে একটি বৈপ্লবিক আদর্শ এবং শান্তি ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ এবং এটিই যে সভ্যতা নির্মাণ ও হেফাজতের মৌল উপাদান,

১৪. আবদুল মান্নান তালিব ঃ বাংলাদেশে ইসলাম, পৃঃ ২৪৮।

www.nagorikpathagar.org

সে ধারণা সমাজ থেকে প্রায় লোপ পেয়েছিলো। আলিমগণ কুরআন-হাদীসের চর্চা বাদ দিয়ে ফিকাহর খুঁটি-নাটি বিষয় নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত ছিলেন। মুসলমানগণ তাদের জীবন থেকে সংগ্রামকে নির্বাসন দিয়েছিলেন। মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে ইসলামী আদর্শের প্রেরণা অনুপস্থিত ছিলো। তারা হয়ে পড়েছিলো নিছক ভাড়াটিয়া বা চাকুরে। এই পরিস্থিতি মুকাবিলায় মুসলিম জাতির শিক্ষা এবং দীনী ও নৈতিক উন্নয়নের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তা বা ফুরসত কোনটাই আলমগীর এর উত্তরাধিকারী সম্রাট এবং তৎকালীন সুবাহদারদের ছিলো না। বংশীয় শাসন ও গদি রক্ষার কাজেই তাঁদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা নিয়োজিত ছিলো।

মুসলিম শাসকদের দুর্বলতা ও অসচেতনতার সুযোগে বাংলায় ইউরোপীয় খ্রীস্টানদের মিশনারী তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। তারা এখানে খ্রীস্টধর্মের ব্যাপক প্রচার শুরু করে। হুগলী, ঢাকা, শ্রীপুর ও পিপলীতে কেন্দ্র স্থাপন করে তারা হাজার হাজার মুসলমান ও হিন্দুকে খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত করে। স্থানীয় মুগল শাসকগণ এতে বাধা দেননি। আলিম ও পীরদের দুর্বল প্রতিরোধের মুখে শাসকরা মিশনারীদেরকেই সাহায্য করেছেন। এমনি পরিস্থিতিতে বাংলা ও দক্ষিণ ভারতের উপকূল এলাকায় ইংরেজদের বাণিজ্যিক কুঠিগুলি অস্ত্রাগার ও কেল্লায় পরিণত হচ্ছিলো। ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের সাথে পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ বণিকদের দীর্ঘদিন ধরে সংঘাত চলে। পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিতাড়িত করার পর ইংরেজরা রাজনৈতিক ক্ষমতার দিকে নযর ফিরায়। দেশের ভিতরকার অনৈক্যের সুযোগ তারা পুরোপুরি কাজে লাগায়। হিন্দুস্তানের কোন প্রদেশে ক্ষমতার দুই দাবিদারের মধ্যে লড়াই বাঁধলে সাহায্যের জন্য এক দাবিদার হাত পাততেন ইংরেজদের কাছে, অপর জন ধরনা দিতেন ফরাসীদের কাছে।

শাসকদের দুর্বলতা ও অযোগ্যতা, রাজনৈতিক অংগনে বিরাজমান বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা এবং অন্যদিকে মারাঠা ও শিখ উত্থানের পাশাপাশি ক্ষাত্র-শক্তিহীন, অপেক্ষাকৃত নিরীহ অথচ ষড়যন্ত্র-পটু, জাগরণকামী হিন্দু বেনিয়া ও শেঠদের মুসলিম বিদ্বেষ, লোভ ও ষড়যন্ত্র ইংরেজদেরকে তাদের লক্ষ্য হাসিলে উৎসাহী, সাহসী ও বেপরোয়া করে তোলে। তারা বাণিজ্যের পেশাদারী থেকে সাম্রাজ্য গড়ার রাজনীতির দিকে অগ্রসর হয়।

বাংলার মুসলিম শাসনের সাথে দিল্লীর সালতানাত দীর্ঘদিন গভীরভাবে জড়িত ছিলো। বাংলায় মুসলিম শাসন অবসানের পর আরো নব্বুই বছর দিল্লীতে মুসলিম শাসন চালু ছিলো। কিন্তু বাংলার বিপদে দিল্লীর দুর্বল শাসকরা কার্যকর কোন ভূমিকাই পালন করতে পারেননি।

তৎকালীন মুসলিম শাসক ও মুসলিম সমাজ সম্পর্কে জানার জন্য শাহ ওয়ালিউল্লাহর বিভিন্ন লেখা এবং তাঁর সংগ্রামী কর্মতৎপরতা আলোচনা করা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। উপমহাদেশের মুসলমানদের সার্বিক বিপর্যয়ের পটভূমিতে আবির্ভূত

www.nagorikpathagar.org

হয়েছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ। সম্রাট আলমগীরের মৃত্যুর চার বছর আগে ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে তাঁর জন্ম হয়। তিনি ইনতেকাল করেন ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে, দিল্লীর অন্ধ সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের আমলে। ফলে তিনি দিল্লীর দশজন সম্রাটের শাসনকাল দেখার সুযোগ পান। সমগ্র হিন্দুস্তানের অনেক বিপর্যয়-বিশৃংখলা তিনি প্রত্যক্ষ করেন। একটি বিদেশী শক্তির অভ্যুত্থান ঘটে তাঁরই চোখের সামনে।

মুজাদ্দিদে আলফিসানীর বিশিষ্ট খলিফা শাহ আদম বিন্নৌরীসহ বহু বিশিষ্ট পণ্ডিতের কাছে শাহ ওয়ালিউল্লাহ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ছিলেন গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন। এই মনীষী উপলব্ধি করেন যে, ইসলামের মূল সত্য থেকে বিচ্যুতিই মুসলমানদের পতনের কারণ। তিনি ইসলামী আদর্শ, ভাবধারা ও জীবন বিধানের ভিত্তিতে মুসলিম সমাজ পুনর্গঠনের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পূর্ণ ইসলামী সমাজ গঠনের লক্ষ্যে তিনি প্রথম পর্যায়ে মুসলমানদের চিন্তার সংশোধন ও পরিশুদ্ধির কাজে হাত দেন। মুসলিম শাসক, আমীর-ওমরাহ, সৈনিক, আলিম, সুফী, ব্যবসায়ী, শ্রমজীবী তথা সকল স্তর ও পেশার মানুষকে তিনি ইসলামের মূল সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনের আহবান জানান। তাদের আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, শিক্ষা-চরিত্র, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাজনীতিকে সকল প্রকার ইসলামবিরোধী প্রভাবের উর্ধ্বে কুরআন-হাদীসের আলোকে পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমে বিপর্যয় রোধ সম্ভব বলে তিনি যুক্তি উপস্থাপন করেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি ইসলামী জ্ঞান ও চিন্তার পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেন। তিনি মুসলমানদের মযহাবী বিরোধ দূর করার পথ নির্দেশ করেন। ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তার ওপর তিনি বিশেষ জোর দেন। ইজতিহাদকে তিনি সকল যুগের জন্য ফরজে কিফায়া বলে উল্লেখ করেন। ইজতিহাদের নিয়ম-বিধান ও শর্তাবলী রচনা করে এক্ষেত্রে তিনি একটি শৃংখলার পথনির্দেশ দান করেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে কুরআনের জীবনব্যবস্থা ও ইসলামী জীবনদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেন। ইসলামের নৈতিক, তামুদ্দুনিক ও আইনগত ব্যবস্থাকে তিনি লিখিত আকারে পেশ করার উদ্যোগ নেন। 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা', 'ইযালাতুল খিফা' প্রভৃতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা ছাড়াও কুরআন-হাদীসের জ্ঞানের সাথে জনগণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্য তিনি তখনকার সামাজিক ভাষা ফারসীতে আল-কুরআন তরজমা করেন। হাদীসের প্রথম সংকলিত গ্রন্থ 'মুয়াত্তা ইমাম মালিক'-এর তরজমা করে তাতে তিনি টীকা সংযোজন করেন। কুরআন-হাদীসের শিক্ষা-পদ্ধতিতে তিনি ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ ও তাঁর সুযোগ্য পুত্রগণের চেষ্টায় এ দেশে হাদীস চর্চা পুনরায় ব্যাপকভাবে শুরু হয়।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ পারিবারিক জীবন সংগঠন, সামাজিক রীতি-নীতি, রাজনীতি, বিচার-ব্যবস্থা, কর-ব্যবস্থা, দেশ-শাসন, সামরিক সংগঠন প্রভৃতি দিক নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। সমাজ-সভ্যতার বিপর্যয় ও বিকৃতির কারণসমূহের

www.nagorikpathagar.org

ওপর তিনি গভীরভাবে আলোকপাত করেন। তিনি ইসলাম ও জাহিলিয়াতের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের একটা ধারণাও পেশ করতে সক্ষম হন। তিনি খিলাফত ও রাজতন্ত্রের পার্থক্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। জাহিলী রাষ্ট্র ও ইসলামী রাষ্ট্রের পার্থক্যকে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরে তিনি যুক্তি দেন যে, জাহিলী রাষ্ট্র খতম করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত কোন ঈমানদারের পক্ষেই নিশ্চেষ্ট বসে থাকা সম্ভব নয়।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ ইসলামকে নিছক একটি ধর্ম নয়, বরং একটি বিপ্লবী আদর্শরূপে পেশ করেন। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোন বিপ্লব দেখা দিলে তা সমর্থনযোগ্য। কারণ বৃহত্তর কল্যাণের জন্য ক্ষুদ্রতর ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করা ন্যায়সঙ্গত। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ আদর্শ সারা পৃথিবীতে প্রচারিত হওয়া উচিত। মক্কা শরীফই এই কেন্দ্রের উপযুক্ত স্থান। বিশ্ব মানবের কল্যাণে ইসলামের বাণী প্রচারের পথে যে কোন বাধার বিরুদ্ধে সামরিক ক্ষমতা প্রয়োগ সঙ্গত বলে তিনি মনে করতেন।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সমাজ-সভ্যতার বিপর্যয়ের কারণগুলি চিহ্নিত করে লিখেছেন ঃ 'কোন মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে সভ্যতার বিকাশ-ধারা অব্যাহত থাকলে তাদের শিল্পকলা পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। তারপর শাসকগোষ্ঠী ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ ও ঐশ্বর্যের মোহে আচ্ছন্ন জীবনকে বেছে নিলে সেই আয়েশী জীবনের বোঝা তারা শ্রমিকশ্রেণীর ওপর চাপায়। ফলে সমাজের অধিকাংশ লোক মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য হয়। গোটা সমাজ জীবনের নৈতিক কাঠামো তখনই বিপর্যস্ত হয়, যখন তাকে অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে জীবন-যাপনে বাধ্য করা হয়। মানুষ তখন রুযি-রুটির জন্য পশুর মতো কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়। এ চরম নির্যাতন ও অর্থনৈতিক দুর্ভোগের অভিশাপ থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পথের নির্দেশ এসে থাকে। অর্থাৎ স্রষ্টা নিজেই বিপ্লবের আয়োজন করেন। জনগণের বুকের উপর থেকে বে-আইনী শাসক-চক্রের জগদ্দল পাথর অপসারণের ব্যবস্থাও তিনি করেন। রোমান ও পারসিক শাসকগোষ্ঠী সে জুলুমবাজির পথেই এগিয়েছিলো। তাদের ঐশ্বর্য ও বিলাসিতার যোগান দিতে গিয়ে জনসাধারণকে পশুর স্তরে নেমে আসতে হয়েছিলো। এ জুলুমশাহীর প্রতিকারের জন্যই আরবের জনগণের মধ্যে হযরত রসূল (স) কে অবতীর্ণ করা হয়েছিলো। মিসরে ফিরাউন বা ফারাওদের ধ্বংস এবং রোম ও পারস্য সম্রাটের পতন এ নীতি অনুসারে নবুওয়তির আনুষঙ্গিক কর্তব্যরূপে তামিল হয়েছে।'

শাহ ওয়ালিউল্লাহ উপলব্ধি করেন যে, দিল্লীর সম্রাট ও আমীর-ওমরাহ এবং হিন্দুস্তানের অন্যান্য শাসকের নৈতিক দেউলিয়াত্ব পারস্য ও রোম সম্রাটদের কাছাকাছি পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিলো।

www.nagorikpathagar.org

আঠারো শতকের মুসলিম সমাজের মূল ত্রুটিগুলিকে চিহ্নিত করে শাহ ওয়ালিউল্লাহ সমকালীন শাসক ও আমীর-ওমরাহগণকে সম্বোধন করে তাঁর 'তাফহীমাতে ইলাহিয়া' নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'তোমাদের কি আল্লাহর ভয় নেই? ক্ষণস্থায়ী আরাম-আয়েশের সন্ধানে লিপ্ত হয়ে সাধারণ মানুষকে তোমরা পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত করে দিয়েছো। প্রকাশ্যে শরাব পান করা হচ্ছে, অথচ তোমরা বাধা দিচ্ছো না। প্রকাশ্যে যিনা, জুয়া ও শরাব পানের আড্ডা চালু রয়েছে, অথচ তোমরা এর প্রতিরোধে অগ্রসর হচ্ছো না। ...তোমরা নানা রকম খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করছো, স্ত্রীদের মান-অভিমান ভঞ্জন আর প্রাসাদ ও পোশাকের বিলাসিতার মধ্যে তোমরা ডুবে রয়েছো।'

সমালোচনা ও চিন্তার পুনর্গঠন–এ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কাজেই শাহ ওয়ালিউল্লাহ সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিলেন। সংশোধনের বাস্তব কার্যক্রম পরিচালনা বা সঠিক ইসলামী চিন্তা ও ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কোন সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলার সুযোগ তাঁর ঘটেনি। তবে সে প্রয়োজন সম্পর্কে তিনি পূর্ণ সচেতন ছিলেন। ভারতের তদানীন্তন সরকারের পরিবর্তে নতুন একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে উপমহাদেশের ধর্মীয় রাজনৈতিক ও জাতীয় তথা সামগ্রিক একটি ইসলামী আন্দোলনের অংশ হিসাবে তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় দীর্ঘ মেয়াদী গণবিপ্লবের কর্মসূচী পেশ করেছেন। আল কুরআনের ফারসী তরজমা 'ফতহুর রহমান'-এর টীকাতে তাঁর এই কর্মসূচী অধিকতর স্পষ্টভাবে বিধৃত হয়েছে।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ সম্পর্কে মওলানা আবুল আলা মওদূদী লিখেছেন ঃ 'একদিকে তাঁর যমানা ও পরিবেশ এবং অন্যদিকে তাঁর কার্যাবলীকে সামনে রাখলে মানুষ হতবাক হয়ে যায় যে, সে যুগে এমন গভীর দৃষ্টি, চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের জন্ম কেমন করে সম্ভব হলো। সে অন্ধকার যুগে শিক্ষা লাভ করে এমন একজন মুক্ত বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন চিন্তানায়ক ও ভাষ্যকার জনসমক্ষে আবির্ভূত হলেন, যিনি যমানা ও পরিবেশের সকল বন্ধনমুক্ত হয়ে চিন্তা করেন, আচ্ছন্ন ও স্থবির জ্ঞান ও শতাব্দীর জমাট বাঁধা বিদ্বেষের বন্ধন ছিন্ন করে প্রতিটি জীবন-সমস্যার ওপর গভীর অনুসন্ধানী ও মুজতাহিদদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, যাঁর ভাষা, বর্ণনাভঙ্গি, চিন্তা, আদর্শ, গবেষণালব্ধ বিষয় ও সিদ্ধান্তসমূহের ওপর সমকালীন পরিবেশের কোন ছাপ পড়েনি। এমন কি তাঁর রচনা পাঠ করার সময় মনে এতটুকু সন্দেহেরও উদয় হয় না যে, এগুলি এমন এক স্থানে বসে রচনা হয়েছে যার চারদিকে বিলাসিতা, ইন্দ্রিয়পূজা, হত্যা, লুটতরাজ, জুলুম-নির্যাতন, অশান্তি ও বিশৃংখলার অবাধ রাজত চলছিলো।'[১৫]

উপমহাদেশের বিশেষত দিল্লীর সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহের ব্যাপারে সচেতন ও সক্রিয় থেকে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুসলিম জনপদে মারাঠা ও শিখ হামলার

১৫. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী ঃ ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন, পৃঃ ৬৩।

www.nagorikpathagar.org

মুকাবিলায় আহমদ শাহ আবদালীকে আমন্ত্রণ জানান। দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসক বা স্থানীয় উমরাহদের অনৈক্য ও দুর্বলতার মুখে শাহ ওয়ালিউল্লাহর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আহমদ শাহ আবদালী ১৭৪৭ থেকে ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ১৪ বছরে দশটি অভিযান চালিয়ে মারাঠাদের দমন করেন।

ঠিক এ সময়েই ইংরেজরা বাংলাদেশে প্রভুত্ব বিস্তার করছিলো। এলাহাবাদ পর্যন্ত তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এই শক্তিটির ব্যাপারে শাহ সাহেব কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারেননি। সম্ভবত এ সময় দিল্লীর হেফাজতের ব্যাপারেই তাঁর দৃষ্টি বেশী নিবদ্ধ ছিলো। শাহ ওয়ালিউল্লাহ উপমহাদেশের ভাগ্যবিড়ম্বিত জনগণকে তাৎক্ষণিক বিপর্যয় ও ধ্বংসের সয়লাব থেকে পুরোপুরি রক্ষা করতে না পারলেও তাঁর আন্দোলন ভবিষ্যৎ প্রতিরোধের এক দুর্জয় শক্তি গড়ে তুলেছিলো। উপমহাদেশের মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে তিনি আঠারো শতকের বন্ধ্যা সময়ে বিপ্লব ও বিদ্রোহের এমন এক শক্তি জাগ্রত করেন যা পরবর্তীকালে একাধিক আপোসহীন মুক্তি সংগ্রামের জন্ম দেয়। পরবর্তী যুগের প্রায় সকল আপোসহীন মুক্তি সংগ্রামে শাহ ওয়ালিউল্লাহ ছিলেন এক অন্তহীন প্রেরণা ও শক্তির উৎস।।

৫. বর্ণহিন্দুদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি

মুরশিদকুলী খাঁ ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণ জায়গীর ও জমিদারী বন্দোবস্ত দান ও রাজকার্যে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে যে নীতি গ্রহণ করেন তার ফলে বর্ণহিন্দুরা বিশেষভাবে লাভবান হয়েছিলো। মুগল আমলে বহু জায়গীর ও জমিদারী মুসলমানদের দখলে ছিলো। বড় বড় জায়গীরদার ও জমিদারগণ অধিকাংশই মুসলমান ছিলেন। কিন্তু মুরশিদকুলী খাঁ ও তাঁর পরবর্তী নবাবগণের গৃহীত নীতির ফলে জমিদারীর ক্ষেত্রে, রাজকার্যে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে হিন্দুদের বিশেষ সুবিধা হয়। মুরশিদকুলী খাঁ অনেক মুসলমান কর্মচারীর জায়গীর বাংলাদেশ থেকে উড়িষ্যায় স্থানান্তরিত করেন। কয়েকজন মুসলমান জমিদার সময়মতো রাজস্ব আদায় করতে না পারায় তিনি তাদের জমিদারী কেড়ে নিয়ে হিন্দুদেরকে প্রদান করেন। মাহমুদপুর (যশোর-নদীয়া) ও জালালপুর পরগনার কয়েকটি মুসলমান জমিদারী নাটোর জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা রামজীবনকে দেয়া হয়। সোনারগাঁওয়ের ঈসা খাঁর বংশধরগণ কয়েকটি মূল্যবান পরগনা হারান। মুরশিদকুলী খাঁ তাঁদের জমিদারীর আলেপশাহী ও মোমেনশাহী পরগনা দু'টি কেড়ে নিয়ে তাঁর দু'জন হিন্দু রাজস্ব কর্মচারীর মধ্যে বন্দোবস্ত প্রদান করেন। ফলে আলেপশাহী ও মোমেনশাহীতে দু'টি হিন্দু জমিদারীর উদ্ভব হয়। মুরশিদকুলী খাঁ ও তাঁর পরবর্তী নবাবগণ রাজস্ব ব্যবস্থার বিষয়ে হিন্দুদেরকে বেশী বিশ্বাসযোগ্য মনে করতেন। তাঁদের অনুসৃত নীতির ফলে বাংলাদেশের জমিদারীতে হিন্দুদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এদেশে একটি হিন্দু নব্য-অভিজাতশ্রেণী গড়ে ওঠে। মুরশিদকুলী

www.nagorikpathagar.org

খাঁর এই নীতির ফলে কালক্রমে নাটোর, দিঘাপাতিয়া, মুক্তাগাছা, মোমেনশাহী প্রভৃতি এলাকায় হিন্দুদের জমিদারী কায়েম হয়। দিনাজপুর ও বর্ধমানের হিন্দু জমিদারগণও তাদের জমিদারীর সীমা সম্প্রসারিত করে শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ পান। মুরশিদকুলী খাঁ হিন্দুদেরকে রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। তাঁর শাসনকালে ভূপৎ রায়, দর্পনারায়ণ, রঘুনন্দন, কিঙ্কর রায়, আলমচান্দ, লাহেরীমল, দিলপৎসিং, হাজারীমল এবং আরো কয়েকজন হিন্দুকে দীউয়ান ও অন্যান্য উচ্চপদে নিযুক্ত করা হয়।[১৬]

ডকটর রমেশচন্দ্র মজুমদার মুরশিদকুলী খাঁর শাসননীতির প্রশংসা করে লিখেছেন ঃ 'মুরশিদকুলী খাঁ গুণের আদর করিতেন এবং তাঁহার আমলে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতিশ্রেণীর হিন্দুগণ উত্তমরূপে ফার্সী ভাষায় অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া কর্মকুশলতার ফলে বহু উচ্চ পদ অধিকার করিতে লাগিলেন। এইভাবে মুসলমান যুগে সর্বপ্রথম হিন্দুদের মধ্যে এক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব হইল। ইহাদের কেহ কেহ নবাবের অনুগ্রহে জমিদারী লাভ করিয়া অথবা কার্যে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া বহু ধন অর্জন করিয়া রাজা, মহারাজা প্রভৃতি খেতাব পাইলেন।'[১৭]

মুরশীদকুলী খাঁর এই বদান্যতা ও উদারতাকে তাঁর শাসননীতির ভ্রান্তি বলে কেউ কেউ সমালোচনা করেছেন। যে সব মুসলমানকে স্থানচ্যুত করে সেখানে তিনি হিন্দুদের বসিয়েছেন, এককালে সেই মুসলমান জমিদাররা ছিলেন মুরশিদাবাদের নবাবের ক্ষমতার উৎস। মুসলমান জমিদারদের জমিদারী হস্তান্তরের ফলে নবাবের সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা খর্ব হয়েছিলো।

মুরশিদকুলী খাঁ এ দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সূচনা করেন। তা পরবর্তীকালে নানাভাবে আরো বৃদ্ধি পায়। নবাবদের উদারতার ফলে বর্ণহিন্দুদের প্রতিপত্তি লাভ এবং তাদের পরবর্তী ভূমিকা সম্পর্কে মেসবাহুল হক লিখেছেন ঃ 'মুর্শিদাবাদের নবাবদের ছত্রছায়ায় প্রতিপালিত হয় জগতশেঠ, উঁমিচাঁদের মতো কুচক্রী ব্যবসায়ীরা। জগতশেঠ ছিল সরকারের অর্থ সরবরাহকারী। এ অর্থলগ্নী ব্যবসায় জগতশেঠ বাৎসরিক ৪০ লাখ টাকা মুনাফা আদায় করতো। সাম্রাজ্যের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি জগতশেঠের অর্থের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবারে যে কোন আমীর-ওমরাহ অপেক্ষা জগতশেঠের আধিপত্য ছিল অনেক বেশী। নবাবের যে কোন জরুরী প্রয়োজনে অর্থের যোগান দিত জগতশেঠ। উঁমিচাঁদকে ক্ষমতা ও যোগ্যতার আসনে বসিয়েছেন নবাব আলীবর্দী খাঁ। মুর্শিদকুলী খাঁর শাসনকালে ভুপৎ রায়, দর্পনারায়ণ, রঘুনন্দন, কিঙ্কর সেন, আলমচান্দ, লাহেড়ী মল ও দিলপদ সিং হাজারীর মতো বহু হিন্দু দেওয়ানী এবং শাসন বিভাগের উল্লেখযোগ্য পদে অধিষ্ঠিত হতে সমর্থ হন।... মুর্শিদকুলীর জামাতা সুজাউদ্দীনের

১৬. ডকটর এম. এ. রহীম ঃ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ৩।
১৭. ডকটর রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, পৃঃ ২১২-২১৩।

www.nagorikpathagar.org

আমলে আলম চান্দ, জগতশেঠ, যশোবন্ত রায়, রাজবল্লভ, নন্দলাল এবং আরও বহু হিন্দু রাজ্যের শাসন বিভাগের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে সংস্থাপিত হয়। সুজাউদ্দীন মোহন লালকে প্রধানমন্ত্রী, জানকী রায়কে দেওয়ান এবং মানিক চান্দকে যথাক্রমে কলিকাতা ও হুগলীর ফৌজদারের পদ দান করেন। আলীবর্দী খাঁর শাসনকালে হিন্দুদের আধিপত্য ব্যাপকতায় সুদৃঢ় আকার ধারণ করে। চিনরায়, বীরু দত্ত, কীরাত চান্দ ও উমিদ রায়কে খালসার দেওয়ানী, জানকী রায় ও রাম নারায়ণকে যথাক্রমে বিহারের দেওয়ানী এবং গভর্নরের পদ অর্পণ করেন। রায় দুর্লভ উড়িষ্যার গভর্নর আর রাজবল্লভ জাহাঙ্গীর নগরের (ঢাকা) দেওয়ানী পদ লাভ করেন। একই সময় শ্যামসুন্দর পদাতিক বাহিনীর বখশী ও রামরাম সিং নবাবের গুপ্তচর বাহিনীর প্রধানের পদ অধিকার করতে সমর্থ হন। এ ছাড়া আরো বহু হিন্দু সামরিক ও বেসামরিক পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু মুসলমান নবাবদের সরলতা ও বদান্যতার কোন মূল্য ছিল না বর্ণহিন্দুদের কাছে। তারা বরাবর মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও উস্কানীমূলক কাজে লিপ্ত ছিল। হিন্দু রাজা ও জমিদাররা মুসলিম শাসকদের প্রতি সর্বদা হিংসাত্মক বিদ্রোহভাব পোষণ করতো। গোপনে গোপনে তারা মুসলিম শাসনের হাত থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজতো।'[১৮]

মুরশিদকুলী খাঁর মৃত্যুর পর নবাব সুজাউদ্দীন খানের (১৭২৭-৩৯) শাসনামলেই হিন্দু শেঠ-বেনিয়াদের ভূমিকা মুখ্য হয়ে উঠেছিলো। এ সময় থেকে কার্যত তারাই ছিলো বাংলার আসল শাসক। সুজাউদ্দীনের পর আলীবর্দী খানের শাসন ক্ষমতা লাভে আলমচান্দ-জগতশেঠগোষ্ঠী সহায়তা করেছিলো। এ কারণে আলীবর্দী খান তাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তিনি তাদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন করেন।

দেশের শাসন ব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে বর্ণহিন্দুদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির কাজটি নবাব আলীবর্দী খানের দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌলাহর সময়ও অব্যাহত ছিলো। মাতামহের নীতি অনুসরণ করে সিরাজ-উদ-দৌলাহ মোহন লালকে প্রধানমন্ত্রী ও জানকী রায়কে দীউয়ান পদে নিয়োগ করেন। রায় দুর্লভ, রাম নারায়ণ, রাজবল্লভ ও অন্যান্য হিন্দু কর্মচারীকে তিনি বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদ দান করেন। মানিক লাল ও নন্দকুমার যথাক্রমে কলকাতা ও হুগলীর ফৌজদার পদে নিয়োজিত হয়েছিলেন। নবাব আলীবর্দীর সময়ে জগতশেঠ ও উমিচাঁদের পরিবার যথাক্রমে মুরশিদাবাদ ও কলকাতায় বিশেষ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। নবাব-সরকারের ব্যাংকাররূপে জগতশেঠ একাই বছরে চল্লিশ লাখ টাকা মুনাফা করতেন। জগতশেঠ নবাবের দরবারের যে কোন আমীর-ওমরাহর চাইতে প্রভাবশালী ছিলেন। সিরাজের সময়ও এই অবস্থা অব্যাহত থাকে।

নবাবী আমলের শেষভাগে হিন্দুদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি সম্পর্কে রবার্ট ওর্ম লিখেছেন ঃ 'প্রশাসনের সকল বিভাগে হিন্দুদের প্রভাব এত ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছিলো যে তাদের সাহায্য ছাড়া ও তাদের অজ্ঞাতে সরকারের কোন কাজ চলতে

১৮. মেসবাহুল হক ঃ পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ, পৃঃ ৩-৪।

www.nagorikpathagar.org

পারতো না।'[১৯] বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত এই হিন্দুরা মুসলিম শাসকদের সরলতা ও বদান্যতার জন্য কৃতজ্ঞতার কোন নযির উপস্থিত করতে পারেনি। এই বর্ণহিন্দু নব্য অভিজাতশ্রেণীটি মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও নানা উস্কানীমূলক কাজের মধ্য দিয়ে বদান্যতার মূল্য পরিশোধ করতো। ১৭২৭ সালে মুরশিদকুলী খাঁর মৃত্যুর পর থেকে ১৭৬৪ সালে বক্সারে মীর কাসিমের পরাজয় পর্যন্ত আটত্রিশ বছরের ইতিহাস নবাবদের বদান্যতা লাভকারী এই বিশেষ শ্রেণীটির বিশ্বাসঘাতকতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে।

নবাবী আমলে প্রতিপত্তিলাভের মধ্য দিয়ে হিন্দু অভিজাতদের ষড়যন্ত্র ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিলো। এটি ছিলো তাদের অতীত আচরণের ধারাবাহিকতা মাত্র। ইতিপূর্বে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমলে বিশেষত ইলিয়াসশাহী সুলতানদের আমলে বর্ণহিন্দুদের হাতেই বাংলার মুসলিম রাজত্ব বিপন্ন হয়েছিলো। রাজা গনেশের ষড়যন্ত্রমূলক অভ্যুত্থানের মুকাবিলায় নূর কুত্ব-উল-আলম ও আশরাফ জাঁহাগীর সিমনানী সময়োচিত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হলে পনেরো শতকের শুরুতেই মুসলিম শাসনের অবসান ঘটতো। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের প্রাক্কালে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণরা বাংলাদেশে মুসলিম শাসন উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র করেছিলো। তারপরও আলাউদ্দীন হোসেন শাহ শ্রীচৈতন্যের সংস্কার আন্দোলনের সহায়তা করেছেন। সে সুযোগের অপব্যবহার করে শ্রীচৈতন্য ও তাঁর শিষ্যরা মুসলিম কাজীর ঘর-বাড়ীতে আগুন দিয়েছেন। রূপ গোঁসাই ও সনাতন গোঁসাই হোসেন শাহ-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হয়ে পালিয়ে গিয়ে চৈতন্যের কাছেই আশ্রয় পেয়েছিলো। দাউদ খান কররানীর উজির শ্রীহরি তাঁর পৃষ্ঠপোষকের সিংহাসনের সবচে বড় বিপদের মুহূর্তটিকে বেছে নিয়েছিলেন বিশ্বাসঘাতকতার পরম সময়-ক্ষণরূপে। নবাবী আমলের সমগ্র কালব্যাপী এই বর্ণহিন্দুশ্রেণীটি একই ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিলো। এ প্রসঙ্গে ডক্টর এম. এ. রহীম মন্তব্য করেছেন ঃ '... হিন্দুরা বাংলাদেশে তাদের সার্বভৌমত্ব হারিয়ে প্রথম থেকেই মুসলমানদের প্রতি মনে মনে শত্রু ভাবাপন্ন থেকে যায়। মুসলমান শাসকদের প্রতি বাহ্যিক আনুগত্য ও অনুরাগ প্রদর্শন করে তারা তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা উন্নত করে তোলে বটে, কিন্তু তারা কখনো এ প্রদেশে তাদের হারানো রাজনৈতিক শক্তি পুনরুদ্ধারের কিংবা মুসলিম রাষ্ট্র বিব্রত করার সুযোগ অবহেলা করেনি।'[২০]

৬. ইংরেজ ও হিন্দু বণিকস্বার্থের আঁতাত

মুরশিদকুলী খাঁর মৃত্যুর পর বাংলার রাজনীতিতে চারদিক থেকে দুর্যোগ ঘনীভূত হয়েছিলো। হিন্দুরা তাদের প্রশাসনিক প্রভাব-প্রতিপত্তিকে মুসলিম শাসন উৎখাতের কাজে লাগাতে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলো। তাদের এ গোপন মুসলিম বিদ্বেষ ও

১৯. আর. ওর্ম ঃ মিলিটারী ট্রানজেক অব দি বৃটিশ নেশন ইন বেঙ্গল, পৃঃ ৫৩।
২০. ডক্টর এম. এ. রহীম ঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পৃঃ ৪৭৬।

www.nagorikpathagar.org

ষড়যন্ত্রমূলক অভিসন্ধি ইংরেজরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলো। তাই তারা তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য হাসিলের জন্য হিন্দুদেরকে নির্ভরযোগ্য হাতিয়াররূপে বেছে নেয়।

বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংরেজ বণিকরা সম্রাট শাহজাহানের শাসনামল থেকেই বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থায় ছিলো। ১৬৫১ সালে বাংলার সুবাহদার শাহজাদা সুজা জেব্রাইল ব্রাউটন নামক একজন ইংরেজ চিকিৎসকের চিকিৎসায় খুশী হয়ে মাত্র তিন হাজার টাকার বার্ষিক করের বিনিময়ে ইংরেজদেরকে এ সুবাহর সর্বত্র অবাধ বাণিজ্যের অধিকার প্রদান করেন।[২১]

এই বিরাট সুবিধা লাভ করে ইংরেজ বণিকরা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বন্দর ও শহরগুলিতে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে একটি সমৃদ্ধ বণিক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিলো। ইংরেজদেরকে প্রদত্ত এই বিশেষ সুবিধা এদেশের ব্যবসায়ীদের স্বার্থের পরিপন্থী এবং রাজকোষের শুল্কের জন্য ক্ষতিকর ছিলো। এ কারণে সম্রাট আওরঙ্গযীব তা রহিত করেন। ইংরেজ বণিকরা সুবাহদার শায়েস্তা খানের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। শায়েস্তা খান তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশ থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করেন। এ অবস্থায় ইংরেজরা ক্ষমা ভিক্ষা করে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থের ভরাডুবি রোধ করে। এরপর ১৭১২ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট ফররুখ শিয়র হ্যামিল্টন নামক এক ইংরেজ চিকিৎসকের সেবায় খুশী হয়ে তাঁর বিশেষ অনুরোধে ইংরেজদেরকে পনুরায় মাত্র তিন হাজার টাকা বার্ষিক শুল্কের বিনিময়ে বাংলায় অবাধ বাণিজ্য করার অধিকার দান করেন। এর ফলে ইংরেজদের অবস্থার দ্রুত উন্নতি হয়।

বাণিজ্যিক ঐশ্বর্যের বলে ইংরেজ বণিকরা বাংলায় রাজনৈতিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়। ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে তারা হিন্দু ব্যবসায়ীদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসে। এই ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে তারা মুসলিম শাসকদের ব্যাপারে হিন্দুদের মনোভাব সম্পর্কেও ধারণা লাভ করে। হিন্দু শেঠ ও বেনিয়াশ্রেণীটি প্রায় একশ বছর ধরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ট ও কন্ট্রাক্টররূপে কাজ করে। ফলে ইংরেজ ও বর্ণহিন্দুদের অভিন্ন স্বার্থের জানাজানি এই সুদীর্ঘ সময় ধরে সম্পন্ন হয়। এই সংযোগ বর্ণহিন্দু ও ইংরেজদেরকে এক ষড়যন্ত্রমূলক মৈত্রীর পথে এগিয়ে নেয়। ইংরেজ বণিকরা বাণিজ্যের সাথে সাথে রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির সুযোগ খুঁজছিলো। অন্যদিকে জগতশেঠ-মানিকচাঁদগোষ্ঠীর নেতৃত্বে হিন্দু শেঠ-বেনিয়ারাও তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে এবং সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ইংরেজদের শক্তিবৃদ্ধির পক্ষে কাজ করছিলো।

ইংরেজ ও বর্ণহিন্দুদের মধ্যকার এই স্বার্থজোটের বিবরণ দিয়ে এস. সি. হিল লিখেছেন ঃ ব্যবসা ও শিল্প প্রধানত হিন্দুদের হাতে থাকায় স্বভাবতই তাদের সাথে ইউরোপীয় বণিকদের এক প্রকার মৈত্রী গড়ে উঠেছিলো।[২২]

২১. পি. রবার্টস ঃ হিস্টরী অব বৃটিশ ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৩৮; ডক্টর এম. এ. রহীম ঃ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ২৫।
২২. এস. সি. হিল ঃ বেঙ্গল ইন ১৭৫৬-৫৭, ভূমিকা, পৃঃ ২৩, ১০২, ১১৬, ১৫৯; ডক্টর এম. এ. রহীম ঃ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ৫।

www.nagorikpathagar.org

এদেশের হিন্দু ব্যবসায়ীদের সাথে আরো প্রায় ছয় দশক আগে থেকেই ইংরেজদের স্বার্থের যোগসূত্র সৃষ্টি হয়েছিলো। ১৬৯০ সনে জব চার্নক হুগলী নদীর উজান বেয়ে কলকাতায় এসে বাসা বাঁধার সময় থেকেই ইঙ্গ-হিন্দু প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। আঠারো শতকের শুরু থেকে সে সম্পর্ক আরো জোরদার হয়। ১৭৩৬ সন থেকে ১৭৪০ সনের মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক কলকাতায় নিযুক্ত ৫২ জন স্থানীয় ব্যবসায়ীর প্রত্যেকেই ছিলো হিন্দু। ১৭৩৯ সনে কোম্পানী কাশিমবাজারে ২৫ জন ব্যবসায়ী নিযুক্ত করে। তারাও সবাই হিন্দু ছিলো। কেবল ঢাকাতে কোম্পানীর নিয়োগকৃত ১২ জন ব্যবসায়ীর মধ্যে মাত্র দু'জন মুসলমানের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়।

বৃদ্ধ নবাব আলীবর্দী খানের শাসনামলে মারাঠা ও রোহিলাদের দিক থেকে বিপদ দেখা দিলে ইংরেজ ও হিন্দুদের মিলিত শক্তি সে দুর্বলতা পুরোপুরি কাজে লাগায়।

আলীবর্দী খান বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসন ক্ষমতা লাভ করেন ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে। শুরু থেকেই তাঁকে একদিকে মারাঠা, অন্যদিকে রোহিলাদের মুকাবিলা করতে হয়। এ ছাড়া তখনকার বাংলার সালতানাতও রাজনৈতিক দাবাড়ুদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছিলো। এ অবস্থায় নবাব আলীবর্দী খানকে কখনো লড়াই করতে হয়েছে দেশের ভিতরকার বিশ্বাসঘাতক ও ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে, আবার কখনো বাইরের শত্রু মারাঠাদের বিরুদ্ধে। ভিতরের সংকট তীব্র হলে তিনি মারাঠাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতেন। আবার চুক্তি ভঙ্গকারী মারাঠারা সীমান্তে হানা দিলে দেশের ভিতরকার পরাজিত বিশ্বাসঘাতকদের নির্মূল করার বদলে তাদের সাথেই আপোস-রফা করতেন।

আলীবর্দী খান শাসন কাজে দক্ষ ছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে রাখতে অনেকটা সক্ষম হয়েছিলেন। তবে তিনি তাঁর শাসনামলের পুরোটা সময় প্রবল প্রতিকূল পরিস্থিতি মুকাবিলা করেছেন। এই প্রচন্ড চাপের মধ্যেও ইংরেজদেরকে তিনি দুর্গ বা আত্মরক্ষামূলক চৌকি নির্মাণের অনুমতি দেননি। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী শাসক। সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা তাঁর ছিলো। তা সত্ত্বেও তিনি দেশের আযাদীর অনিষ্ট-আশংকার মূলোচ্ছেদ করতে পারেননি। ফলে দেশের রাজনৈতিক অংগনে বিদ্যমান বিভেদ ও বিশৃংখলা এবং মারাঠা ও শিখদের উত্থানের পটভূমিতে ক্ষাত্রশক্তিহীন, কূটচালে অভ্যস্ত, জাগরণকামী হিন্দু বেনিয়া ও শেঠদের লোভ, ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা ইংরেজদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এই বিশৃংখল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা সাম্রাজ্য গড়ার রাজনীতিতে হাত বাড়াতে শুরু করে।

বাংলার তখনকার রাজনীতি জনমতের ওপর নির্ভরশীল ছিলো না। বাইরের ডামাডোল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, স্বনির্ভর ও আবদ্ধ গ্রামীণ সমাজে শান্তিপূর্ণ জীবন

www.nagorikpathagar.org

যাপনকারী কৃষি ও তাঁত-নির্ভর সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক চেতনার দিক দিয়ে ছিলো অনগ্রসর। উঁচু তলার সামাজিক ও রাজনৈতিক সংযোগ থেকে তারা ছিলো বিচ্ছিন্ন। বাইরের বিপদের মুকাবিলায় দেশের জনগণের দেশরক্ষামূলক চেতনা শানিত করা এবং ভিতরের বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে জাতির প্রতিরোধ শক্তি জাগ্রত করা ছিলো তখনকার সময়ের অনিবার্য দাবী। আলীবর্দী খানের পক্ষে তা সম্ভব হলে বাংলার ইতিহাস ভিন্নভাবে লেখা হতো।

বিদেশী ইংরেজ ও এদেশী বেনিয়া-শেঠরা নবাবদের সব ক'টি দুর্বলতা কাজে লাগানোর সুযোগ খুঁজছিলো। নবাব আলীবর্দী খান বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকার প্রশ্নে বিরোধের আশংকা ছিলো স্পষ্ট। সে বিরোধের সুযোগ কাজে লাগাতে ইংরেজরা সচেষ্ট ছিলো। হিন্দু অভিজাত ও সাধারণ হিন্দু প্রজাদের সমর্থন নিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য তারা সামরিক শক্তি বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হয়। এ উদ্দেশ্যে তারা আলীবর্দী খানের শাসনামলের একেবারে শেষের দিকে ১৭৫৪ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম নামে একটি দুর্গ নির্মাণ করে। কলকাতায় ইংরেজদের জমিদারী ছিলো। তারা কলকাতার সকল অধিবাসীর ওপর নিজেদের সার্বভৌম কর্তৃত্ব দাবি করতে থাকে। নবাব আলীবর্দী খান এ ব্যাপারে ইংরেজ বণিকদের নিকট একটি পরওয়ানা প্রেরণ করেন। ইংরেজরা নবাবের দূতের সাথে দুর্ব্যবহার করে। নবাবের কাছে অশিষ্ট ভাষায় একটি পত্র লিখে তারা তাদের দাবির বিষয় ব্যাখ্যা করে।[২৩]

এটি ছিলো আলীবর্দী খানের জীবনের একেবারেই শেষ সময়। এ ঘটনার অল্পদিন পরই তাঁর মৃত্যু হয়। এ কারণে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেননি। নবাব আলীবর্দী খানের বিভিন্নমুখী বিপদের পটভূমিতে ইংরেজরা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব এবং হিন্দুদের সহযোগিতা লাভের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েই নবাবের আদেশ অমান্য করতে সাহসী হয়ে উঠেছিলো। তার প্রমাণ সমসাময়িক ইংরেজদের বিভিন্ন বিবরণে পাওয়া যায়। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম-এর পরিকল্পনাকারী ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল স্কটের সেক্রেটারী ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল স্কটের সেক্রেটারী এফ, নোবল সেন্ট জর্জ দুর্গের সিলেক্ট কমিটির কাছে ১৭৫৬ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর একটি পত্র লিখেন। তাতে মুসলিম শাসন ধ্বংসের ইঙ্গ-হিন্দু মিলিত ষড়যন্ত্রের বিষয়টি খোলাখুলিভাবে জানা যায়। F. Noble তাঁর চিঠিতে লিখেছেন ঃ

'Colonel Scott understood that on the death of the old Nabob (Nawab) there would be a dispute for the crown between the gentlemen, his nephews and his grandsons, who has already discovered ambitious view. ...Colonel

২৩. সিয়ারুল মুতাখ্‌খিরীন (তরজমা), ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৮, ১৮৯; ব্রিজেন কে. গুপ্ত ঃ সিরাজ-উদ-দৌলাহ এণ্ড দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, পৃঃ ৪০, ৪৮-৫৩।

www.nagorikpathagar.org

Scott observed in Bengal the Jentu rajahs (Hindu Rajas) and (Hindu) inhabitants were very much disaffected to the Moor (Muslim) Govenment, and secretly wished for a change and opportunity of throughing off their tyrannical yoke. And was of opinion that if a European force began succussfully, that they would be inclined to join them if properly applied to and encouraged, but might be cautious how they acted at first until they had a probability of success in bringing about revolution of their advantage.

I look on Omy Chand (Umi Chand) as the man in Bengal the most capable serving us if he has a mind to it... . There is a man named Nimu Gosseyng (Nimu Gosain— নিমু গোসাঁই) the high priest of the Gentus (Hindus), who has a great influence among the Jentu rajahs and with a particular caste of people who go up and down the kingdom well armed in great bodies, of the facuir or religious beggar caste, who might possibly be of service to us if they could be engaged to our interest, which by Nimu Gosseyng's means I have particular reasons to believe might be done.

The priest gave Colonel Scott very good information and advice relating to the affairs of the country and told he could bring 1000 of these men to assist the English in four days warning when needful. the Colonel did him some service while he lived and I dare say he has a respect for his morony to this days.'[২৪]

এস সি হিল উল্লেখ করেন, আলীবর্দী খানের শাসনামলে কর্নেল স্কট নিজেই তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন যে, হিন্দু রাজা ও জমিদাররা মুসলমানদের শাসনে খুবই অসন্তুষ্ট এবং তারা এই শাসন অবসানের সুযোগ তালাশ করছে।[২৫]

৭. জনগণের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা

বাংলার মুসলিম শাসন উৎখাত ও জনগণের আযাদী হরনের এ ইঙ্গ-হিন্দু ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জন-প্রতিরোধের কোন উদ্যোগ বা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। বাংলার তখনকার রাজনীতি জনমতের উপর নির্ভরশীল ছিলো না। বাইরের ঘটনাপ্রবাহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, আবদ্ধ ও স্বনির্ভর গ্রামীণ সমাজে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনকারী, কৃষি ও তাঁত-নির্ভর নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক চেতনার দিক দিয়ে অনগ্রসর ছিলো। উঁচু তলার সামাজিক ও রাজনৈতিক সংযোগ থেকে তারা ছিলো পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। শাসক ও জনগণের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামপ্রচারক আলিমগণ শত শত বছর ধরে যে যোগসূত্র রচনার কাজ করেছেন, ইতিহাসের এই পর্যায়ে সেই গুরুত্বপূর্ণ

২৪. S. C. Hill : Bengal in 1756-1757, Indian Records Series, p-326-328.
২৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩, ১০২, ১১৬, ১৫৯।

www.nagorikpathagar.org

সূত্রটি ছিন্ন হয়ে পড়েছিলো। পনেরো শতকের গনেশের ষড়যন্ত্র ও তাঁর রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে নূর কুত্ব-উল-আলমসহ এ দেশের আলিমগণ যে সম্মিলিত প্রতিরোধ রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এ যুগে তেমন কোন চেষ্টা চোখে পড়ে না। মুসলমানদের বিপর্যয় ও ধ্বংসের এ চরম সময়-সন্ধিক্ষণে বাংলায় তেমন কোন সংগ্রামী আলিম ও সংস্কারকের নামও জানা যায় না।

মুসলমানদের জন্য এটি ছিলো সকল দিক থেকেই একটি বন্ধ্যা সময়। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় হলো, বাংলার মুসলিম শাসনের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলো ইংরেজ শক্তি। এই ইংরেজ জাতি তখন জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, নৈতিক দর্শন, আইন, ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ, প্রকৌশল তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় একটি নতুন প্রভাবশালী ঐতিহ্য নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলো। নতুন নতুন উদ্ভাবক, আবিষ্কারক, গবেষক, দার্শনিক, চিন্তাবিদ, বৈজ্ঞানিক ও অর্থনীতিবিদগণ তখনকার ইউরোপীয় সভ্যতাকে নতুনভাবে নির্মাণ করছিলেন। আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রসার, মুদ্রণযন্ত্রের ব্যবহার, প্রচার-কৌশলের ব্যাপ্তি ও আধুনিক প্রকাশভঙ্গী নিয়ে তাঁরা তাঁদের রচিত বিপুল বইপত্রের মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষের মন-মগজের ওপর আধিপত্য বিস্তার করছিলেন। এ ধরনের একটি নব জাগ্রত জাতির সুশৃংখল, সমর-নিপুণ ও স্বয়ংক্রিয় আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত বাহিনীর মুকাবিলা করার প্রস্তুতি বাংলার শাসকদের ছিলো না

মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (১৯০৩-১৯৭৯) আঠারো শতকের উপমহাদেশীয় মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন ঃ 'যে যুগে আমাদের দেশে শাহ ওয়ালিউল্লাহ, শাহ আবদুল আযীয ও শাহ ইসমাঈল শহীদ জন্মগ্রহণ করেন, সে যুগেই ইউরোপ নব শক্তি ও নব উদ্দীপনা নিয়ে মধ্যযুগের নিদ্রা থেকে জেগে উঠেছিলো। সেখানে জ্ঞান ও শিল্প অনুসন্ধানকারী, উদ্ভাবক ও আবিষ্কারক এতো বিপুল সংখ্যায় জন্মলাভ করেছিলেন যে, তাঁরা সবাই মিলে এই দুনিয়ার চেহারাই পালটিয়ে দেন। এই যুগেই হিউম, কান্ট, ফিশতে (Fichte), হেগেল, কোঁতে, শ্লিয়ার মাশার ও মিল-এর ন্যায় দার্শনিকগণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা তর্কশাস্ত্র, দর্শন, মনস্তত্ত্ব এবং যুক্তিবিদ্যার সমগ্র শাখা-প্রশাখায় বিপ্লব সাধন করেন। এ যুগেই শরীর বিদ্যায় গ্যালভানী ও ভলটা, রসায়ণ শাস্ত্রে ল্যাভয়সিয়র, প্রিসলি, ডেভী ও বার্জিলিয়াস এবং জীববিদ্যায় লিনে, হলার ও বিশাত উল্ফ-এর মতো পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়। তাঁদের গবেষণা শুধু বিজ্ঞানের উন্নতির সহায়ক হয়নি, বরং বিশ্ব জাহান ও মানুষ সম্পর্কে একটি নয়া মতবাদেরও জন্ম দেয়। এ যুগেই কুইসনে, টার্গট, এ্যাডাম স্মিথ ও ম্যালথাসের গবেষণার মাধ্যমে নয়া অর্থনীতি-বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়। এ যুগেই ফ্রান্সে রুশো, ভল্টেয়ার, মন্টিস্কো, ডেনিস দিদেরঁ, লাম্যাটরি, ক্যাবানিস, বাফন ও রবিনেট, ইংল্যান্ডে টমাস পেন, উইলিয়াম, গডউইন, ডেভিড হার্টলে, জোসেফ প্রিসলে ও এরাসমাস ডারউইন এবং জার্মানীতে গ্যেটে, হার্ডার, শিলার, উইঙ্কলম্যান, লিসিং ও হোলবাস এবং আরো অনেক গবেষকের

www.nagorikpathagar.org

জন্ম হয়। তাঁরা নৈতিক দর্শন, সাহিত্য, আইন, ধর্ম, রাজনীতি এবং সমাজবিদ্যার সকল শাখায় বিপুল প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁরা নির্ভীকভাবে প্রাচীন মতবাদ ও চিন্তাধারার কঠোর সমালোচনা করে চিন্তার এক নতুন দুনিয়া সৃষ্টি করেন।

'... সমকালীন ইতিহাসের পাতায় মোটামুটি একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই একথা সহজে পরিস্ফুট হবে যে, আমাদের এখানে মাত্র কতিপয় ব্যক্তি জাগ্রত হন। এখানে জীবনের কেবলমাত্র একদিকে সামান্য একটু কাজ হয়। কিন্তু সেখানে (ইউরোপ) জীবনের প্রতিটি দিকে হাজার গুণ বেশী কার্য সম্পাদিত হয়। বরং জীবনের এমন কোন দিক ছিলো না যেখানে দ্রুত অগ্রগতি সাধিত হয়নি। এখানে শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও তাঁর পুত্রগণ বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রে কতিপয় কিতাব লেখেন। তাঁদের এ কিতাবগুলি অত্যন্ত সীমিত পরিসরে পৌঁছেই আটকে থাকে। আর ইউরোপে প্রতিটি বিষয়ের ওপর বই-পত্র লিখে লাইব্রেরীর পর লাইব্রেরী ভর্তি করা হয়। তাদের বই-পত্র সমগ্র দুনিয়ায় পরিব্যাপ্ত হয়। অবশেষে মানুষের মন-মগজের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। এ দেশে দর্শন, নৈতিকতা, সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রের ভিত্তিতে নয়া বুনিয়াদ স্থাপনের আলোচনা (চর্চা) নেহাত প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে। পরবর্তীকালে তার ওপর আর কোন কাজ হয়নি। আর সেখানে ইত্যবসরে এইসব সমস্যার ওপর পূর্ণাঙ্গ চিন্তাধারা গড়ে ওঠে। এই চিন্তাধারা সমগ্র বিশ্বের চিত্র পরিবর্তিত করে। এখানে শরীরবিদ্যা ও বস্তুশক্তি সম্পর্কিত বিদ্যা পাঁচশ' বছর আগের ন্যায় একই পর্যায়ে অবস্থান করে; আর সেখানে এই ক্ষেত্রে এত বেশী উন্নতি সাধিত হয় এবং সেই উন্নতির কারণে পাশ্চাত্যবাসীদের শক্তি এত বেড়ে যায় যে, তাদের মুকাবিলায় পুরাতন যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণের জোরে সাফল্য লাভ করা একেবারেই অসম্ভব ছিলো।'[২৬]

ইউরোপে পুরাতন যুদ্ধনীতির স্থলে নয়া যুদ্ধনীতি, নয়া যুদ্ধাস্ত্র ও আধুনিক যুদ্ধ পদ্ধতির প্রচলন হয়েছিলো। সৈন্যদের প্রশিক্ষণ ও শৃংখলা ছিলো যে কোন অভিযানের উপযোগী। হালকা ও দ্রুত বহনোপযোগী রাইফেল ও কেল্লা ধ্বংসকারী মেশিনগান তারা করায়ত্ত করেছিলো। এ ছাড়া তাদের নব আবিষ্কৃত কার্তুজের মুকাবিলায় পুরনো পাউডার বন্দুক অকার্যকর ছিলো। নৌশক্তির দিক থেকে বাংলার শাসকগণ অনেক পিছনে ছিলেন। সমুদ্র উপকূলবর্তী ও নদীবহুল বাংলাদেশের প্রতিরক্ষার জন্য শক্তিশালী নৌবহর অপরিহার্য ছিলো। এখানে শক্তিশালী নৌবহর গড়ে তোলার উপকরণগত সুযোগ-সুবিধাও যথেষ্ট ছিলো। আওরঙ্গযীবের শাসনামলেও ইউরোপীয় নৌশক্তি বাংলাদেশের ওপর হুমকি সৃষ্টি করেছিলো। তারপরও এখানে শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তোলা হয়নি। নবাব আলীবর্দী খানও ইংরেজদের নৌশক্তি থেকে বিপদের আভাস পেয়েছিলেন। কিন্তু বার্ধক্যের কারণে এবং মারাঠা হাঙ্গামা ও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকার দরুন তিনি নৌশক্তি গঠনে মনোযোগ দিতে

২৬. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী ঃ ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন, পৃঃ ৯০-৯২।

www.nagorikpathagar.org

পারেন নি।[২৭] নৌবহরের অভাবে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহকে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে অসুবিধায় পড়তে হয়। তিনি ইংরেজদেরকে স্থলযুদ্ধে পরাজিত করে কলকাতা থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। কিন্তু হুগলি নদী থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ইংরেজরা তাদের শক্তিশালী নৌবহরের সাহায্যে মাদ্রাজ থেকে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হুগলী নদীতে প্রবেশ করে কলকাতা পুনর্দখল করতে সক্ষম হয়েছিলো। নৌবহরের অভাবে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ তাদেরকে বাধা দিতে পারেননি।

২৭. জে. এন. সরকার ঃ বেঙ্গল নবাবস, পৃঃ ৫৬।

www.nagorikpathagar.org

একাদশ অধ্যায়

নতুন সংগ্রাম ঃ পলাশী থেকে বক্সার

১. নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ্ ঃ বৈরী পলাশীর নিঃসঙ্গ পথিক

আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর ১৭৫৬ সালে তাঁর তরুণ দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌলাহ নবাবীর মসনদে বসেন। নবাবীর প্রথম দিনটি থেকেই তিনি ইংরেজ বণিক ও তাদের এ দেশীয় কোলাবোরেটর বর্ণহিন্দু শেঠ-বেনিয়া ও একশ্রেণীর রাজ-কর্মচারীর মিলিত ষড়যন্ত্রের ঘেরাটোপে বন্দী ছিলেন। আলীবর্দী খানের এক কন্যা ঘষেটি বেগম ও ক্ষমতালোভী নিকটাত্মীয় সেনাপতি মীর জাফর সিরাজের সিংহাসন লাভ মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা সিরাজের পরিবর্তে আলীবর্দী খানের আরেক দৌহিত্র পুর্ণিয়ার শাসনকর্তা শওকত জঙ্গকে মুরশিদাবাদের সিংহাসনে বসাতে চেয়েছিলেন। ইংরেজ ও হিন্দু শেঠ-বেনিয়ারা নবাবের এই অভ্যন্তরীণ সংকটের ব্যাপারে আগে থেকেই সজাগ ও পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণের জন্য তৈরী ছিলো।[১]

সিরাজ-উদ-দৌলাহর সিংহাসনে আরোহন উপলক্ষে ইংরেজ বণিকরা প্রচলিত রেওয়াজ অনুযায়ী কোনও উপঢৌকন না পাঠিয়ে শুরুতেই নবাবের কর্তৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদান করে। নবাবের অনুমতি ছাড়াই তারা কলকাতা দুর্গের আয়তন বৃদ্ধি করে। উইলিয়াম দুর্গটিকে তারা অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত করে তোলে। এভাবে ইংরেজরা তাদের প্রতিটি আচরণের মাধ্যমে নবাবের কর্তৃত্বের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতে থাকে। তারা বাণিজ্যিক সুবিধা লাভের সনদ 'দস্তকে'রও অপব্যবহার করে। এ সময় জাহাঙ্গীরনগরের (ঢাকা) দীউয়ান রাজা রাজবল্লভ রাজকোষের তিন কোটি ত্রিশ লাখ টাকার তহবিল তসরুফ করেন। আত্মসাতকৃত ধন-সম্পদ ও নিজ পরিবার-পরিজনকে পুত্র কৃষ্ণদাসসহ তিনি কলকাতা দুর্গে ইংরেজদের আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেন। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ কৃষ্ণদাসকে ফেরত দেয়ার জন্য ইংরেজদেরকে নির্দেশ দেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলকাতার গভর্ণর ড্রেক সে আদেশ অমান্য করেন।[২] তিনি নবাবের দূতের সাথেও অসৌজনমূল্যক আচরণ করেন।

ইংরেজদের এ সব আচরণের প্রতিকার করতে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি ১৭৫৬ সালের ৪ঠা জুন ইংরেজদের কাসিমবাজারের

১. পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উদ্ধৃত এফ. নোবলের চিঠি এ সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য দলীল।
২. জে. এন. সরকার ঃ বেঙ্গল নবাবস পৃঃ ৬৩, ডকটর এম. এ. রহীম ঃ বাংলার মুসরমানদের ইতিহাস,পৃ-৭।

www.nagorikpathagar.org

বাণিজ্য কুঠি এবং ২০শে জুন কলকাতার উইলিয়াম দুর্গ অধিকার করেন। বহু ইংরেজ কলকাতা ছেড়ে জাহাজে আশ্রয় নেয়। কিছু ইংরেজ নবাবের হাতে বন্দী হয়। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ এই সফল অভিযান শেষে মানিক চাঁদকে কলকাতার ফৌজদার নিযুক্ত করেন এবং মুরশিদাবাদে ফিরে আসেন। ইংরেজদের শায়েস্তা করার পর তিনি পুর্ণিয়ার শাসনকর্তা শওকত জঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। ১০ই অক্টোবর তিনি শওকত জঙ্গকে পরাজিত ও নিহত করেন। ফলে তাঁর এক বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বী দৃশ্যপট থেকে অপসৃত হন।

কলকাতা থেকে উৎখাত হওয়ার পর ড্রেক ও অন্যান্য ইংরেজ আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। এ দুঃসময়ে উমিদাঁদ, নবকিষাণ, জগতশেঠ ও অন্যান্যরা তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য দিতে এগিয়ে আসেন। কয়েকজন হিন্দু জমিদার ও ব্যবসায়ী পলাতক ইংরেজদেরকে ফুলতায় আশ্রয় দেয় এবং খাদ্য সরবরাহ করে। এস. সি. হিল লিখেছেন যে, ইংরেজরা এই দুর্দিনে হিন্দুদের সাহায্য-সহযোগিতা না পেলে তাদের পক্ষে তখন নবাবের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকতো না।[৩]

হিন্দুদের সাহায্য লাভের ফলে ইংরেজরা কিছুটা অবকাশ পায়। এ সুযোগে রবার্ট ক্লাইভ ও এডমিরাল ওয়াটস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মাদ্রাজ কাউন্সিলের নির্দেশে ১৭৫৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর ভাগিরথী নদীতে প্রবেশ করেন এবং কলকাতা উদ্ধারের জন্য ফুলতার দিকে অগ্রসর হন। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর কলকাতার ফৌজদার মানিক চাঁদ ইংরেজদের এ অগ্রযাত্রার পথে বাধা দেননি, বরং তিনি তাদের সাথে গোপন ষড়যন্ত্রে মিলিত হন। তিনি নিজেকে ইংজেদের একজন বন্ধু বলে প্রকাশ করেন।[৪] অল্প ক'দিন আগেই নবাব সিরাজ ইংরেজদেরকে কলকাতা থেকে বিতাড়নের পর তাঁকে ফৌজদার নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু মানিক চাঁদ তার প্রভুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন ইংরেজদের সাথে। তিনি যুদ্ধ না করে কলকাতা ও হুগলী থেকে পিছু হটে গেলেন। ফলে ক্লাইভ ১৭৫৭ সালের ২রা জানুয়ারী বিনা বাধায় কলকাতা পুনরুদ্ধার করেন। নবাব পুনরায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে ইংরেজরা হুগলী ছেড়ে কলকাতায় আশ্রয় নেয়।

১৭৫৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী নবাবের সাথে ইংরেজদের একটি চুক্তি হয়। এই চুক্তি 'আলীনগর সন্ধি' নামে পরিচিত। এই চুক্তিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে ইংরেজরা আবারও কিছুটা অবকাশ পায়। একমাস পরই তারা চুক্তি ভঙ্গ করে।

নবাবের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ক্লাইভ ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩ শে মার্চ ফরাসীদের চন্দর নগর বাণিজ্য কুঠিতে হামলা করেন। নবাবের হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমার এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সেনাধ্যক্ষ রায় দুর্লভ ও মানিক চাঁদ ইংরেজদেরকে এ অভিযানে কোন বাধা দানের চেষ্টাও করেননি। স্কেফটন লিখেছেন ঃ ইংরেজরা তাদের ষড়যন্ত্রের

৩. এস. সি. হিল ঃ বেঙ্গল ইন ১৭৫৬-১৭৫৭, ভূমিকা, পৃঃ ২৩, ১০২, ১১৬, ১৫৯।
৪. ব্রিজেন কে. গুপ্ত ঃ সিরাজ-উদ-দৌলাহ এণ্ড দি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, পৃ-৯১-৯২।

www.nagorikpathagar.org

অন্যতম প্রধান নায়ক উমিচাঁদের মাধ্যমে নন্দকুমারকে দেড় হাজার টাকা ঘুষ দিয়েছিলো। নন্দকুমার ইংরেজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণেই শুধু বিরতি থাকেননি, তিনি নবাবের অনেক সামরিক তথ্যও ইংরেজদের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন।[৫]

এ সকল ঘটনা ইংরেজদেরকে উৎসাহী করে তোলে। এর মাত্র এক মাস পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কলকাতা কাউন্সিল নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহকে উৎখাত করার জন্য ১৭৫৭ সালের ২৩শে এপ্রিল আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব গ্রহণ করে। নবাবের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র সফল করার কাজে ক্লাইভ উমিচাঁদকে ব্যবহার করেন।[৬] আলীবর্দী খানের সময় থেকেই উমিচাঁদকে সামনে রেখে এই ষড়যন্ত্র এগিয়ে চলছিলো। তার প্রমাণ এফ. নোবলের চিঠিতে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। নবাবের প্রধান সেনাপতি, আলীবর্দী খানের ভগ্নিপতি মীর জাফরকে দেয়া হয় সিংহাসনের টোপ। তিনিও মুসলিম শাসন উৎখাতের এই ইঙ্গ-হিন্দু ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত হন। মুরশিদাবাদের মসনদের প্রতি মীর জাফরের লোভ ছিলো। আলীবর্দী খানের সময়ে কয়েকবার তাঁকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য শাস্তি পেতে হয়েছিলো। এরপর আলীবর্দী খান মীর জাফরকে উড়িষ্যার নায়েব সুবাহদার এবং হুগলী ও মেদিনীপুরের ফৌজদার নিযুক্ত করে তাঁকে মুরশিদাবাদ থেকে দূরে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু হুগলী ও মেদিনীপুরে আলীবর্দী খানের দৃষ্টির বাইরে ইংরেজদের সাথে চক্রান্তে মিলিত হওয়া তাঁর জন্য অনেক সহজ হয়। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর শাসনামলে প্রধান সেনাপতিরূপে মীর জাফরের ভূমিকা আরো মারাত্মক হয়ে ওঠে। সিংহাসনের লোভে তিনি নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজ ও হিন্দু শেঠ-বেনিয়াদের ষড়যন্ত্রে শিখণ্ডীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চক্রান্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হলে জগতশেঠের বাড়ীতে ষড়যন্ত্রকারীদের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জগতশেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ ও রাজবল্লভসহ ষড়যন্ত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ছাড়াও এ বৈঠকে তাদের হাতের নির্বোধ ক্রীড়নক মীর জাফর উপস্থিত ছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধিরূপে এডমিরাল ওয়াটস মহিলার মতো পর্দা-ঘেরা পালকিতে চরে জগতশেঠের বাড়ীর এ বৈঠকে উপস্থিত হন। এ বৈঠকেই সিরাজ-উদ-দৌলাহকে সরিয়ে মীর জাফরকে বাংলার মসনদে বসানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এডমিরাল ওয়াটস সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করার এই চক্রান্ত বাস্তবায়নে ইংজেদের পক্ষ থেকে সব ধরনের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর কোম্পানীর প্রধানগণ চুক্তিপত্রের খসড়া তৈরী করেন। ১৭৫৭ সালের ১৯ মে তাঁরা সে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। দেশ বিক্রয়ের এ দলীলে মীর জাফর স্বাক্ষর করেন ৪ঠা জুন তারিখে।[৭] এই চুক্তির শর্ত মোতাবেক মীর জাফর ইংরেজদেরকে কয়েকটি বাণিজ্য সুবিধা প্রদান, ইংরেজ সৈন্যদের ব্যয়ভার বহন এবং

৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৬।
৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৬।
৭. এস. সি. হিল ঃ বেঙ্গল ইন ১৭৫৬-৫৭, ভূমিকা পৃঃ ১০২, ১১৬, ১৫৯।

www.nagorikpathagar.org

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দুই কোটি টাকা দিতে সম্মত হন। এ ছাড়া মীরজাফরের নবাবী কোষাগার থেকে উমিচাঁদকে কুড়ি লাখ টাকা এবং রায় দুর্লভকে লুটের মালের কিয়দংশ দেওয়ার কথা চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়। উমিচাঁদকে প্রতারিত করার জন্য ক্লাইভ চুক্তিপত্রের দু'টি খসড়া তৈরি করেন। আসল খসড়ায় উমিচাঁদকে টাকা দেওয়ার শর্তের উল্লেখ ছিলো না।[৮]

এ গোপন চুক্তি সম্পাদনের পর ক্লাইভ ইংরেজ সেনাদল নিয়ে মুরশিদাবাদের দিকে অগ্রসর হন। ক্লাইভের অভিযানের খবর পেয়ে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের বিরাট বাহিনী নিয়ে মুরশিদাবাদ থেকে রওনা হন। ২২শে জুন তিনি পলাশীতে পৌঁছেন এবং আমবাগানে সৈন্য সমাবেশ করেন। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন সকালে নবাবের সৈন্যদের সাথে ইংরেজদের যুদ্ধ শুরু হয়। মীরজাফর, রায় দুর্লভ ও আরো কয়েকজন সেনানায়ক দুই মাইল দূর থেকে এ যুদ্ধে দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। অন্যদিকে নবাবের বিশ্বস্ত সেনানায়ক মোহনলাল ও মীর মর্দানের প্রচণ্ড হামলার মুখে ক্লাইভের সৈন্যরা পিছু হটে আমবাগানের আড়ালে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। মোহনলাল ও মীর মর্দান তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করতে অগ্রসর হন। এ সময় একটি বিক্ষিপ্ত গুলীর আঘাতে মীর মর্দান নিহত হন। কিন্তু মোহনলাল ও অপর কয়েকজন সেনানায়কের প্রচণ্ড আক্রমণে ক্লাইভের সৈন্যদের অবস্থা সংকটজনক হয়ে পড়ে।

মীর মর্দানের মৃত্যুর পরপরই নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ মীর জাফরকে ডেকে পাঠান। মীর জাফর পরের দিন সকল সৈন্য নিয়ে একযোগে ইংরেজদের ওপর হামলা করার ওয়াদা করেন। মীর জাফর সে দিনের মতো যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য নবাবকে বারবার পরামর্শ দিতে থাকেন। মীর জাফরের পরামর্শে মোহনলালকে বিজয়ের মুখে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরিয়ে আনা হয়।

মোহনলালের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ অবস্থায় ফিরে আসার সময় ক্লাইভ তাঁর সৈন্যদের নিয়ে আশ্রয়স্থল থেকে বেরিয়ে এসে অতর্কিতে হামলা চালান। এই আকস্মিক হামলার মুখে নবাবের সৈন্যরা এদিক-ওদিক পালাতে থাকে। মীর জাফর এই সুযোগে তাঁর সৈন্যদের নিয়ে ক্লাইভের সাথে যোগ দেন। এভাবে ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে নবাব-বাহিনীর নিশ্চিত বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়।

এ যুদ্ধ প্রহসনের মধ্য দিয়ে পলাশীর প্রান্তরে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়। মাত্র সতেরো জন দৃঢ়চেতা, সাহসী, সংগ্রামী, স্থির-প্রতিজ্ঞ যোদ্ধা নিয়ে যে বাংলায় ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেছিলেন, সাড়ে পাঁচ'শ বছর পর ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার মুখে সে শাসন ব্যবস্থা ধ্বংস হয়। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী অস্তিত্ববিনাশের সে ঘটনায় কার্যত দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

৮. ব্রিজেন কে. গুপ্ত ঃ সিরাজ-উদ-দৌলাহ এণ্ড দি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, পৃঃ ১১৯।

www.nagorikpathagar.org

পলাশী যুদ্ধে চক্রান্তপূর্ণ বিজয় সম্পর্কে রবার্ট ক্লাইভ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেনঃ 'সেদিন স্থানীয় অধিবাসীরা ইউরোপীয়দের প্রতিরোধ করতে চাইলে লাঠি-সোটা আর ঢিল মেরেই ইংরেজদের খতম করে দিতে পাররতো।'

বাংলার জনগণ সেদিন ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়নি। কারণ তারা রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন ছিলো। শাসকদের কাজকর্ম জনগণের জন্য কল্যাণকর হওয়াই যথেষ্ট নয়। তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন রাখলে দেশের সংকটকালে সে অসংগঠিত জনগণ তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে না। পলাশীর ইতিহাস থেকে সে শিক্ষাই পাওয়া যায়।

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ্ পলাশী থেকে মুরশিদাবাদে ফিরে গিয়ে ক্লাইভ ও মীর জাফরকে বাধাদানের উদ্দেশ্যে সৈন্য সংগঠিত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরে তিনি বেগম লুৎফ-উন-নিসা ও কন্যাকে সাথে নিয়ে রাজমহলের দিকে যাত্রা করেন। তিনি আযিমাবাদে তাঁর নায়েব-নাযিম রাম নারায়ণের সাথে মিলিত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাজমহলের কাছে মীর জাফরের জামাতা মীর কাসিমের হাতে তিনি ধরা পড়েন। তাঁকে মুরশিদাবাদে নেওয়া হয়। সেখানেই মীর জাফরের পুত্র মীরনের আদেশে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ তাঁর পিতা জৈন-উদ-দীন কর্তৃক প্রতিপালিত মোহাম্মদী বেগের হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়।

২. নবাব মীর জাফর ঃ 'ক্লাইভের গাধা'

১৭৫৭ সালের ২৯ শে জুন পরাধীন দেশের পুতুল নবাবরূপে সিংহাসনে বসেন মীর জাফর আলী খাঁ। দেশের আসল মালিকানা তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে। বাংলার শাসন ও সামরিক বিষয়াদির কলকাঠি তাদেরই নিয়ন্ত্রণে। মীর জাফর মুগলদের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের নামমাত্র প্রতীক হিসাবে রইলেন। শাসন সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে ক্লাইভ ও কোম্পানির অন্যান্য কর্মকর্তার হুকুম তামিল করাই হলো নবাবের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। মসনদ রক্ষার জন্য তাঁকে নির্ভর করতে হতো ইংরেজদের সেনাবাহিনী ও সমরশক্তির ওপর।

মীর জাফর সকল দিক থেকেই ইংরেজদের হাতে অপমানজনক বশ্যতায় আবদ্ধ ছিলেন। এ কারণে তিনি দরবারী ও জনগণের কাছে পরিচিত হলেন 'ক্লাইভের গাধা' নামে। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক গোলাম হোসাইন তাবাতাবাই একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। মীর্যা শামসউদ্দীন নামে মীর জাফরের এক সভাসদ ছিলেন। উক্ত শামসউদ্দীন নাকি ক্লাইভের সাথে অসম্মানজনক ব্যবহার করেছেন, এই অভিযোগ পেয়ে মীর জাফর তার কৈফিয়ত চাইলেন। শামসউদ্দীন মীরজাফরকে জবাব দিলেন, 'আমি কর্নেল ক্লাইভের গাধাকে (মীর জাফরকে) তিনবার কুর্নিশ না করে সকালে খাদ্যস্পর্শ করি না, আর সেই আমি কি-না খোদ

www.nagorikpathagar.org

কর্নেলকে অপমান করবো!'[৯] পুতুল নবাব মীর জাফরকে তাঁর সভাসদ ও কর্মচারীরা কিরূপ অবজ্ঞার চোখে দেখতেন, এ কাহিনী থেকে তা বোঝা যায়। জনসাধারণের কাছে মীর জাফর নামটি সে আমল থেকেই ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীকরূপে পরিগণিত হতে থাকে।

মীর জাফর তাঁর ইংরেজ প্রভুদের খুশী করার জন্য বহু টাকাকড়ি ঘুষ দিতে বাধ্য হন। কোম্পানীর ছয়জন কর্মচারীকে তিনি দেড় লাখ পাউণ্ড স্টার্লিং প্রদান করেন। তাঁর কাছ থেকে কর্নেল ক্লাইভ দুই লাখ চৌত্রিশ হাজার পাউন্ড এবং কলকাতা কাউন্সিলের সদস্যরা প্রত্যেকে পঞ্চাশ হাজার থেকে আশি হাজার পাউন্ড পর্যন্ত আদায় করেন।[১০] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ও কলকাতার অধিবাসীদের ক্ষতিপূরণ এবং সৈন্য ও নৌবহরের ব্যয়-বাবদ কোম্পানী মীর জাফরের কাছ থেকে পঁচিশ লাখ একত্রিশ হাজার পাউন্ড আদায় করে। এ ছাড়া মীরজাফর ইংরেজদেরকে উপঢৌকন হিসাবে ছয় লাখ ষাট হাজার তিন'শ পঁচাত্তর পাউণ্ড প্রদান করেন। কর্নেল ক্লাইভকে ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি দক্ষিণ কলিকাতার জায়গীর দান করেন। এর বার্ষিক আয় ছিলো চৌত্রিশ হাজার পাঁচ'শ সাতষট্টি পাউণ্ড। এক হিসাবে দেখা যায়, ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইংরেজরা নবাবীর লোভ দেখিয়ে মীরজাফর ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে একুশ লাখ ঊনসত্তুর হাজার ছয়শত পঁয়ষট্টি পাউন্ড ঘুষ গ্রহণ করে। আর এ সময়ের মধ্যে নবাবদের কাছ থেকে কোম্পানীর মোট আদায়ের পরিমাণ ছিলো এক কোটি সাত লাখ একত্রিশ হাজার সাতশ তিরাশি পাউণ্ড।[১১]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা এভাবে বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ইংল্যান্ডে পাচার করে। ক্লাইভের বিরুদ্ধে বৃটিশ পার্লামেন্টে উৎকোচ ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে তিনি তাঁর আচরণের জন্য বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা দুঃখিত না হয়ে নিজ কৃতকর্ম সমর্থন করেন। বাংলার বিপুল লুণ্ঠনক্ষেত্র সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ 'পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর আমার যে অবস্থা হয়েছিলো তা আপনারা বিবেচনা করুন। একজন বড় রাজার ভাগ্য আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। একটি সমৃদ্ধ নগর আমার দয়ার প্রতীক্ষায় আছে। আমার মুখের সামান্য হাসিতে কৃতার্থ হওয়ার জন্য ধনী মহাজনরা একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করছে। আমার দুই পার্শ্বে স্বর্ণ আর মণি-মুক্তায় পরিপূর্ণ সিন্দুকের সারি। আর এ সব কিছুই খোলা হয়েছে কেবলমাত্র আমারই জন্য। মান্যবর সভাপতি! এই মুহূর্তে আমি নিজেই ভেবে অবাক হয়ে যাই, কিভাবে তখন আমি এই অবস্থার মধ্যে নিজকে এতটা সংযত রাখতে পেরেছিলাম।'[১২]

৯. গোলাম হোসাইন তাবাতাবাই ঃ সিয়ারুল মুতাখ্‌খিরীন, পৃঃ ৪৪৮।
১০. ব্রিজেন কে. গুপ্ত ঃ সিরাজ-উদ-দৌলাহ এন্ড দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, পৃঃ ১২৬-২৭।
১১. পূর্বোক্ত।
১২. এ. আর মল্লিক ঃ বৃটিশ পলিসি এন্ড দি মুসলিমস ইন বেঙ্গল, ১৭৫৭-১৮৫৬, পৃঃ ৩১।

www.nagorikpathagar.org

৩. গণ-বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ ও খাদিম হোসেন

ইংরেজদেরকে ক্রমাগত মূল্যবান উপঢৌকন ও ঘুষ দেয়ার ফলে মীর জাফরের রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। কর্মচারী ও সৈন্যদের বেতন দিতে তিনি অসমর্থ হন। ইংরেজদের পৌনপুনিক টাকার দাবি মিটাতেও ব্যর্থ হন তিনি। দেশের বিভিন্ন স্থানে এ সময় মীর জাফরী শাসনের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দেয়। পুর্ণিয়ায় শাসনকর্তা খাদিম হোসেন ইংরেজ বিতাড়নের সংকল্প ঘোষণা করেন। মীর জাফর খাদিম হোসেনকে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করার নির্দেশ দেন। কিন্তু খাদিম হোসেন তা মানতে অস্বীকার করেন। ইংরেজ সেনাপতি ক্যাপ্টেন নক্স ও মীর জাফরের পুত্র মীরন দুই দল সৈন্যসহ পুর্ণিয়ায় অভিযান চালায়। খাদিম হোসেন এই বিরাট বাহিনীর মুকাবিলায় সক্ষম ছিলেন না। তাই তিন ধন-রত্নসহ উত্তর দিকে পলায়ন করেন।[১৩]

পলাশীর ভাগ্য বিপর্যয়ের পর আলীবর্দী খান ও সিরাজ-উদ-দৌলাহর পরিবারের প্রতি মীর জাফর ও তাঁর পুত্র মীরনের নিষ্ঠুর আচরণ জনমনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলো। মীর জাফর ও মীরনের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার কথা জে. ই ওয়েবস্টার তাঁর টিপারা ডিস্ট্রিকট গেজেটিয়ারে উল্লেখ করেছেন। সিরাজের ১৫ বছর বয়স্ক সহোদর মীর্যা মেহেদীকে কারারুদ্ধ অবস্থায় নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। এ নিষ্ঠুরতা থেকে নবাব পরিবারের বেগমগণও রেহাই পাননি। সিরাজের বেগম লুৎফ-উন-নিসা, তাঁর চার বছর বয়স্কা কন্যা, মাতা আমিনা, মাতামহী ও আলীবর্দীর স্ত্রী বেগম শরীফ-উন-নিসা এবং অন্যান্য মহিলাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। আলীবর্দীর জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘষেটি বেগম সিরাজের বিরুদ্ধে মীর জাফরকে প্রচুর অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। এই ঘষেটি বেগমও মীর জাফরের নির্মমতা থেকে রেহাই পাননি।

নবাব পরিবারের মহিলাদের দুর্গতির কথা উল্লেখ করে গোলাম হোসাইন তাবাতাবাই তাঁর 'সিয়ারুল মুতাখিরীন' নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'মীর জাফর রাজবংশের মহিলাদের বন্দী করে রাখেন। পরে একটি নৌকায় বোঝাই করে তাঁদেরকে জাহাঙ্গীর নগরের (ঢাকা) কারাগারে পাঠিয়ে দেন। (১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এ ঘটনা ঘটে।) তাঁর মাথার ওপর এ সময় একটি কালোমেঘ ঘনিয়ে আসছিলো। নির্বিঘ্ন হওয়ার জন্য তিনি সন্দেহজনক সব কিছু সরিয়ে দেন।'

১৭৬০ সালের জুন মাসে মীরন তাঁর এক অনুচরকে জাহাঙ্গীর নগরে পাঠান। তার নির্দেশে উক্ত অনুচর ঘষেটি বেগম ও আমিনা বেগমকে মুরশিদাবাদে আনার নাম করে নৌকায় তুলে নেয়। পথে নৌকা ডুবিয়ে আলীবর্দী খানের এই দুই কন্যাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। তাবাতাবাই উল্লেখ করেন যে, আলীবর্দীর কন্যাদের ওপর এই চরম নিষ্ঠুরতার মাত্র একসপ্তাহ পর আযিমাবাদে (পাটনা) বজ্রাঘাতে মীরনের মৃত্যু হয়। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহর হত্যাকারী মুহাম্মদী বেগও উন্মাদ অবস্থায় কূপে ঝাপিয়ে

১৩. আবু জাফর ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, পৃঃ ১৫।

www.nagorikpathagar.org

পড়ে আত্মহত্যা করেছিলো।

মীরনের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে ইংরেজদের ও মীর জাফরের বিরুদ্ধে প্রথম গণবিক্ষোভের প্রকাশ ঘটে। মীরনের মৃত্যুর কথা শুনার পরপরই বিরাট এক জনতা জোরপূর্বক রাজপ্রাসাদে ঢুকে মূল্যবান জিনিসপত্র ভেঙ্গেচুরে তছনছ করে। তারা মীর জাফর ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে ধ্বনি দেয় ও গালিগালাজ করে।

৪. মীর কাসিমের প্রতিরোধ সংগ্রাম

ইংরেজ ও হিন্দু বেনিয়াদের শিখণ্ডীরূপে কাজ করতে গিয়ে দেশের যে সর্বনাশ মীর জাফর করেছেন, সে সম্পর্কে ইতিমধ্যেই তাঁর অনুশোচনা শুরু হয়েছিলো। কিন্তু সে মহা ভুল শোধরানোর কোন পথ তখন তাঁর সামনে আর খোলা ছিলো না। মীর জাফর ইংরেজদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য ওলন্দাজ বণিকদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তাঁর সে ষড়যন্ত্রও ব্যর্থ হয়। ইংরেজদের পৌনপুনিক টাকার দাবি পূরণে ব্যর্থ হচ্ছিলেন তিনি। এ পরিস্থিতিতে গণ-বিদ্রোহের আশংকা এবং ওলন্দাজদের সাথে তাঁর ষড়যন্ত্রের পটভূমিতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কলকাতা কাউন্সিল বাংলার মসনদে তাদের নতুন শিখণ্ডীরূপে মীর জাফরের জামাতা মীর কাসিমকে বসানোর সিদ্ধান্ত নেয়। মীর কাসিম সিংহাসনের 'মূল্য' বাবদ ২৯ লাখ টাকা কাউন্সিলের সদস্যদের ঘুষ দেওয়ার ওয়াদা করেন। মীর জাফরের কাছে ইংরেজদের যে টাকার দাবি অপূর্ণ ছিলো তার পরিবর্তে মীর কাসিম ইংরেজদেরকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা অর্পণ করেন। এরপর কর্ণেল ক্যালাডের পরিচালনাধীনে একদল ইংরেজ সৈন্য মুরশিদাবাদে পৌঁছে মীর জাফরের প্রাসাদ ঘিরে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে আহবান জানায়। মীর জাফর নির্বিবাদে সে হুকুম তামিল করেন। তাঁকে সেখান থেকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

মীর কাসিম ১৭৬০ সালের অক্টোবর মাসে নবাবীর মসনদে বসেন। গোড়াতে তিনি ছিলেন মীর জাফরের ষড়যন্ত্রের ভাগিদার। কিন্তু শীঘ্রই তিনি ইংরেজদের মতলব উপলব্ধি করে সচেতন হয়েছিলেন। সিংহাসনে বসার পরই তিনি পুতুল নবাবীর পরিবর্তে সত্যিকারের নবাবরূপে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেন। দেশের হৃত স্বাধীনতা ও নবাবের শাসন ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ষড়যন্ত্রকারী হিন্দু কর্মচারী, জমিদার ও ব্যবসায়ীদের অবাধ্যতায় তিনি অতিষ্ঠ ছিলেন। তিনি আযিমাবাদের নায়েব-নাযিম রামনারায়ণ, গুপ্ত পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা রাজা মুরলীধর এবং রাজবল্লভ, জগতশেঠ ও অন্যান্যকে গ্রেফতার করেন। ইংজেদের সাথে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে রামনারায়ণ, রাজবল্লভ, উমেদ রায়, জগতশেঠ এবং আরো কয়েকজনকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়।[১৪] জগতশেঠ ও রায়দুর্লভকে মীর কাসিম মুঙ্গের

১৪. সিয়ারুল মুতাখ্‌খিরীন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০৪, রিয়াজ-উস-সালাতীন (তরজমা), পৃঃ ৮২।

www.nagorikpathagar.org

দুর্গের চূড়া থেকে বস্তায় ভর্তি করে গঙ্গা নদীতে নিক্ষেপ করেন।

ইংরেজদের প্রভাব থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য মীর কাসিম তাঁর রাজধানী মুরশিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তর করেন। সর্বোপরি তিনি ইংরেজদের বিনা শুল্কে বেআইনী ব্যবসা নিষিদ্ধ করেন। দস্তকের অপব্যবহার রোধের উদ্দেশ্যে তিনি আদেশ জারি করেন। মীর কাসিমের এই পদক্ষেপ দেশী ব্যবসায়ী ও দেশীয় শিল্পের অস্তিত্বের জন্য অত্যাবশকীয় ছিলো। শুল্ক-মুক্ত বাণিজ্যের বিশেষ সুবিভাভোগী ইংরেজ ব্যবসায়ীদের মুকাবিলায় দেশীয় ব্যবসায়ীরা অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন ছিলো। মীর কাসিম তাদেরকে সে অবস্থা থেকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা নেন। ইংরেজ কোম্পানী তাদের বিশেষ সুবিধা বাতিল হওয়ার দরুন ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়। এ অবস্থায় মীর কাসিম দেশী-বিদেশী সকল ব্যবসায়ীর জন্যই বাণিজ্যশুল্ক রহিত করেন। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংরেজ বণিকদের একচেটিয়া বিশেষ সুবিধা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়। ইংরেজরা ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় দেশীয় ব্যবসায়ীদের সাথে একই সমতলে নেমে আসে।

মীর কাসিমের সব ক'টি পদক্ষেপই ইংরেজদের বিশেষ বণিক-স্বার্থের প্রতিকূল ছিলো। বস্তুত মীর কাসিমকে ক্ষমতায় বসানোর সাথে সাথেই ইংরেজরা বুঝেছিলো যে, নতুন নবাব তাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথে এক বিরাট বাধা। তাই তারা তাকে অপসারণের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ইংরেজদের বিভিন্ন কার্যকলাপে এই ষড়যন্ত্রমূলক মনোভাব প্রকাশ হয়ে পড়ে। মীর কাসিম তাদের সাথে আলোচনা শুরু করেন। কিন্তু এ আলোচনা শেষ হওয়ার আগেই সেনাপতি এলিসের নেতৃত্বে ইংরেজরা পাটনা দখল করে সেখানে লুঠতরাজ ও বহু লোককে হত্যা করে। ইংরেজরা পাটনার জনসাধারণের ওপর যে নৃশংস অত্যাচার চালায় সে সম্পর্কে প্রায় এক'শ কুড়ি বছর পর কর্নেল ম্যালেসন লিখেছেন ঃ 'The cheek of every honest Englishman must burn with shame as he reads the account of the policy adopted by the leading men amongst his countrymen in India, a hundred and twenty years ago, towards the native ruler who had bought from the Calcutta Council his position and whose only subsequent fault in their eyes was his endeavour to protect his subjects from European extortion.'

মীর কাসিম পাটনা পুনরুদ্ধারের জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। নবাবের বাহিনীর আগমনের কথা জানতে পেরে ইংরেজরা অযোধ্যার দিকে পালিয়ে যায়। পথে মাঞ্জি নামক স্থানে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজ সেনাদল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। লুঠতরাজ ও নরহত্যার অপরাধে বন্দী ইংরেজ সৈন্যদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয়। এই যুদ্ধ সম্পর্কে ১৭৬৩ সালের ২৮শে জুন মীর কাসিম কলকাতার ইংরেজ গভর্ণরকে একটি ব্যঙ্গ-পত্র লিখেন। তাতে তিনি বলেন ঃ 'মি. এলিস আমার প্রাণের দুশমন, এটাই এতোকাল আমার ধারণা ছিলো। কিন্তু তাঁর কাজ-কারবার দেখে মনে

www.nagorikpathagar.org

হয় তিনি আমার প্রকৃত বন্ধু। আপনাদের বেআইনী চালানের তিন'শ বন্দুক আমি আটক করেছিলাম। তার একটিও আপনারা আমাকে দিতে রাযী হননি। কিন্তু আমার প্রতি ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ হতভাগ্য এলিস একটা অহেতুক সংঘর্ষ বাঁধিয়ে পরাজিত ইংরেজ সৈন্যদের বন্দুক, কামান এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা আমাকে উপকৃত করেছেন। আপনারা তাঁর ওপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন, আমার সৈন্যরা তাকে সে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে।... বন্ধুগণ! আপনারা সত্যিই এক আজব চীজ। যিশু খ্রীস্টের নামে শপথ করে আপনারা আমার সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। আপনাদের সৈন্যদের বেতন দেওয়ার জন্য আমার কাছ থেকে একটা বিরাট এলাকাও নিয়ে গেলেন। কথা ছিলো, এরা আমারই স্বার্থের অনুকূলে কাজ করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে আমার ধ্বংসের জন্যই তারা নিয়োজিত রয়েছে। এরা ইতিমধ্যেই আমার যথেষ্ট ক্ষতি করেছে। সুতরাং আমি আশা করি উক্ত এলাকার তিন বছরের খাজনাটা আপনারা আমার সরকারে দাখিল করে দেবেন। এ ছাড়া গত কয়েক বছর পর্যন্ত ইংরেজ গোমস্তারা আমার দেশবাসীর ওপর যে অত্যাচার করেছে এবং অন্যায়ভাবে তাদের কাছ থেকে যে অর্থ আদায় করেছে তার ক্ষতিপূরণও আপনারা আমাকে দিবেন। একই সাথে বর্ধমান ও অন্যান্য স্থান আমাকে ফেরত দিবেন।'

ইংরেজরা মীর কাসিমের দেশপ্রেমমূলক পদক্ষেপগুলি নস্যাত করার জন্য তাঁকে অপসারিত করে পুনরায় নির্বাসিত মীর জাফরকে ক্ষমতায় বসানোর ষড়যন্ত্র করে। মীর জাফর তাঁর বিশ্বাসঘাতক চরিত্রের পুনপ্রকাশ ঘটাতে আবার বাংলার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন। তিনি তাঁর তিন বছরের নির্বাসিত জীবন এবং দেশবাসীর প্রতি ন্যূনতম কর্তব্যের কথা ভুলে ইংরেজদের সব শর্ত মেনে ক্ষমতায় বসতে রাজী হন। ১৭৬৩ সালের ৭ই জুলাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কলকাতা কাউন্সিল মীর কাসিমের পরিবর্তে জাতিদ্রোহী মীর জাফরকে সুবাহদার বলে ঘোষণা করে। মীর কাসিমকে তারা মীর জাফরের বশ্যতা মেনে নেয়ার আহবান জানায়।

পরিস্থিতির এটি ছিলো এক অভাবিত মোড় পরিবর্তন। একদিকে প্রতিরোধ সংগ্রামী দেশপ্রেমিক মীর কাসিম। অন্য পক্ষে ইংরেজ ও তাদের বশংবদ মীর জাফর। এই দুই বাহিনীর মধ্যে প্রথম সংঘর্ষ হয় কাটোয়া নদীর পারে। ক্ষণস্থায়ী এই যুদ্ধে মীর কাসিমের সেনাপতি মোহাম্মদ তকী খান পরাজিত ও নিহত হন। ১৭৬৩ সালের আগস্ট মাসে ইংরেজ সৈন্যরা মীর কাসিমের মুখোমুখী হয় গিরিয়া নামক স্থানে। এই যুদ্ধে আসাদউল্লাহ, মীর নওশের খান, শের আলী, মার্কার প্রমুখ বিচক্ষণ সেনাপতি মীর কাসিমের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু এ যুদ্ধেও মীর কাসিমের পরাজয় ঘটে। এরপর মীর কাসিমের অবশিষ্ট সৈন্য উদয়নালা অভিমুখে চলে যায়। উদয়নালায় ইংরেজরা অতর্কিতে হামলা চালিয়ে মীর কাসিমের বহু সৈন্য নিহত করে। বাকী সৈন্যরা প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়। উদয়নালার পরাজয়ের খবর শুনে মীর কাসিম তার স্বল্পকালীন রাজধানী

www.nagorikpathagar.org

মুঙ্গের হতে পাটনায় রওনা হন। পাটনায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার আগেই মীর কাসিমকে আবার ইংরেজদের মুখোমুখী হতে হয়। এবারও তিনি শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন। রাজত্ব হারিয়ে মীর কাসিম অযোধ্যায় আশ্রয় নেন। অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ-দৌলাহ ও মুগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সাথে তিনি মৈত্রী স্থাপন করেন। কিন্তু সুজা-উদ-দৌলাহর মন্ত্রী বেনী বাহাদুর ও বলওয়ান সিং (বেনারসের রাজা) ইংরেজদের সাথে গোপন ষড়যন্ত্রে মিলিত হন। এ ষড়যন্ত্রের কারণে মীর কাসিম ও সুজা-উদ-দৌলাহর সম্মিলিত বাহিনী ১৭৬৪ সালের এপ্রিল মাসে এক যুদ্ধে পরাজিত হয়।

৫. বক্সারে ভাগ্যের ফয়সালা

১৭৬৪ সালের ২২শে অকটোবর অযোধ্যার নবাব, মুগল সম্রাট ও মীর কাসিমের সম্মিলিত বাহিনীর সাথে বক্সারে ইংরেজ বাহিনীর ঘোরতর যুদ্ধ হয়। বক্সার যুদ্ধে অয্যোধার নবাবের মন্ত্রী বেনী বাহাদুর, সম্রাটের দীউয়ান সেতাব রায় এবং মীর কাসিমের খ্রীস্টান সেনাপতি মার্কাট ও আরাটোনার বিশ্বাসঘাতকতার কারণে সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত হয়। হেক্টর মনরো ইংরেজ বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। বক্সারের বিজয় ইংরেজদেরকে চট্টগ্রাম থেকে প্রয়াগ পর্যন্ত এক বিশাল এলাকার ওপর প্রভূত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে।

বক্সার যুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে স্যার জেমস স্টিফেন লিখেছেন ঃ 'Baxar deserves for more than Plassey to be considered as the origin of the British power in India. It was a fiercely contested battle and the troops of Mir Kasim offered a determined resistance. The English lost 847 killed and wounded while the enemy left behind them 2,000 dead. It was not merely the Nawab of Bengal, as at Plassey, but the Emperor of all India and his titular Prime Minister who were defeated. The Emperor at once made his submission, but the Nawab Wazir refused to come to terms till British forces had marched into Lucknow and Allahabad and all Oudh was at their mercy.'

৬. এলাহাবাদ থেকে কলকাতা

বক্সারের যুদ্ধে জয়ের ফলে বাংলাদেশে ইংরেজদের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৬৫ সালে ক্লাইভ দ্বিতীয়বার কোম্পানীর গভর্ণর হয়ে কলকাতায় আসেন। এর আগে ১৭৬০ সালে তিনি বিলাত গিয়েছিলেন। বক্সার যুদ্ধে পরাজিত সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ও অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ-দৌলাহর সাথে ক্লাইভ ১৭৬৫ সালে একটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন। এ চুক্তি 'এলাহাবাদের সন্ধি' নামে

www.nagorikpathagar.org

পরিচিত। এই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী নবাব সুজা-উদ-দৌলাহ ইংরেজদেরকে ৫০ লাখ টাকা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দেন এবং এলাহাবাদ ও কোরা জিলা ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে অযোধ্যা ফিরে পান। সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে এলাহাবাদ ও কোরা জিলা যৌতুক এবং বার্ষিক ছাব্বিশ লাখ টাকা প্রদানের অঙ্গীকারের বিনিময়ে ক্লাইভ তাঁর কাছ থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দীউয়ানী লাভ করেন। ১৭৬৫ সালের ১২ই আগস্ট তারিখে সম্রাটের এক ফরমান বলে লর্ড ক্লাইভ রাজস্ব শাসনের এই ক্ষমতা লাভ করেন। এলাহাবাদের সন্ধিতে ইংরেজদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়। দেশের সামরিক কর্তৃত্ব ইংরেজরা আগেই দখল করেছিলো। এখন 'নবাবে'র হাতে শান্তিরক্ষার দায়িত্বই শুধু অবশিষ্ট থাকলো।

এ দিকে সহায়-সম্বলহীন ভগ্ন-হৃদয় মীর কাসিম দীর্ঘ বারো বছর মধ্য ভারতে ব্যাপক সফর করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তাঁর সে চেষ্টা সফল হয়নি। ১৭৭৭ সালের ৬ই জুন দিল্লীর আজমীরী দরওয়াজার বাইরে অজ্ঞাত পরিচয় পথচারী হিসাবে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত অবস্থায় তাঁর মাথার নীচে একটি ছোট পুটলী ছিলো। তাতে একটি চাদরে সোনার জরী দিয়ে লেখা ছিলো ঃ 'নাসিরুল মুলক ইমতিয়াজ-উদ-দৌলাহ নসরত জঙ্গ মীর কাসিম আলী খান বাহাদুর'। মীর কাসিমকে দিল্লীতেই সমাধিস্থ করা হয়।[১৫]

মীর জাফর শেষ বয়সে মারাত্মক কুষ্ঠ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ১৭৬৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী তার মৃত্যু হয়।[১৬] এরপর কোম্পানীর কর্মচারীদেরকে পৌণে নয় লাখ টাকা ঘুষদানের বিনিময়ে পুতুল নবাবীর মসনদ লাভ করেন মীর জাফরের পুত্র নযম-উদ-দৌলাহ। পৌনে তিন লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে এই অপরিণত বয়স্ক নবাবের নায়েব-নাযিম নিযুক্ত হন রেজা খান। নযম-উদ-দৌলাহর মৃত্যুর পর ১৭৬৬ সালের ৮ই মে তাঁর ভাই সাইফ-উদ-দৌলাহ এবং তাঁর মৃত্যুর পর অপর ভাই মুবারক-উদ-দৌলাহ কোম্পানীর কৃপার আশ্রয়ে মসনদ লাভ করেন।

১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস ক্লাইভের দ্বৈত শাসন রহিত করেন। নবাবকে শাসন পরিচালনার দায়িত্ব থেকে তিনি সম্পূর্ণ অব্যাহতি দেন। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সর্বময় কর্তৃত্বভার কোম্পানী গ্রহণ করে। ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার রাজধানী মুরশিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তর করেন।

১৫. আবু জাফর ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, পৃঃ ২২।

১৬. বাংলার মুসলিম শাসন উৎখাতের ষড়যন্ত্রে যারা লিপ্ত ছিলো, তাদের প্রত্যেককেই অস্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করতে হয়। ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান নায়ক উমিচাঁদ ইংরেজদের এক পদক বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে পদকপ্রাপ্তদের তালিকায় নাম না দেখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান। রাজা রাজবল্লভ নিহত হন অপঘাতে। তাঁর সকল কীর্তি পদ্মা নদী গ্রাস করে। ষড়যন্ত্রের আরেক নায়ক নন্দকুমার মহারাজা উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংসের সাজানো মামলায় তাঁকে ফাঁসিকাষ্ঠে জীবন দিতে হয়। এই ষড়যন্ত্রে ইংরেজ পক্ষের মূল নায়ক রবার্ট ক্লাইভ স্বয়ং বন্দুকের গুলীতে আত্মহত্যা করে তাঁর নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন। আর মীর জাফর, ঘষেটি বেগম, মীরন ও মুহাম্মদী বেগের করুণ পরিণতির কথা যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

৭. শামস-উদ-দৌলাহ ঃ ঢাকার এক নবাবের শেষ চেষ্টা

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাগজপত্র থেকে জানা যায় যে, ১৭৯৬ সালের দিকে ইংরেজ শাসন উৎখাতের জন্য শামস-উদ-দৌলাহ নামে ঢাকার একজন নবাব চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ঢাকার শেষ নায়েব-নাযিম নসরত জঙ্গের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী শামস-উদ্-দৌলাহ ১৭৯৬ সালে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উত্তর ভারত, আফগানিস্তান ও পারস্যের মুসলিম শাসকদের সাথে যোগাযোগ করেন। ওমানের রাজধানী মাস্কাট থেকে আরব জাহাজে করে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র আনার ব্যবস্থা করা হয়। কয়েকটি জাহাজ কলকাতা বন্দরে আসে এবং সৈন্যগণ শামস-উদ্-দৌলাহর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ এ তৎপরতা সম্পর্কে আভাস পেয়ে শামস-উদ্-দৌলাহকে গ্রেফতার করে। এটা ছিল ১৭৯৯ সালের ঘটনা। শামস-উদ্-দৌলাহ গ্রেফতার হওয়ার ফলে ইংরেজ বিতাড়নের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৮০৫ সালে শামস-উদ-দৌলাহকে মুক্তি দেয়া হয়। তাঁর 'গুরুতর অপরাধে'র জন্য কোম্পানি তাঁকে মুক্তি দানের পক্ষে ছিলো না।[১৭]

১৮২৪ সালে বিশপ হেবার ঢাকা আসেন। তিনি তাঁর ডাইরিতে শামস-উদ-দৌলাহ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ 'নবাবের এখন কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই। তাঁর ভাই (নসরত জঙ্গ) রাজকীয় পালকীতে চড়তেন, শামস-উদ্-দৌলাহর সে অধিকার নেই। তবে তিনি দশ হাজার টাকার মাসিক বৃত্তি পান। তিনি সভাসদ ও রক্ষীদল রাখতে পারেন। তাঁকে 'হাইনেস' বলে সম্বোধন করা হয়। যৌবনে তিনি কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন। তিনি সরকারের সাথে বিবাদ করেছেন। নিজ পরিবারের সাথে ঝগড়া করেছেন। অযোধ্যার নবাবের সাথে মিলে তিনি সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাঁকে বহু বছর কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। তিনি ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান অর্জন করেছেন। এরূপ জ্ঞান এদেশীয়দের মধ্যে খুব কম দেখা যায়। তিনি সুন্দর ইংরেজী বলতে ও লিখতে পারেন এবং নিজেকে শেক্সপিয়ারের একজন সমালোচক বলে মনে করেন।'[১৮]

১৮৩১ সালে (সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী ও তিতুমীরের শাহাদতের বছর) নবাব শামস-উদ্-দৌলাহ ইনতেকাল করেন।

ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সময় থেকেই ইংরেজরা প্রত্যক্ষভাবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসকরূপে এ দেশের রাজনৈতিক জীবনে অবতীর্ণ হয়। এরপর তারা কর্ণাটক ও হায়দরাবাদে প্রভাব বিস্তার করে। কয়েক বছরের মধ্যে তারা হায়দার আলী ও টিপু সুলতানের মহীশুর রাজ্য অধিকার করে। এভাবে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিকার বিস্তৃত হয়। ইংরেজরা ১৮৪৩ সালে পাঞ্জাব এবং ১৮৫৬ সালে অযোধ্যা অধিকার করে। সমগ্র ভারতে এভাবে তাদের দখল কায়েম হয়।

১৭. বি. সি. এলেন ঃ ঢাকা, পৃঃ ৩৩-৩৪; ডক্টর এম. এ. রহীম ঃ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ২৭।
১৮. বিশপ হেবার ঃ নেরেটিভ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৩-৪৪।

www.nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট

প্রথম সংস্করণ সম্পর্কে কিছু অভিমত

'পথিকৃত গ্রন্থ' : সৈয়দ আলী আহসান

আমাদের জাতিসত্তার উন্মেষ এবং বিকাশকে আলোচনা করতে গেলে পাল আমলের বিস্তৃত পরীক্ষা করা প্রয়োজন এবং সেনরা যে অসৌজন্যের জন্ম দিয়েছিল, তারও সুস্পষ্ট পরিচিতি উপস্থিত করা প্রয়োজন। অবশেষে মুসলমান আমলে এ অঞ্চলের সংস্কৃতি যে নতুন মানবিক রূপ পরিগ্রহ করল তারও বিস্তৃত সমীক্ষার প্রয়োজন। এ নিয়ে অল্পস্বল্প লিখিত হলেও বিস্তৃতভাবে এ নিয়ে কেউ গবেষণা করেনি। সম্প্রতি মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এ নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং তাঁর 'মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' গ্রন্থটি এ ক্ষেত্রে পথিকৃত বলা যেতে পারে। ... আমরা বিশেষ একটি ভূখন্ডের অধিবাসী, সেই ভূখন্ডের অতীত এবং বিশ্বাস আমাদের সংস্কৃতি নির্মাণে যে বিপুলভাবে সহায়ক, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তা তাঁর গ্রন্থের মধ্যে সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। এ অঞ্চলের মানুষের যে একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা আছে এবং তা পাল আমল থেকে ক্রমশ গড়ে উঠেছে, তার একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এবং সতর্ক বিবেচনা মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের গ্রন্থে পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে, অধিকাংশ সাম্প্রদায়িক হিন্দু ঐতিহাসিকের বিবরণে বহিরাগত সেনদের সংস্কৃতিকে বিরাট ও মহার্ঘ করে দেখানো হয়েছে এবং আমাদের দেশের আত্মবোধবিমুখ কিছু লোক হিন্দুদের বিবেচনাটি মেনে নিয়েছে। এহেন অবস্থা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করার প্রয়োজন ছিল। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান যে এ পথে এগিয়ে এসেছেন সে জন্য তাঁকে আমি সাধুবাদ দেই।

(গ্রন্থকারের 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা' গ্রন্থের মুখবন্ধ থেকে)
১৪.০২.১৯৯৪

www.nagorikpathagar.org

'শুধু ইতিহাস গ্রন্থ নয়—ইতিহাস চেতনারও গ্রন্থ' : আবদুল মান্নান সৈয়দ

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান রচিত "বাংলা ও বাংগালী : মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা"...বাঙালি মুসলমানের স্বাদেশিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে অবলোকন এবং প্রখ্যাত বাংলার ইতিহাসগ্রন্থসমূহের একটি নিঃশব্দ প্রতিবাদ। আর্য আগমনের পটভূমি থেকে পলাশীর বিপর্যয় পর্যন্ত ইতিহাস লেখক বর্ণনা করেছেন—কিন্তু রাজশাসনের সূত্র ধরে 'জনগণের আধিপত্যবাদ বিরোধী প্রতিরোধ ও মুক্তির লড়াই'-এর প্রসঙ্গই তিনি সবসময় নজর রেখেছেন। ...লেখক যথার্থই দেখিয়েছেন, ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে অষ্টাদশ অশ্বারোহী নিয়ে এসে বখতিয়ার খিলজী অকস্মাৎ বাংলা দখল করলেন, তা নয়—"বাংলার জনগণের মুক্তি সংগ্রামে ইসলাম প্রচারকগণ মুখ্য ভূমিকা পালন করেন" (পৃ-২৬)। তাঁদের কার্যক্রমই পরবর্তীকালে এখানে মুসলিম রাজশক্তি প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়েছে। ... এদেশের জনগণ ইসলাম প্রচারকদেরকে পেয়েছিলো তাদের মুক্তিসংগ্রামে নেতৃত্বের ভূমিকায়' (পৃ. ১২৮)। লেখক সংগতভাবেই এদের আখ্যায়িত করেছেন 'মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক' হিসেবে।

আলোচ্য লেখকের একটি মূল কৃতিত্ব এদেশের সাধারণ মানুষের ঘনিষ্ঠ উলামাদের ভূমিকা তুলে ধরায়। ইতিহাসে উপেক্ষিত একজন আলেমের ভূমিকা তো অবিস্মরণ মহিমা-খচিত। ...ইতিহাসে উপেক্ষিত নূর কুতুব-উল-আলম-এর অসাধারণ প্রয়াসের কথা আমাদের মনে হয় আরেকবার যখন দুর্বল নবাব আলীবর্দী খান ও নবাব সিরাজউদ্দৌলার পর আমরা কোনো নতুন নূর কুতুব-উল-আলম-এর দেখা পেলাম না—দেশ চলে গেলো ইংরেজের হাতে।

বাংলায় মুসলিম শাসনের সাড়ে-পাঁচশো বছর মোটামুটিভাবে এভাবে বিভাজন করা যায় ঃ তুর্কী আমল (১২০১-১৩৫০), স্বাধীন মুসলিম বাংলা (১৩৫০-১৫৭৫) এবং মুঘল আমল (১৫৭৬-১৭৫৭)। কালানুক্রম রক্ষা করেও আলোচ্য লেখক এভাবে বিভাজন করেননি। তিনি সামগ্রিকভাবে মুসলিম অবদানের মূল্যায়ন করেছেন—নিছক রাজনৈতিকভাবে নয়। এর ফলেই ইতিহাসের সত্যকে তিনি যথার্থভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছেন। উলামা ও মুজাহিদদের ভূমিকা আর কোনো বাংলার ইতিহাস প্রণেতা এতো উজ্জ্বল সত্যনিষ্ঠভাবে দেখাননি।

লেখকের ভাষা স্বচ্ছ-সংযত-সরল ঃ ইতিহাসগ্রন্থের উপযোগী। তাঁর প্রতিটি উক্তি তথ্য ও যুক্তি সমর্থিত। সমগ্র গ্রন্থটি সুবিন্যস্ত। লেখকের পথ ও গন্তব্য অর্থাৎ কেন্দ্রীয় বক্তব্য কোথাও আবছা-ঝাপসা নয়। আমার মতো সাধারণ পাঠকও এই বই থেকে একটি সাফ ধারণা করতে পেরেছে। অনেক ইতিহাসগ্রন্থ লেখক পাঠ করেছেন; কিন্তু অতীতের ধারাবাহিকতাকে তিনি দেখেছেন নিজের চোখে, সজ্জিত করেছেন নিজের মতো করে।

www.nagorikpathagar.org

নতুন তথ্যের উপস্থাপনার চেয়ে নতুন বিশ্লেষণের উপস্থাপনাই এই বই-এর প্রধান গুণ।

লেখক মুসলিম শাসনের পতনের কার্যকারণ খুঁজতে গিয়ে প্রথম পয়েন্টেই সঙ্গতভাবে জানিয়েছেন, 'রাষ্ট্রগঠনের পাশাপাশি জাতিগঠনের কাজে সম্যক সচেতনতার অভাবে এবং সাংস্কৃতিক অসচেতনতার কারণে মধ্যযুগের সাড়ে-পাঁচশো বছরের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটেছিলো।' বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতেও এই চেতনা জরুরী বলে মনে হয়েছে আমার। আমি তো মনে করি, এখানেই লেখকের সার্থকতা—ইতিহাসকে এই বর্তমানে যুক্ত করে দেওয়ার।

আমাদের সচেতন বর্তমান লেখক প্রকৃতপক্ষে জনগণেরই ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন। বারংবার লেখক আমাদের স্বরণ করিয়ে দিয়েছেন, রাজরাজড়া নয়, কারা ছিলেন এদেশের ইমেজ গড়ার করিগর। এই ইমেজ গড়ার কারিগরদের কথা প্রচলিত ইতিহাস গ্রন্থাবলীতে অনুপস্থিত। বাঙালী যে মুক্তিপিপাসু চিরকাল, বাঙালী-মুসলমানই তা বারবার প্রমাণ করেছে। কিন্তু যথার্থ ও নিরপেক্ষ ইতিহাস-রচয়িতার অভাবে আমরা তা সবসময় জানতে পারিনি। বর্তমান গ্রন্থে মোহাম্মদ আবদুল মান্নান কিছু কিছু জানিয়েছেন, কোন-কোন প্রশ্ন জাগিয়ে দিয়েছেন। বাংলা ও বাঙালির মূলধারা বিষয়ে আমরা ক্রমশ: সচেতন হয়ে উঠছি। আমরা খানিকটা অবাক হয়েই দেখছি, আমরা অতীতের ধারাবাহিকতার ভিতর দিয়েই বিকশিত হয়েছি—কোন আকস্মিক উদগম নই। আমাদের আছে দীর্ঘদিনের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য—কোন হীনমন্য জাতি হওয়ার কারণ নেই আমাদের। মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের বইটি তাই শুধু ইতিহাসগ্রন্থ নয়—ইতিহাস চেতনারও গ্রন্থ।

দৈনিক ইনকিলাব, ২ মাঘ, ১৩৯৯

'ইতিহাস পুনঃনির্মাণে নতুন অধ্যায়' : ড. মোহাম্মদ মুহিব উল্যাহ ছিদ্দিকী

মধ্যযুগে রাজা-বাদশাহদের কেন্দ্র করে ইতিহাস রচিত হতো। তাই মধ্যযুগের ইতিহাস ছিল রাজা, রাজ্য, রাজধানী, রাজপথ অথবা রাজার সাথে সংযুক্ত ব্যক্তিবর্গের ব্যাপক প্রশংসা এবং যুদ্ধবিগ্রহের বিজয়গাঁথা। আধুনিককালে ইতিহাসের গতি-প্রকৃতির ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। আজকের দিনে ইতিহাস মানে—সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড তথা সামগ্রিক জীবনের ইতিবৃত্ত বা সাক্ষ্য। এ পরিবর্তনের ধারায় মোহাম্মদ আবদুল মান্নান কর্তৃক প্রণীত হয়েছে 'বাংলা ও বাংগালী : মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' নামক গ্রন্থটি।

আলোচ্য গ্রন্থে এতদঅঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠির বসতির সূচনা থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত তাদের সংগ্রামী ঐতিহ্যের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায় শিরোনামের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশ্লেষিত এবং আপন বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত। এগারোটি

www.nagorikpathagar.org

অধ্যায় ছাড়া রয়েছে দশ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থকারের 'প্রসঙ্গ কথা' শিরোনামে অত্যন্ত পান্ডিত্যপূর্ণ একটি ভূমিকা...। ব্যক্তিগত আগ্রহে প্রণীত বই বলেই গ্রন্থের প্রতিটি লাইনেই লেখকের ইতিহাস অনুরাগ ও প্রচন্ড পরিশ্রমের উজ্জ্বল স্বাক্ষর প্রতীয়মান হয়েছে।

বাংগালীর মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস প্রণয়ন করতে গিয়ে জনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের সব চেয়ে বড় অবদান হলো—তাঁর ধারণার ধরন ও চিন্তা-চেতনা বিকাশের নতুনত্ব। কারণ ইতিপূর্বে এ বিষয়টিকে এভাবে কেউ দেখেছে বলে আমাদের জানা নেই। ইতিহাসের সূচনা থেকে পলাশী পর্যন্ত একটি অখন্ডিত সংগ্রামের চিত্র অংকন সত্যই নতুন ব্যাপার এবং ইতিহাস পুন:নির্মাণে অবশ্যই একটি নতুন অধ্যায়।

মানব উন্নয়ন জার্নাল
ডিসেম্বর, ১৯৯২

'নির্বিত্ত প্রজাদের গৌরবময় সংগ্রামের বিবরণ' : মীযানুল করীম

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের লেখা 'বাংলা ও বাংগালী/মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' গ্রন্থটি সংঘাত ও সম্ভারে পূর্ণ আমাদের অতীতকে উপস্থাপন করে ভবিষ্যতের দিশা দিতে চেয়েছে। অসামান্য এ বইটি ইতিহাসের উপাদানসমৃদ্ধ এবং বিপুলভাবে গবেষণা-সহায়ক। ...হযরত ঈসার (আ:) জন্মের অন্তত: দু'হাজার বছর পূর্বেকার বঙ্গভূমির ইতিহাস বিধৃত রয়েছে বইটিতে। লেখক রাজা-গজার কাহিনী নয়, নির্বিত্ত প্রজার সাহসী জীবনের সংগ্রামী ধারাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন।...সামগ্রিক ইতিহাস প্রণয়নের দিকেই সুধী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ...লেখকের অনুসন্ধিৎসা, জিগীষা, সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা, তাঁর লিখিত কর্মে প্রমাণিত। আবার সুসমঞ্জস হিসাব-নিকাশ তথা যাচাই-বাছাই করার প্রবণতাও একই সাথে স্পষ্ট। বিনয়ী বলেই তিনি বলতে পেরেছেন, 'আমি বিশেষজ্ঞ নই—পাঠক'। নি:সন্দেহে তিনি যুগপৎ বোদ্ধা ও যোদ্ধা পাঠক। বিকার ও মিথ্যাচার, বলা যায় বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যভিচারের প্রতিপক্ষে নিরেট বাস্তবতার সপক্ষে যুদ্ধ করে তিনি ভারসাম্যময় বোধশক্তির পরিচয় রেখেছেন।

প্রখ্যাত কৃষ্ণাঙ্গ লেখক আলেক্স হ্যালী তাঁর পূর্বপুরুষের উৎস সন্ধানে লিখেছেন 'Roots'; মোহাম্মদ আবদুল মান্নান কিন্তু তাঁর মতো কথাসাহিত্য লিখতে বসেননি। স্বজাতির স্বরূপ অন্বেষায় তিনি ইতিহাসের উপকরণ সঞ্চয় করার গুরুভার সোৎসাহে নিজ স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন। তাঁর সংগৃহীত ও সমন্বিত তথ্য পাঠকের মন-মস্তিষ্কে বিলোড়ন তুলতে বাধ্য। ইতিহাস বিস্মৃতি ও বিকৃতির চলমান অধ:পতিত ধারাভাষ্য যখন এদেশে উৎকট হয়ে উঠেছে, তখন বাংগালীর যথার্থ মুক্তির গৌরবময় সংগ্রামের আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত উপস্থাপন করা যে সবিশেষ তাৎপর্যমন্ডিত তা নি:সন্দেহ।

দৈনিক ইনকিলাব, ১৬/১০/১৯৯২

www.nagorikpathagar.org

'শেকড় সন্ধানীদের জন্য...' : ফরীদ আহমদ রেজা

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের 'বাংলা ও বাংগালী : মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' বইটি আমাদের বিস্মৃত ইতিহাস পুনরুদ্ধারের একটি উল্লেখযোগ্য ও উৎসাহব্যঞ্জক প্রয়াস। এ বিষয়ে লেখকের আগ্রহ, আন্তরিকতা ও পরিশ্রমের সাক্ষ্য বইটিতে রয়েছে। লেখক আমাদের প্রাচীন ইতিহাস আবিষ্কারে সাহসী হয়েছেন এবং এ দেশে আর্যদের আগমন-পূর্ব সময় থেকে নিয়ে পলাশী ও বক্সার পর্যন্ত সময়ের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে পরবর্তীকালের ইতিহাস রচনার আশ্বাসও দিয়েছেন।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের বইয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তিনি বাংগালীর মুক্তি সংগ্রামকে খন্ডিতভাবে দেখেননি, দেখেছেন সামগ্রিকভাবে। 'বাংলা ও বাংগালী ঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' লিখে তিনি একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন। আর্যদের বিরুদ্ধে বংগ-দ্রাবিড়দের প্রতিরোধকে তিনি বাংগালীর প্রথম প্রতিরোধ সংগ্রাম হিসেবে অভিহিত করে আজকের বাংলাদেশ নামক ভূখন্ডের অধিবাসীদের হাজার বছরের পুরনো ইতিহাসের সাথে সংযুক্ত করেছেন। যারা বাংলাদেশকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেন, যারা শেকড় সন্ধানী এবং যারা আত্মপরিচয় লাভে আগ্রহী, তাদের জন্যে মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের এ বই অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত।

সাপ্তাহিক বিক্রম, জুন ১৯৯১

'অখন্ডিত মুক্তি সংগ্রামের চিত্র' : মোশাররফ হোসেন খান

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের বৈশিষ্ট্য হলো তিনি আসমুদ্র যুক্তির ভেতর থেকে নির্ভরযোগ্য তথ্যটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিবেশন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। সুতরাং তাঁর দেয়া তথ্যগুলি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। তিনিই সম্ভবত প্রথম—যিনি বাঙালীর মুক্তি সংগ্রামকে খন্ডিতভাবে দেখেননি। দেখেছেন সামগ্রিকভাবে—বিশাল ক্যানভাসে।

যদিও ব্যক্তি আগ্রহে ইতিহাস চর্চায় লেখক অগ্রসর হয়েছেন বলে জানাচ্ছেন, তবু তিনি তাঁর অসম্ভব শ্রম আর শাণিত বিবেচনার মধ্য দিয়ে পাঠককে যে অসম্ভব মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দিলেন—বোধ করি তার আবেদন কম নয়। আমাদের বিবেচনায় সাম্প্রতিক প্রকাশনায়—'বাংলা ও বাংগালী : মুক্তিসংগ্রামের মূলধারা' গ্রন্থখানি এক অসামান্য সংযোজন।

পালাবদল, জানুয়ারী ১-১৫, ১৯৯২

www.nagorikpathagar.org

'লাঞ্ছিত মানুষের বিজয় কাহিনী' : আবদুল মুকীত চৌধুরী

মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের মানস-কাঠামো ও সৃষ্টি-চিন্তার পুরোটা জুড়ে রয়েছে স্বদেশ ও স্বজাতি। এই সংগ্রামী মানচিত্রের জন-জীবনালেখ্য। সাধারণভাবে এই পরিসরে তিনি দীর্ঘকাল কলম সৈনিক। জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, আদর্শের বিষয়টি তাঁর কাছে মুখ্য।...'বাংলা ও বাংগালী ঃ মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' গ্রন্থটিকে এই লেখকের শ্রেষ্ঠ কাজ হিসেবে আমরা নি:সংশয়ে চিহ্নিত করতে পারি। প্রচুর তথ্যসূত্র ভিত্তিক ইতিহাস পুনর্লিখন কর্ম। সত্য উদ্ধারের জন্য লেখক সুমেরু-কুমেরু সর্বত্র নির্দ্বিধায় বিচরণ করেছেন। আদি বাঙালীর মূল পরিচিতি থেকে শুরু করে লেখক কাল থেকে কালান্তর পাড়ি দিয়েছেন।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান মূলতঃ সাংবাদিক বিধায় সামাজিক ও জাতীয় দায়িত্বানুভূতির সাথে সাংবাদিকসুলভ সন্ধিৎসা, বিচার বিশ্লেষণ এবং ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক উপকরণমালা এটিকে দিয়েছে এক ব্যতিক্রমী মর্যাদা। অনার্য তথাকথিত অস্পৃশ্য মানুষের যুগ-যুগব্যাপী উত্তরণ-সংগ্রামের এ আলেখ্য, স্বৈরাচার, 'ধর্মীয়' নিপীড়ন ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে আপোসহীন মুকাবিলার এক উজ্জ্বল দলিল, লাঞ্ছিত মানুষের বিজয় কাহিনী।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান অধ্যবসায়ী লেখক। দীর্ঘকাল অবিচ্ছিন্ন ধারায় কোন গুরুতর বিষয় নিয়ে গবেষণায় লেগে থাকার ধৈর্য্য তাঁর রয়েছে এবং সে প্রচেষ্টা যে বিরাট সুফল বয়ে আনতে পারে, তার উদাহরণ তাঁর এই ইতিহাস গ্রন্থ।

দৈনিক সংগ্রাম, ২-১০-১৯৯২

www.nagorikpathagar.org

নির্ঘন্ট

অ

অশোক-৩৭
অঙ্গ-২৮
অক্ষয়কুমার মৈত্র-৭০
অসম রাজার গড়-৮
অষ্টাদশ পুরাণ-৭৬
অজয় নদী-১৪
অংশুদেব খেজুর চান্দ-১২৬
অংশুদেব চান্দভভি-১২৬
অস্ট্রিয়া-২২
অগ্নিদেব-৩১
অতীশ দীপংকর-৬৪

আ

আদম শহীদ মক্কী-৮৬, ১১৫, ১১৯
আদম বিন্নৌরী, শাহ-২২৭
আনোয়ার শহীদ, শায়খ-১৩১
আলেকজান্ডার ডোউ-২০৫
আলেকজান্ডার-৩
আলোয়ার-১১৪
আনন্দদেব-৫৮
আনন্দপাল-৬১
আইন-ই-আকবরী-২, ১৬৮, ১৬৯
আফগানিস্তান-১১০
আবদুল মান্নান তালিব-৮৬,১৪৭,২১৬
আবদুল মালিক, খলিফা-১০৯
আবদুল্লাহ খাঁ-১৯০
আবদুল্লাহ বিন উমর বিন আবদুল আযীয-১১৪
আবদুল্লাহপুর-১২০
আবাদান মারওয়াযী, ইমাম-১০৩
আবু বকর (রা:)-৪৭
আবু ওয়াক্কাস (রা:)-১০১, ১০২
আবু তালিব-১০৭
আবুফীর-১৩
আবুল ফজল-২
আবুল মনসুর আহমদ-১৫
আবুল কালাম আজাদ, মওলানা-৪০
আব্বাসীয়-৫৬
আমজাদ হাট-৭
আর্য-২২
আর্য-মঞ্জুশ্রী-৫৩
আরনল্ড, ড:-২১
আরফাখশাদ-১৩
আরব সাগর-১২
আরব হিন্দকে তা'আলুকাত-১০০
আরসাহ্-ই-বাঙ্গালাহ-৬
আরাকান-১০০
আলাউদ্দীন হোসেনশাহ-১৬৬, ১৬৭, ১৬৮
আলাউল হক, শায়খ-১৩১
আলপ্তিগীন-৬০
আলীবর্দী খান-১৭১, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৮
আকবর, সম্রাট-১৪৩, ২১১, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২২
আকরম খাঁ, মাওলানা ২৩, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২২২
আশরাফ কাবুলী, শাহ-১৩১
আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী, ১৩১,১৫৪,১৫৫
আখতার ফারুক, অধ্যাপক-৮৮
আসমাউর রিজাল-১০২, ১০৮
আসকার ইবনে শাইখ, অধ্যাপক-২৮, ১২৯
আহমদ শাহ আবদালী-২৩১
আহওয়াজ-১১০
আজীম-উস-শান-১৭০, ১৮৯
আহুরা মাজদা-২৩
আদিনা মসজিদ-১৪৯, ১৫৩
আমিনুল ইসলাম-৯৩
আখি সিরাজউদ্দীন, শায়খ-১৩১
আসিরিয়-১২
আড়িয়াল খাঁ-৮

ই

ইন্দ্রদেব-৩১
ইভিকা-৩
ইন্দোনেশিয়া-৮৪
ইয়েমেন-১১, ৯৯, ১৩০
ইউসুফ (আ:), হযরত-৯৭
ইউসুফ জুলাইখা-২০০
ইবনে বতুতা-৯০, ১৪৮
ইবনে খাল্লিকান-৯৮

www.nagorikpathagar.org

ইবন-ই-হাজার-১৫৭
ইবরাহিম শর্কি, সুলতান-১৫০
ইমাদপুর-৬১
ইমাম হোসাইন (রা:)-৯৮
ইমাম বুখারী (র:)-৯৮
ইমাম জয়নুল আবেদীন (র:)-৯৮
ইরান-৯৯, ১৩০
ইরাক-১৩০
ইলতুতমিস, সুলতান-১৪৫
ইকলিম-ই-বাঙ্গালাহ-৬
ইখতিয়ার উদ্দীন গাযী-১৪৮
ইসমাইল সামানী-৬০
ইসমাঈল গাযী মল্লী-১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৭
ইসলাম খাঁ চিশতি-১৪৩
ইয়াকুব লাইস-৬০
ইদরীসী-১০০

ঈ

ঈসা খাঁ-১১৩,১৫৯, ১৯০

উ

উদোতকেশরী-৬২
উইলিয়াম এডাম-১৮৯, ১৯০
উমর (রা:)-১৪২
উমর বিন আবদুল আযীয-১১১
উরুবিল্ব-৩৬

ঊ

ঊনসত্তর হিজরীর মসজিদ-১০৮

ঋ

ঋগ্বেদ-১১, ৪৪
ঋষভ-৩৭

এ

এম.এন.রায়-৮৫
এনামুল হক, ড: মুহম্মদ-৬৬
এলাহাবাদ-৪২
এলফিনস্টোন-৯৭
একরাট-৩৬
একদিল শাহ-১৩১
এন.এন.ল, ড:-৯৪,১৪৫

ক

কাহতাম-১৩
কায়নাম-১৩
কর্ণসুবর্ণ-৪৭
কিল্লা-ই-তুগরল-১৪৬
ক্রীট দ্বীপ-১৪
কুমারগুপ্ত-৪২
কুশান-৪০
কুশী-২৭
কুশীনগর-৪৮
কান্যকুব্জ-৫৭
কাপাসিয়া-১০০
কাবুল-৬০, ১১০
কামরুদ্দীন আহমদ-২২
কামরুত-১০১
কামরূপ-৪৭, ১০১
কাম্ব-৪৪
কালিদাস, কবি-১৬
কালিকট-১০০
কলিকা পুরান-১৯৪
কাশ্মির-৬১
কান্তিদেব-৫৮
কনিষ্ক, সম্রাট-৪০
কপিশা-৬০
কবি মুজাম্মিল-২০১
কবি ধুয়ী-১৮৪
কলিঙ্গ-২৮
কালাপাহাড়-১৬৯
কালবিবেক গ্রন্থ-১৮৪
কাশ্যপ-৪৪
কাগচা-২০৩
কাগজিয়া-২০৩
করতোয়া-৯৪
ক্যান্টন-১০২
ক্লাইভ-২৪৯,২৫০,২৫২
কম্বোজ-৫৮,৭২

www.nagorikpathagar.org

কম্বোডিয়া-৮৪, ৯৯
কনৌজ-৪৭
ককেসাস-১২
কঞ্জা-৪
কলঞ্জরপতি-৫৯
কলচুরি-৬২, ৫৮
কল্লাহ শহীদ, সৈয়দ আহমদ-১৩১
কজঙ্গল-৪৭
কওম-ই-হারুত-১০১
কৌডিণ্য-৪৪
কোকল্যদেব-৫৭
কোরায়শী, ড: ইশতিয়াক হোসাইন-৮১
কোয়াংটাং মসজিদ-১০৩

খ

খড়গ বংশ-৪৬
খড়গ রাজা-৫০
খান জাহান আলী-১৩১, ১৬০, ১৬১
খানকাহ-১০৭, ১৩৬
খালিক আহমদ নিযামী-৯৭
খলিফতাবাদ-১৬১

গ

গৌড়েশ্বর-৫
গৌর গোবিন্দ, রাজা-১৪৭
গৌড় রাজমালা-৫৪
গৌড়-৩, ১৩৫
গৌতম, সিদ্ধার্থ-৩৬
গোপচন্দ্র-৪৫
গোপাল ভট্ট-১২১
গোপাল হালদার-১৮৬
গোপাল, দ্বিতীয়-৫৭
গোপালদেব-৫৪
গিয়াস উদ্দীন ইউয়াজ খিলজী-১৪৫
গিয়াস উদ্দীন বলবন, সুলতান-৫, ১৪৬
গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ-১১৩, ১৩৪, ১৫০, ২০০
গিবন, অধ্যাপক-৯৭
গোলাম হোসাইন তাবাতাবাই-২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭
গোলাম হোসায়ন সলীম-২
গোলাম আকবর-১২৪
গোলাম রসুল, মোহাম্মদ-৯৭
গুপ্ত-৩৮
গনেশ, রাজা-১৩৪, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮
গঙ্গার বদ্বীপ-১০০
গনক-৭৩
গশতাসপ, বাদশাহ-২৩
গ্রহবিপ্র-৭৩
গ্রীক-২২
গয়া -৪৭
গজনী-৫৯
গংগা-৪
গংগারিড়ী-৩
গন্ডকী-২৭
গীত গোবিন্দ-১৮৫

ঘ

ঘোড়ামারা-১২৭
ঘোড়াঘাট-৩
ঘাঘরাহাটি-৪৬

চ

চিহিল গাজী-১৩১
চৈতন্য-১৮৩, ২১২, ২১৬, ২১৭
চেরুমাল পেরুমাল-৯৮
চেরর-১০০
চৌধুরী, এস.সি.রায়-৫, ১৪২, ১৮৫
চন্দ্র বংশ-৫৮
চন্দ্রগুপ্ত-৩, ৩৭, ৪২
চন্দেল-৫৮
চট্টগ্রাম-৬,৮৫,১০০,১৩৫
চর্যাপদ-৭৮
চাঁদপুর-৪
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়-৯৩
চীন-১৬, ৮৪
চুয়ানচু-১০৩

জ

জেফেথ-১২
জেমস টেইলর-৯৯
জয়দেব, কবি-১৮৫

www.nagorikpathagar.org

জয়পাল, রাজা-৬১, ১৪২
জয়ানন্দ-১৯৫
জয়সিংহ-১১১
জান্নাতাবাদ-২০৩
জান্নাতুল বালাদ-২০৩
জাপান-১৬
জাফর খাঁ গাজী -১৩১,১৪৬
জালালউদ্দীন জাহাংগাশত বুখারী, ১৩১
জালালউদ্দীন ফতেহ শাহ-১২০,১৬৪
জালালউদ্দীন তাবরিযী-১৩০
জাহাঙ্গীর, সম্রাট-১৪৩
জাহিদ, শায়খ-১৩১
জজিকক-৪
জিহাদ-২৩
জিয়াউদ্দীন বারনী-৫, ১৭৯
জৈন ধর্ম-১৯

ট

টলেমী-৪
ট্রান্স ইন্ডাস-১৪২
টাইগ্রো-ইউফ্রেটিস-১০
টোক বন্দর-১০০

ড

ড: লক্ষীদা-৯৬
ডায়োডোরাস-৩
ডাইসন-৭
ডাহলরাজ-৫৭

ঢ

ঢাকা-১৩৫

ত

তিস্তা-৯৪
তিব্বত-১৬, ৮৪
তমলুক-১৬
তকীউদ্দীন আরাবী-১৩০
তাবাকাত-ই-আকবরী-১৬৪
তাবাকাত-ই-নাসিরী-৫, ১৪৫, ২০৬
তাম্রলিপি-১৬
তাম্রলিপ্তি-৪৭
তারানাথ, লামা-৫৩
তারীখ-ই-ফীরুযশাহী-৫
তেলিয়াগড়-৬
তারীখ-ই-মুবারকশাহী-১৭৯
তারিখ-ই-ফিরিশতা-১৫৯
তীর্থংকর বর্ধমান মহাবীর-৩৬
তুগরল তুগান খাঁ-১৪৫
তুর্কিস্তান-৬০,১৩০
ত্রিলোচনপাল-৬১

থ

থেরবাদী-৩৯
থানেশ্বর-৪৭
থাইল্যান্ড-৮৪

দ

দামোদরপুর-৪৪
দিলকুশা-১২৩
দিয়ার-ই-বাঙ্গালাহ-৬
দারে-আবির-১৩
দানী, ড: আহমদ হাসান-৫
দাউদ খান কররানী-১৬৯, ১৯০
দারস বাড়ি-১৩৫
দাক্ষিণাত্য-১২
দানিশমান্দ, শাহ মুয়াজ্জাম হোসাইন-১৩১
দীনেশচন্দ্র সেন-১১৬, ১৮৪
দীন-ই-ইলাহী-২১৭
দীনার-৪৪
দেবেন্দ্রকুমার ঘোষ, অধ্যাপক-৭৮
দেব পর্বত-৫৮
দেব পাল-৫৭
দেবকোট-৯৪
দেববংশ-৫৮
দেবল-৭৩
দৌলত উজীর বাহরাম খান-২০১
দ্বিজ বংশীবদন-১৯২

ধ

ধলেশ্বরী-১১৩
ধর্মপাল-৫৭
ধর্মাদিত্য-৪৫

www.nagorikpathagar.org

ন

নগেন্দ্রনাথ বসু-৫৬, ৫৯
নরকিলা-১৪৬
নরসিংদী-৮
নেপাল-৭৮,৮৪
নেক মর্দান, সৈয়দ নাসিরউদ্দীন শাহ-১৩১
নূর কুতুব-উল-আলম, শায়খ-১৩১, ১৫০, ১৫১, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৭
নাথ মতবাদ-৮২
নাজ্জাসী সম্রাট-১০২
নারায়ন পাল-৫৭
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়-৬৪
নাগশর্মা-৪৪
নাসিরউদ্দীন মাহমুদ, সুলতান-১৪৫, ১৫৯
নাজির আহমদ-১০১
নদিয়া-৯২,১৪২
নীহাররঞ্জন রায়, ড:-২০
নুহ (আ:)-২
নিমাইসাধন বসু-২২
নিরঞ্জনে রুম্মা-৮৭
নিশাপুরী, শেখ আব্বাস বিন হামজাহ-১২৬
নিশাপুরী, শেখ ইসমাইল বিন-নযন্দ-১১৬
নিজামউদ্দীন আউলিয়া-১৩৬

প

পেগু-১১৩
পোর্টো গ্রান্ডী-২০৪
পোর্টো পিকানো-১৯৮
পবনদূত-১৮৪
প্লিনী-৩
পিরামিড-১১৪
পরশুরাম-১১৭
প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য-২১৭
পদ্মা-৯৪
পাঞ্জাব-২২
পার্বত্য ত্রিপুরা-৭
পারস্য-২২
পাল-৫, ৫৬
পার্শ্বনাথ-৩৭
পাষন্ডী-৮২
পাহাড়পুর-৬৬
পাটলিপুত্র-৪৮, ৫৭
পাতুরাজার ঢিবি-১৪
পাভুয়া-১৩৫
পামির মালভূমি-২৪
পীরালী ব্রাহ্মণ-১৮১
পুরন্দর-২৬
পুশলকার, এ.ডি.-১০
পুন্ড্রনগর-৩৯
পুন্ড্রবর্ধন-৫, ৪৭
পুর্নিয়া-৮১, ৯৪

ফ

ফয়েজুল্লাহ-২০১
ফরাসী-২২
ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ-১১৪, ১৪৩, ১৪৮
ফাহিয়েন-৪২
ফরিদুদ্দীন আত্তার-১১৫
ফু-কীন-১০৩

ব

বদরুদ্দীন বদরে আলম শাহিদী-১৩১
বদরুল ইসলাম শহীদ, শায়খ-১৩১
ব্যাকট্রিয়ান গ্রীক-৪০
ব্যাবিলন-১০
বৃহদুপরিক-৭১
বক্সার যুদ্ধ-২৫৭
বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম-৪৪
বঙ্গ-২৮,৭১
বঙ্গাল-২
বর্ধমান-১৩
ব্রহ্মদেশ-৮৪
ব্রহ্মপুত্র-৮, ১২
ব্রহুই-১২
ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র-৭৫
ব্রাহ্মণাবাদ -১১১
বর্মণ-৬২
বররিন্দ-১০০
বলরাম-১১৬
বলখী-১৫০
বল্লালসেন-৭০,৭৯

www.nagorikpathagar.org

ব্লকম্যান-১২৩
বখতিয়ার খিলজী -১৮, ৯১, ১৪২, ১৪৫
বিক্রমপুর-৫৮
বিশ্বেশ্বর চৌধুরী-৮২, ৮৩, ৮৪
বিপ্রদাস-১৯১
বিভূপাল-৪৫
বিমল বিহারী মজুমদার, ড:-২১৬
বিশপ হেবার-২৬০
বিগ্রহপাল, দ্বিতীয়-৫৮
বিহার-৫০
বিজয় সিংহ-৩৫
বিজয়সেন-৭০
বিজয়পুর-৭০
বগধ-৪
বহর-ই-আব-১০১
বঙ-২
বজলুর রশীদ, আ.ন.ম.-১২৯
বৎস্যপালস্বামী-৪৫
বংগ দ্রাবিড়ী-৩
বংগ-১
বান্দারী-শাই, শাহ-১৩১
বারো বাজার-১৬০
বারো ভূইঁয়া-১৮
বায়েজিদ বোস্তামী-১১৫, ১১৬
বাঙ্গালাহ-১
বানভট্ট-৫১
বানার নদী-১০০
বাবা আদম-১২২
বার্মা-৯৯
বার্‌রি হিন্দ-১০০
বালাম, এম.এল.-২৪
বালাযুরী-১১১
বালুচিস্তান-১২
বাগদাদী, শাহ মুহাম্মদ-১৩১
বাগদাদী, শায়খ যায়নুদ্দীন-১৩১
বাগড়ি-৭১
বাহরাম সাক্কা, হাজী-১৩২
বায়াদুম-১২২
বায়তুল হিকমা-১১১
বাৎস্য-৪৪
বাংলা পয়ার-৭৮
বাংলাদেশ-১
বালি-৮৪
বরিন্দ-৫, ৭১
বলিদান-২৪
বীরদেব-৫৮
বীরভূম-১৩
বুধগুপ্ত-৪৫
বুকানন হ্যামিল্টন-৯৬
বুগরা খান-১৪৬
বুজুর্গ বিন শাহরিয়ার-৯৮
বুড়িগঙ্গা-১১৩
বুতশিকন-১২৪
বৈদিক শাস্ত্রশাসন-১৯
বৈশ্য-২৯
বেদান্ত দর্শন-২৯
বেনারস-২২
বেভারিজ, এইচ -১১৮
বৌদ্ধ-২০
বোহেমিয়া-২২
বোধিবৃক্ষ-৪৭

ভ

ভিক্ষু-৮৪
ভিয়েৎনাম-৮৪
ভৈরব-৮, ১০১
ভদ্রবাহু-৩৭
ভট্টেশ্বর ব্রাহ্মণ-৫০
ভট্ট ব্রাহ্মণ-৭৩
ভট্টগোমিদত্ত স্বামী-৪৫
ভবদেব-৫৮
ভরদ্বাজ-৪৪
ভাস্কর শর্মা-৫২
ভানুগুপ্ত দেব-৪৫
ভাওয়াল গড়-৯
ভারত-২২, ৯৮
ভার্গব-৪৪
ভার্জিল-৪
ভুটান-৮৪

ম

মিরান শাহ-১৩১

www.nagorikpathagar.org

মেসোপটেমিয়া-১০
মেগাস্থিনিস-৩
মেঘনা-১৭, ১১৩
মৌর্য-৩
মোহেঞ্জোদারো-১১
মোবারক আলী, শাহ-১৩১
মোল্লা তাকিয়া-১৫২
মোহন লাল-২৪৯
মোহর আলী, প্রফেসর মোহাম্মদ-২৬
মোহাম্মদপুর-৫০
মেথিকান্দা-৮
মেদিনীপুর-৭১
মদনপাল-৬২
মস্তানগড়-৩৯
মঙ্গলকোট-৮৫
মধুপুর-১১৩
মন্মথমোহন বসু, অধ্যাপক-১৪
মনসা মঙ্গল -১৯১
মনুসংহিতা-২৫
মওদূদী, আবুল আলা-২১৮, ২৪২
মওলানা আতা-১৩১
মখদুম শাহ মাহমুদ গজনভী-১৩০
মগধ-৪,২৮
মসলিন-৪
মহাস্থান গড়-৪৫
মহাভোগপতি-৭১
মহাসেনাপতি-৭১
মহাধর্মাধ্যক্ষ-৭১
মহানন্দ-৩৬
মহাপুরোহিত-৭১
মহাবলাকোষ্ঠিক-৭১
মহাবলাধিকরনিক-৭১
মহা ভারত-৪৩
মহাযানী-৪১
মহাকরনাধ্যক্ষ-৭১
মহাকাল গড়-১২৫
মহাকুম্বারপদ্রক-৫০
মহাসর্বাধিকরনিক-৭১
মহাসমুদ্রাধিকৃত-৭১
মহাগণস্থ-৭১
মহাশিব-৬২
মহাতন্ত্রাধিকৃত-৭১
মহীপাল-৫৮
ময়নামতী-১৫
ময়মনসিং-৭৫
মজদের আড়া-১০৮
মান্দারন-১৩৪
মাইকেল এডওয়ার্ডস-২৫
মারওয়ান, প্রথম-১০৯
মালাক্কা-৯৯
মালাবার-৯৮, ১০০, ১০৪, ১০৬
মাসুদ (রা:)-১০৭
মাসুম খাঁ-১৯০
মাসুম খান কাবুলী-১৬৯
মাহরোক বিন রাইক-১১৪
মাহমুদ শাহদৌলাহ শহীদ-১৩০
মাহমুদ খাঁ-১৯০
মা'বার-১০৩
মাৎসান্যায় যুগ-৫৩
মাহুয়ান-১০৫, ১৯২
মানিকপুরী, শায়খ হুসামউদ্দীন -১৩১
মানিকগঞ্জ-১১৩
মালিক কাফুর-১২১
মীর মর্দান -২৪৯, ২৫০, ২৫২
মীর কাসিম-২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭
মীর জাফর-২৪৭, ২৪৮, ২৫০, ২৫১, ২৫৭, ২৫৯
মুরশিদ কুলী খাঁ-১৭১, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪
মুরশিদাবাদ-৪৭, ১৩৫
মুলতান-১১০
মুকুন্দরাম-১৯১
মুহম্মদ বিন কাসিম-৮৬, ১৪২
মুহাম্মদ (স:)-৪৭
মুহাল্লাব ইবনে আবু সুফরী-১১০
মুহায়মিন-১০৭
মিনহাজ উদ্দীন সিরাজ-৫,১০০, ২০৬
মিনহাজ-উস-সিরাজ-১৪৫
মিশর-১২
মিথিলা-২৭,২৮,৭১
মুয়াবিয়া-১১০
মুজাফ্ফরপুর-৬১
মুজাফফর শামস বলখী-১৩৪
মুজাম্মিল হক, মুহম্মদ-১২৩

www.nagorikpathagar.org

মুজাদ্দিদে আলফিসানী-২২৩, ২২৪,২২৭
মুরি টি টাস-১৪০
মুগিসউদ্দীন তুগরল খান-১৪৬
মুর্তাজা-১০৭

য

যোক্তরপোশ, শায়খ হোসাইন-১৩১
যোগাচার-৪১
যদু, জিতমল-১৫৬
যদুনাথ সরকার-১৮৯
যশোগান-৭৩
যবদ্বীপ-১৬, ৮৪
যরদাশত-২৩
যয়নুদ্দীন, শায়খ-১০৪
যজুর্বেদীয়-৪৪
যাকী, ড: মুহম্মদ-১১০
যাগযজ্ঞ-২৪
যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য-২১৪

র

রোম-২২,৯৯
র‍্যালফফিচ-১১৩, ২০৪
রুকনউদ্দীন বারবাক শাহ-১৩৪, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪
রুকনউদ্দীন কায়কাউস-১৪৬,১৪৭
রুশজাতি-২২
রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড:-১০,২১২, ২১৬, ২৩২
রনবংক মল্ল-৯১
রূপ গোঁসাই-২১৪
রমাপ্রসাদ চন্দ্র-৯১
রওশন আরা-১৩১
রংপুর-৯৪, ১৩৫
রামগুপ্ত-৪২
রামপাল-৭০
রহীম, ড: এম.এ.-৬, ৯৪, ১৮৮, ১৯৬, ২০০, ২০৭, ২৩৫
রামপুর বোয়ালিয়া-১১৩
রামাই পন্ডিত, কবি-৪৭,৮৭
রামায়ণ-৪৩
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-১১
রাসতি শাহ-১৩১
রাষ্ট্র কুটরাজ-৫৭
রাঢ়-৫, ৭১
রায়চরিত-১৮৪
রাজ্যপাল-৫৭
রাজস্থান-১৩
রাজভট্ট-৫৬
রাজমহল-৯৪
রাজশাহী-৪৪, ১৩৫
রিযা ইয়ামানী, সাইয়েদ-১৩১
রিসালাতুস শুহাদা-১৬৩, ১৬৬
রিয়াজ-উস-সালাতীন-২,১৫৩,১৭১
রাংগামাটি-৭
রাশিয়া-২২
রাতবংশ-৫০

ল

লোকনাথ-৪৬
লোহিত-১১৩
লক্ষণসেন-৭১, ৭৯
লক্ষণরাজ-৫৮
লঙ্গরখানা-১৩৬
লহর চন্দ্র-৫৮
লাঙ্গলবন্দ-১১৩
লামা তারানাথ-৯৩
লাওস-৮৪
লালমনিরহাট-১০৮
লিংপাহাড়-১০৩
লাখনৌতি-৫
লাচাড়ী-৭৮
লায়লী মজনু-২০১
ললিতচন্দ্র-৫৩

শ

শ্বেত বরাহস্বামী-৪৫
শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ-৭৩
শের শাহ-১৬৪
শেখ আহমদ বিন মুহাম্মদ-১১৬
শুদ্রাপল্লী-৩৬
শুলিক রাজ-৫৭
শ্রী শ্রী শর্মা-৮০
শ্রীনাথ-৪৬
শ্রীপুর-১১৩
শ্রীমত ভাগবত গীতা-১৯৮

www.nagorikpathagar.org

শ্রীলংকা-২৬
শ্রীহট্ট-৭৫
শর্মা-৪৩
শরফউদ্দীন আবু তাওয়ামা, শায়খ-১৩০, ১৮১
শরফুদ্দীন ইয়াহিয়া মানেরী, শায়খ-১৩১
শরফুদ্দীন চিশতী, খাজা-১৩১
শক-৪০
শশাংক-৪৬
শংকর আচার্য-১৮৩
শায়েস্তা খান-১৭০
শুন্যপুরান-৮৭
শামস-উদ-দৌলাহ্, নবাব-২৬০,২৬১
শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহ-১৬৪
শামসউদ্দীন ফিরূজশাহ-১৪৭
শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ-১
শাক্য-৩৬
শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ-৭৩
শাখাব্যায়ী-৪৪
শাহ মোল্লাহ মিশকিন-১৩১
শাহ মোহাম্মদ সুলতান রূমী-১১৫, ১১৯
শাহ আলী বাগদাদী-১৩১
শাহ নূর-১৩১
শাহ বন্দর-১০৫
শাহ মখদুম রূপোস-৮৬, ১১৫, ১২৪
শাহ মজলিশ-১৩১
শাহ মুহম্মদ সগীর-২০০,২০১
শাহ লংগর-১৩১
শাহ সাল্লাহ-১৩১
শাহ সফিউদ্দীন-১৩৪
শাহ সুজা-১৭০
শাহ সুর্খখুল আনতিয়া, সাইয়েদ-১১৯
শাহ জামাল-১৩১
শাহ জালাল মুজাররদ ইয়ামেনী-১৩১, ১৪৭
শিবনাথ-৪৬
শিবশর্মা-৪৪
শৈবধর্ম-৭১
শাহ নিয়ামত উল্লাহ বুতশিকন-১১৫, ১২৩
শাহ তুরকান শহীদ-১৩০
শাহ-ই-বাঙ্গালাহ-৬
শাহ-ই-বাঙ্গালী-৬
শাহবাদ-৪৬
শাহসুজা-১১৯
শাহজাহান-১১৯, ১৭০
শাহাবুদ্দীন ঘোরি-১৪২
শায়খ তৌফিক-১১৬
শায়খ শরফউদ্দীন ইয়াহিয়া মানেরী-১৪৭, ১৪৯
শাত-ইল-গঙ্গা-১০০
শীলভদ্র-৬৪
শীলাদেবী-১১৭
শতদ্রু নদী-৩৬
শতপথ ব্রাহ্মণ-২৭

ষ

ষষ্টিবর-১৯২

স

সিদ্ধাচার্য-৭৬
সিলেট-৮৫,১০১, ১৩৫
সিবাস্তিয়ান মানরিক-২০৬
সিরাজ উদ-দৌলাহ্, নবাব-১৭১, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৮, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৫০
সিকান্দার শাহ-১৩৪, ১৪৭, ১৪৯
সিংহল-১৬, ৮৪
সি-হুয়াং চৌ কুং তিয়েন লু-১৯২
সিন্ধু-২৫, ১১০
সিকিম-৮৪
সিজিস্তান-৬০
সেন-৫
সেক শুভোদয়া-৭৯
সেজরানামা-১২৫
সৌরাষ্ট্র-২৮
সোনার গাঁও-৪,১১৩, ১৩৫, ১৪৩, ১৪৬, ১৪৭, ১৮৭, ১৮৮
সোম স্বামী-৪৫
সোমরস-২৩
সেমিটিক-১০
সদানীরা-২৭
সদ্ধর্মী-৮২
সনাতন গোঁসাই-২১৪
সবৃক্তিগীন-৬১, ১৪২
সমুদ্র গুপ্ত-৪২
সমতট-৫

www.nagorikpathagar.org

নির্ঘন্ট

সরস্বতী-২৭
সরদ্বীপ-৯৯
সরফরাজ খান-১৭১, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৮
সওবান (রা:)-১০৯
সরযু-২৭
সন্ধাকর নন্দী-১৮৪
সাআদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা:)-১০২
সাইয়েদ হাসান আশকারী-১৩৮
সাইয়েদুল আরেফীন-১৩১
সৈয়দ আহমদ শাহ তান্নুরী-১৩১
সাইফউদ্দীন ফিরুজ শাহ-১৬৫,১৬৬
সাবা কওম-৯৯
সাবাউর-৯৯
সাভার-৯৯
সামবেদীয়-৪৪
সামন্তসেন-৬৯
সারনাথ-৫৮
সাওয়ান্দার-১১০
সালাহাত-১০১
সাতগাঁও-৬, ১৩৪
সমিরউদ্দীন মন্ডল-৪৪
সুন্দরবন-৭১
সুফী-৮৬
সুবন্ধু বৌদ্ধমুনি-৪১
সুমাত্রা-১৬,৮৪
সুলায়মান নদভী, মওলানা সৈয়দ-১০০
সুলায়মান কররানী-১৬৮, ১৬৯
সুলায়মান-১০০, ১০১
সুলতান মাহমুদ বলখী মাহিসওয়ার-১১৫, ১১৬
সুলতান মাহমুদ-৫৯, ১৪২
সুকুমান সেন, ড:-৪০, ৯৩, ১৫৬
সুখময় মুখোপাধ্যায়-১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৬, ২০০, ২০৭, ২৫৮
সুজাউদ্দীন-১৭১, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৮
সতীশচন্দ্র মিত্র-৪০
স্কন্দগুপ্ত-৪৫

হ

হেমন্তসেন-৬৯
হোমাগ্নি-২৭
হযরত আয়েশা (রা:)-৯৮
হরপ্পা-১১
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ড:-৭৮
হরপাল-১১৮
হুনুরমান্দ-১১২
হুমায়ুন, সম্রাট-২০৩
হিন্দ-২
হিন্দুস্থান-২৩, ১৩০
হিউয়েন সাঙ-৪৭, ৬৪
হিমালয়-১৬
হল, এইচ.আর.-১২
হর্ষ বর্দ্ধন-৪৮
হর্ষচরিত-৫১
হান্টার, ডব্লিউ. ডব্লিউ-৩২
হাঙ্গেরী-২২
হামেদ উদ্দীন-১০৭
হাজ্জাজ বিন ইউসুফ-১৪২
হাই, মুহম্মদ আবদুল-৬৬
হাবশা-১০১
হারুন-আল-রশীদ-৬৬
হালাকু খান-১৩০
হাসান জামান, ড:-১০৭, ১৮৫, ১৯৪
হাজরামাউত-৯৯
হাজী বাবা সালেহ-১৩১
হরিকেলদেব-৯১
হরিকেল-৫৮
হরিবর্মা-৭৯
হরিরামপুর-১১৬
হীনযানী-৩৯

ক্ষ

ক্ষত্রিয়-২৯

www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থপঞ্জী

১. ড. এম.এ. রহীম : বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম ও ২য় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।
: বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭), আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৮৫।

২. আবদুল মান্নান তালিব : বাংলাদেশে ইসলাম আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮০।

৩. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায় : বাংলার ইতিহাসের দু'শ : বছর স্বাধীন সুলতানদের আমল, ভারতী বুকস্টল, কলকাতা, ১৯৮০।

৪. ড. নীহাররঞ্জন রায় : বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), সুভাষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংক্ষেপিত, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৩।

৫. রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় : বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ও ২য় খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৭।

৬. বিশ্বেশ্বর চৌধুরী : টেকনাফ থেকে খাইবার, ঢাকা।

৭. আবদুল করিম : বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭।
: সোশ্যাল হিস্ট্রি অব দি মুসলিমস অব বেঙ্গল, বায়তুশ শরফ ইসলামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম, ১৯৮৫।
: মুরশিদ কুলী খান ও তাঁর যুগ; বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯।

www.nagorikpathagar.org

৮. গোপাল হালদার : সংস্কৃতির রূপান্তর, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৪।
: বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, ১ম খন্ড,
মুক্তধারা, ১৯৮০।

৯. মোহাম্মদ আকরম খাঁ : মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস,
আজাদ এ্যান্ড পাবলিকেশন্স লিঃ, ১৯৬৫।

১০. রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ
: বাংলাদেশের ইতিহাস,
প্রাচীন যুগ ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৭৪।

১১. সুরজিত দাসগুপ্ত : ভারত বর্ষ ও ইসলাম।

১২. যদুনাথ সরকার : হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, দ্বিতীয় খন্ড,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৭৬।

১৩. শেখ মোহাম্মদ ইকরাম : পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার,
পাকিস্তান পাবলিকেশন্স,
ঢাকা, ১৯৫৪।

১৪. কামরুদ্দীন আহমদ : এ সোশ্যাল হিস্ট্রি অব বেঙ্গল,
প্রগতি প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৭০।

১৫. লতিফা আকন্দ : সোশ্যাল হিস্ট্রি অব মুসলিম বেঙ্গল,
ইসলামিক ফাউন্ডেশন,
ঢাকা, ১৯৮১।

১৬. ড. মোহাম্মদ মোহর আলী : হিস্ট্রি অব দি মুসলিমস অব বেঙ্গল,
ইমাম মোহাম্মদ ইবনে সউদ
ইসলামিক ইউনিভার্সিটি,
রিয়াদ, ১৯৮৫।

১৭. ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ : বাংলা সাহিত্যের কথা, প্রথম খন্ড,
রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬৩।

www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থপঞ্জী

১৮. ডঃ তারা চাঁদ : ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮।

১৯. হেনরী বেভারিজ : দি ডিস্ট্রিক্ট অব বাকেরগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ জেলা পরিষদ, ১৯৭০।

২০. সতীশচন্দ্র মিত্র : যশোহর খুলনার ইতিহাস।

২১. নিখিলনাথ রায় : মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পুঁথিপত্র, কলকাতা, ১৯৮৮।

২২. ডঃ ইশতিয়াক হুসাইন কুরাইশী: আসপেকস্টস অব দি হিস্ট্রি কালচার এ্যান্ড রিলিজিওনস অব পাকিস্তান, সিয়াটো, ব্যাংকক, ১৯৬৩।

২৩. খন্দকার ফজলে রাব্বী : দি অরিজিন অব দি মুসলমানস অব বেঙ্গল (১ম প্রঃ ১৮৯৫) ২য় সংস্করণ সোসাইটি ফর পাকিস্তান ষ্টাডিজ, ঢাকা, ১৯৭০।

২৪. আখতার ফারুক : বাংগালীর ইতিকথা, জুলকারনাইন প্রকাশনী, ঢাকা।

২৫. অধ্যাপক আনিসুল হক চৌধুরী : বাংলার মূল আরবী, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

২৬. অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু : বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯।

২৭. আবুল মনসুর আহমদ : শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৭৩।

www.nagorikpathagar.org

: বাংলাদেশের কালচার,
আহমদ পাবলিশিং হাউস,
ঢাকা, ১৯৮৫।
: আওয়ার কালচারাল হেরীটেজ;
সৃজন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮।

২৮. ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার : গ্রাম বাংলার ইতিকথা ('অ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল'-এর অসীম চট্টোপাধ্যায়কৃত অনুবাদ), প্রথম সংস্করণ।
: দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস,
খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৭৩।

২৯. মাইকেল এডওয়ার্ডস : এ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া।

৩০. ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার : গৌড় রাজমালা, প্রথম নবভারত সংস্করণ।

৩১. ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক : মুসলিম বাংলা সাহিত্য,
তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬৮।
: পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম।
: এ হিস্ট্রি অব সুফিইজম ইন বেঙ্গল,
এশিয়াটিক সোসাইটি অব
বাংলাদেশ-১৯৭৫।

৩২. ডঃ মুহাম্মদ যাকী (স) : এ্যারাব এ্যাকাউন্টস অব ইন্ডিয়া,
ইদারা-ই-আদাবিয়াত-ই-দিল্লী,
২০০৯, কাসীমখান স্ট্রীট, দিল্লী।

৩৩. অধ্যাপক শ্রীদেবেন্দ্রকুমার ঘোষ : প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস।

৩৪. ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন : প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান।
: বৃহৎ বঙ্গ, ১ম ও ২য় খন্ড,
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩।

www.nagorikpathagar.org

: ইষ্টার্ন বেঙ্গল ব্যালাডস,
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৩।

৩৫. এম.এন. রায় : ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান
(দি হিস্টোরিক্যাল রোল অব ইসলাম-
এর অনুবাদ), শতদল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১।

৩৬. সুকুমার সেন : হিস্টোরি অব বেঙ্গলী লিটারেচার,
নয়াদিল্লী, ১৯৬০।

৩৭. এন এন ল : প্রমোশন অব লার্নিং ডিউরিং
মোহামেডান রুল, লন্ডন, ১৯১৬।

৩৮. আবিদ আলী খান : ম্যামোয়েরস অব গৌড় এ্যান্ড পান্ডুয়া।

৩৯. কে.এ. নিজামী : রিলিজিওন এ্যান্ড পলিটিক্স ইন
ইন্ডিয়া ডিউরিং দি থার্টিনথ সেঞ্চুরী,
দিল্লী, ১৯৭৪।

৪০. এনামুল হক : জার্নাল অব দি ডিপার্টমেন্ট অব
ইসলামিক হিস্ট্রি এ্যান্ড কালচার;
ইউনিভার্সিটি অব চিটাগাং,
অক্টোবর-১৯৮৬।

৪১. Hon. Mountstuart
Elphinstone : The History of India: The
Hindu and Mahometan Periods,
Third edition, London, John Murray,
Al Bemarley Street, 1849
(Chapter-X; P-167-168)

৪২. ড. হাসান জামান : সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য,
২য় সংস্করণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন,
ঢাকা, ১৯৮০।

www.nagorikpathagar.org

৪৩. এস.সি. রায় চৌধুরী : সোশ্যাল কালচারাল এ্যান্ড ইকনোমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, সুরজিদ পাবলিকেশন্স, দিল্লী, ১৯৪৮।

৪৪. মুহাম্মদ আবু তালিব : বাংলা সাহিত্যের একটি হারানো ধারা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

৪৫. আ.ন.ম. বজলুর রশীদ : পাকিস্তানের সুফি সাধক।

৪৬. ডঃ এ.কে.এম. আইউব আলী : হিস্ট্রি অব ট্র্যাডিশনাল ইসলামিক এডুকেশন ইন বেঙ্গল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৩।

৪৭. ডঃ অতুল সুর : দুই বাংলা কি এক হবে?, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৯৮৯।

৪৮. গোলাম হোসেন সলিম : রিয়াজুস সালাতিন (বাংলা তরজমা)।

৪৯. উইলিয়াম এ্যাডাম : শিক্ষা রিপোর্ট (১৮৩৫-৩৮), কলকাতা।

৫০. এইচ.জে. রাউলিনসন : ইন্ডিয়া—এ শর্ট কালচারাল হিস্ট্রি, লন্ডন, ১৯৩৭।

৫১. ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফ : মুসলিম ট্র্যাডিশনস ইন বেঙ্গলী লিটারেচার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৩।

৫২. কাজী আমিনুল ইসলাম : বাংলার রূপরেখা, কলকাতা।

৫৩. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী : ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন (তরজমা আবদুল মান্নান তালিব), আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

www.nagorikpathagar.org

৫৪. মেসবাহুল হক : পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

৫৫. গোলাম হোসাইন তাবাতাবায়ী : সিয়ারুল মুতাখখেরীন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৫৬. ব্রিজেন কে. গুপ্ত : সিরাজ-উদ-দৌলা এ্যান্ড দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী।

৫৭. এ.আর. মল্লিক : ব্রিটিশ পলিসি এ্যান্ড দি মুসলিমস ইন বেঙ্গল, ১৭৫৭-১৮৫৬; বাংলা একাডেমী, ঢাকা ।

৫৮. আবু জাফর : স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস।

৫৯. রজতকান্ত রায় : পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ; আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৪।

৬০. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় : প্রাক-পলাশী বাংলা; কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮২।

৬১. আবদুল মওদুদ : মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮২।

৬২. মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম : পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি, প্রথম খন্ড, ইস্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড, ১৯৬৯।

৬৩. আহমদ হাসান দানী : বিবলিওগ্রাফী অফ দি মুসলিম ইনস্ক্রিপশনস অফ বেঙ্গল, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৫৭।

www.nagorikpathagar.org

৬৪. আজিজ আহমেদ : ইসলামিক মডার্নিজম ইন ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৭।

৬৫. ডঃ এস.এম. হাসান : দি আদিনা মসজিদ এ্যাট হজরত পানডুয়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮০।

৬৬. সৈয়দ আলী আশরাফ : মুসলিম ট্রাডিশনস্ ইন বেংগলি লিটারেচার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৩।

৬৭. অধ্যক্ষ মোহাম্মদ শামসুল হুদা: পলাশী-উত্তর বাংলার আর্থ সামাজিক অবস্থা; আশরাফিয়া বই ঘর, ঢাকা, ১৯৯১।

৬৮. মির্জা নাথান : বাহারীস্তান-ই-গায়বী; বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

৬৯. ডঃ এম. আবদুল কাদের : হিসটোরিক্যাল ফ্যালাসিস আনভেইল্ড; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮।

৭০. এ.কে.এম. আবদুল আলীম : ভারতে মুসলিম শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।

৭১. এস.এম. জাফর : মুসলিম শাসিত ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা; বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮।

৭২. অসিম রায় : দি ইসলামিক সিনক্রিটিসটিক ট্রাডিশন ইন বেংগলী; একাডেমিক পাবলিশারস, ঢাকা, ১৯৮৩।

www.nagorikpathagar.org

৭৩. আসকার ইবনে শাইখ : মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮।

৭৪. মীনহায-ই-সিরাজ : তবকাত-ই-নাসিরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩।

৭৫. এস.এম. ইমামুদ্দিন : দি তারিখ-ই-শের শাহী, ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা, ১৯৬৪।

৭৬. মমতাজুর রহমান তরফদার : হুসেন শাহী বেংগলী, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৫।

৭৭. আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ : আল বেরুনীর ভারততত্ত্ব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২।

৭৮. জিয়াউদ্দিন বারানী : তারিখ-ই-ফিরূজশাহী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২।

৭৯. গোলাম সাকলায়েন : বাংলাদেশের সূফী সাধক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২।

৮০. Nalini Kanta Bhattasali : Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal, W. Heffer & Sons, England, 1922.

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা